Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সীরাহ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাতুল ফেরদৌস এমি

রোলঃ 227021448

২২ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সীরাহ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাতুল ফেরদৌস এমি

রোলঃ 227021448

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “সীরাহ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জান্নাতুল ফেরদৌস এমি, আইডিঃ 227021448 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

____

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

____

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "সীরাহ" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Jannatul Ferdous

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২২ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

জান্নাতুল ফেরদৌস এমি

আইডিঃ 227021448

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

পবিত্র সীরাতের সান্নিধ্য : কেন ও কীভাবে?....6

পবিত্র সীরাতকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে....14

প্রাক কথন: নবুওয়াত পূর্ববর্তী আরব....17

ইবরাহীমের কাহিনি....17

কুরাইশ বংশের উৎপত্তি....21

রাসূল সাঃ এর বংশধারা....22

রাসুলুল্লাহ সাঃ এর জন্ম....24

হিলফুল ফুযূল....28

খাদীজাহ (রাঃ) এর সঙ্গে বিবাহ....31

নবুওয়াত ও রিসালাতের শীতল ছায়া....32

নামাজ....39

ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম দলঃ....40

প্রথম হিজরত: আবিসিনিয়া....49

অত্যাচারে কঠোরতা অবলম্বন ও নাবী কারীম (সাঃ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র....60

হামজা রাদি.-এর ইসলাম গ্রহণ....64

উমার (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ....65

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সমীপে কুরাইশ প্রতিনিধি....74

বয়কট....77

আমূল হুজনঃ বেদনার বছর....82

দুঃখের উপর দুঃখ....84

মক্কার বাইরে ইসলামের দাওয়াত....87

ইসরা ও মিরাজ....104

আকাবার প্রথম বায়আত....113

আকাবার দ্বিতীয় বায়আত......115
নাবী (সাঃ) এবং মুসলিমদের মদীনায় হিজরত......120
মদীনায় মুহাম্মাদ (সাঃ)......127
মসজিদে নববীর নির্মাণ......131
মুসলিমগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন......133
পরস্পরে ইসলামী সাহায্যের অঙ্গীকার......135
ইহুদীদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন......137
বদরের যুদ্ধ......142
নবি কারিম সা.-কে হত্যার ষড়যন্ত্র......146
উহুদের যুদ্ধ......149
বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ, ইফকের ঘটনা ও শিক্ষা......168
হুদাইবিয়ার সন্ধি......179
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মক্কায় প্রবেশ......184
তাবুকের যুদ্ধ......188
বিদায় হজ্জ......196
নবী জীবনের শেষ অধ্যায়......204
জীবনের শেষ দিন......213
মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু......214
উমার রাঃ এর অবস্থাঃ......216
খলিফা নির্বাচন ও কাফন-দাফনঃ......219
তথ্যসূত্রঃ......220

পবিত্র সীরাতের সান্নিধ্য : কেন ও কীভাবে?

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাত পাঠের মাধ্যমে আমরা জ্ঞান-প্রজ্ঞা, দ্বীন-ঈমান, আদব-আখলাক, আদর্শ জীবন গঠন ও আল্লাহর দিকে দাওয়াত ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে অতুলনীয় পাথেয় অর্জন করতে পারি। এখানে আলাদা আলাদা শিরোনামে কিছু নমুনা আলোচনা করছি।

এক. ঈমান ও বিশ্বাসের দিক থেকে

পবিত্র সীরাত পাঠের অনন্য প্রাপ্তি হচ্ছে ঈমান-বৃদ্ধি। প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস সাক্ষী যে, পবিত্র সীরাত যুগে যুগে অসংখ্য মানুষকে ঈমানের পথ দেখিয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হওয়া কুরআন, সেই কুরআনের আলোয় উদ্ভাসিত তাঁর বাস্তব জীবন, তাঁর অনন্য চরিত্র-মাধুর্য, তাঁর মহত্ব, মহানুভবতা যুগে যুগে অসংখ্য মানুষকে ঈমান ও বিশ্বাসের স্নিগ্ধ ছায়াতলে নিয়ে এসেছে। তাঁর পবিত্র জীবন তাঁর নবুওত ও রিসালাতের এক দেদীপ্যমান প্রমাণ, যার প্রভাব কোনো ন্যায়নিষ্ঠ হৃদয় ও মস্তিষ্ক এড়িয়ে যেতে পারে না। তাই তাঁর পবিত্র জীবন ও কর্ম ঈমানের আলোক বঞ্চিত প্রত্যেক ন্যায়নিষ্ঠ মানবের পক্ষে ঈমান লাভের মাধ্যম আর ঈমানের আলোকপ্রাপ্ত সৌভাগ্যবান মানবের ঈমান-বৃদ্ধির উপায়। তবে এর জন্য খোলা মন নিয়ে পবিত্র সীরাতের সান্নিধ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন।

সৌভাগ্যবান মুমিনের জন্য পবিত্র সীরাতের অধ্যয়ন ও আনুগত্য যে অনন্য প্রাপ্তি নিয়ে আসে তা হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত ও ভালবাসা। মুমিন যতই তাঁকে জানবে ততই তাঁর মহানুভবতার সাথে পরিচিত হবে, মানবজাতির প্রতি তাঁর মহাঅনুগ্রহের দিগন্ত ততই তার সামনে উন্মোচিত হতে থাকবে। মানুষ তো মানুষকে তার মনুষ্যত্ব, মহানুভবতা ও অনুগ্রহের কারণে ভালবেসে থাকে।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহ. সীরাত পাঠের উপকারিতা বর্ণনা করে লেখেন-

اس سے اپنے آقا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروری معرفت ہوگی، اور اس معرفت سے بہ لزوم عادی آپ کی محبت اور اس محبت سے حسب وعدۂ صادقہ جنت میں آپ کی معیت نصیب ہوگی، اور اس کے نعمت عظمی ہونے میں کس کو کلام ہو سکتا ہے۔ (مقدمہ سیرت مصطفی ، ادریس کاندھلوی)

সীরাত অধ্যয়নের দ্বারা নিজের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরিচিতি লাভ হবে। আর এ পরিচয় লাভের মাধ্যমে অনিবার্যভাবে সৃষ্টি হবে, নবীজীর প্রতি ভালবাসা। যে ভালোবাসার দরুন সত্য প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী লাভ হবে জান্নাতে তাঁর সঙ্গ ও সান্নিধ্য। আর এটা যে এক মহা নিআমত তাতে কি কারো দ্বিমত আছে? (ভূমিকা, বাণী অংশ, সীরাতে মুস্তফা হযরত মাওলানা ইদরীস কান্ধলভী)

এই মহব্বত ও ভালবাসাই হচ্ছে ঐ মহাসম্পদ, যা দ্বীনের পথে চলা সহজ করে দেয়। এ পথের ছোট-বড় ত্যাগ ও কুরবানীকেও বানিয়ে দেয় এক অপার্থিব আনন্দের উপকরণ, যার প্রাণবন্ত নমুনা দেখা যায় তাঁর মহান সাহাবীদের জীবন ও কর্মে। রিযওয়ানুল্লাহি তাআলা আলাইহিম আজমাঈন।

এ প্রসঙ্গে মুফাককিরে ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রাহ.-এর একটি বক্তব্য তুলে দিচ্ছি, যা এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিষয়বস্তুর গভীরতা উপলব্ধির পক্ষে সহায়ক হবে বলে মনে করি। তিনি লেখেন-

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ ও খাঁটি আনুগত্য, তাঁর আদব-আখলাকের অনুসরণ, শরীয়তের নীতি ও বিধানকে প্রবৃত্তির চাহিদা ও সামাজিক রসম-রেওয়াজের উপর প্রাধান্য দেওয়া এবং দাওয়াতের পথে জান-মালের কুরবানী পেশ করা কিছুতেই সম্ভব নয়, যদি এই গভীর, আন্তরিক ও মন-মস্তিষ্ককে আচ্ছন্নকারী মহব্বত না থাকে। একারণে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে-

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَ اَبْنَآؤُكُمْ وَ اِخْوَانُكُمْ وَ اَزْوَاجُكُمْ وَ عَشِيْرَتُكُمْ وَ اَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَ تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ مَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَاۤ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ جِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللهُ بِاَمْرِهٖ ؕ وَ اللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ.

বল, তোমাদের কাছে যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা বেশি প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের খান্দান, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের সেই ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশঙ্কা কর এবং তোমাদের বাসস্থান, যা তোমরা ভালবাস, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত। আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

-সূরা তাওবা (৯) : ২৪

এ মহব্বতের কারণেই সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যের বিষয়ে লালায়িত ও আগুয়ান ছিলেন এবং এক্ষেত্রে অনুপম প্রাণবন্ততা, ধৈর্যশীলতা, সংযম ও কষ্টসহিষ্ণুতার স্বাক্ষর রেখেছেন। এসব বিষয়ে তাঁরাই সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ।

হযরত সিদ্দীকে আকবর রা.-এর দৃষ্টান্ত দেখুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাণ তাঁর কাছে নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয় ছিল। নিজের জীবন ও সুস্থতার চেয়েও তিনি অগ্রগণ্য মনে করতেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন ও সুস্থতাকে। ফলে নিষ্ঠুর উতবা ইবনে রবীআ যখন তাঁর মুখম-ল আঘাতে আঘাতে ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছিল, তাঁর বুকের উপর চড়ে বসে তার উপর নিদারুণ নির্যাতন করেছিল, খবর পেয়ে তার গোত্র বনু তাইম তাকে এমন অবস্থায় উদ্ধার করল যে, তার মারা যাওয়ার ব্যাপারে কারো সংশয় ছিল না। এ অবস্থায়ও দিন শেষে হুঁশ ফিরে পাওয়ার পর সবার আগে যে কথা তার মুখে উচ্চারিত হয়েছিল তা এই

যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিরাপদ আছেন তো। কওমের লোকেরা তাকে আশ্বস্ত করার পরও তিনি নিশ্চিত হতে পারলেন না, বললেন-

فَإِنّ لِلهِ عَلَيّ أَنْ لَا أَذُوقَ طَعَامًا وَلَا أَشْرَبَ شَرَابًا أَوْ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ.

আল্লাহর কসম! আমি ঐ পর্যন্ত দানাপানি স্পর্শ করব না, যে পর্যন্ত না তাঁর সান্নিধ্য ও দর্শন পাই! -আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩/৩০

এইরকম প্রাণোৎসর্গকারী আশিকদের আরেক দৃষ্টান্ত ঐ আনসারী সাহাবিয়া, যাকে উহুদ যুদ্ধের পর একে একে তাঁর বাবা, ভাই ও স্বামীর শাহাদাতের সংবাদ দেয়া হয়েছিল, কিন্তু এইসব সংবাদকে উপেক্ষা করে তিনি শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিরাপদ থাকার সংবাদই জানতে চাচ্ছিলেন। লোকেরা যখন তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিরাপদ থাকার সংবাদ জানাল এবং তিনি স্বচক্ষে তাঁর দর্শন লাভ করলেন তখন বলে উঠলেন-

كُلّ مُصِيبَةٍ بَعْدَكَ جَلَل!

(আল্লাহর রাসূল! আপনি যখন নিরাপদ আছেন তো সব মুসীবত আমার কাছে তুচ্ছ।) -দালাইলুন নুবুওয়াহ, বায়হাকী ৩/৩০২; সীরাতে ইবনে হিশাম ২/৯৯

এমনই উৎসর্গপ্রাণ সাহাবীদের একজন আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ বিন উবাই, যিনি তার বাবা (বিখ্যাত মুনাফেক) আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে বলতে শুনেছিলেন যে, 'আমরা মদীনায় ফেরার পর সম্মানিত লোকেরা তুচ্ছ লোকদেরকে বের করে দেব।' তিনি তখন বাবার বিরুদ্ধে মদীনার দরজায় তরবারি নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, তোমরাই এমন কথা বলেছিলে? তো এখনই প্রমাণ হয়ে যাবে, সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত কি তোমরা, না রাসূলুল্লাহ! তোমরা ঐ পর্যন্ত মদীনার ছায়ায় ঢুকতে পারবে না, যে পর্যন্ত না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে ঢোকার অনুমতি দেন। এরপর সত্যি সত্যি তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতির আগ পর্যন্ত তার বাবাকে মদীনায় ঢুকতে দেননি।

এই জযবা ও নবীপ্রেমের কারণেই তাঁরা তাদের প্রাণকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় বের হতে পেরেছিলেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য স্বজন-স্বদেশ ত্যাগ করা ও আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত বরণ করা তাদের জন্য সহজ হয়ে গিয়েছিল। বরং হিজরত ও শাহাদাতের বিপরীতে প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকাই তাদের জন্য দুষ্কর হয়ে পড়েছিল। এই অতুলনীয় সমর্পণ ও ভালবাসার কারণেই বদরের যুদ্ধের সময় তারা বলতে পেরেছিলেন-

إن أمرنا تبع لأمرك، فو الله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدانلنسيرنّ معك، والله لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك.

আমাদের সব বিষয় আপনার হুকুমের অধীন। আল্লাহর কসম! আপনি যদি সুদূর বারক গামদান পর্যন্তও ভ্রমণ করেন আমরা আপনার সাথেই থাকব। আল্লাহর কসম! আপনি যদি আদেশ করেন তাহলে এই সমুদ্রেও আমরা আপনার সাথে ঝাঁপ দেব।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সাহাবায়ে কেরামের এই অতুলনীয় ভালবাসার বৃত্তান্ত আলোচনা করার পর মুফাককিরে ইসলাম হযরত আলী নদভী রাহ. লেখেন-

আজ মুসলিমজাহানে শরীয়তের বিধি-বিধান পালনে যে ত্রুটি, নেক আমলের ব্যাপারে যে উদাসীনতা, ত্যাগ ও কষ্টের যে কোনো বিষয়ে যে পলায়নপরতা এবং সুন্নতের পাবন্দীর ক্ষেত্রে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের যে অবসাদ, আলস্য- এই সবকিছুর মূলেই আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা ও মহাত্মের অনুপলব্ধি। যে ব্যাপারে স্বয়ং কুরআন মাজীদে অত্যন্ত তাকীদ রয়েছে। এরইসাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মহব্বত-ভালবাসার অভাবও এর এক বড় কারণ।

মনে রাখতে হবে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের ভালবাসাই হচ্ছে ঐ প্রাণসঞ্জিবনী প্রেরণা, যা আশ্চর্য শক্তি ও উদ্যমের উৎস হিসেবে এবং ইতিহাসের বিস্ময়কর কীর্তি ও ঘটনাবলির জন্য অতীতেও প্রসিদ্ধ ছিল, বর্তমানেও প্রসিদ্ধ। এই প্রেম ও জযবার শূন্যস্থান বিচার-বুদ্ধি, সংকল্প ও ব্যবস্থার প্রাচুর্য দ্বারা কিছুতেই পূরণ করা যাবে না। এটা এমনই এক অপূর্ণতা, যার ক্ষতিপূরণ অন্য কিছু দ্বারা কিছুতেই সম্ভব নয়। -মানসিবে নবুওত আওর উসকে আলী মাকাম হামেলীন, পৃ. ১২৮-১৩১

দুই. তাকওয়া ও দ্বীনদারির দিক থেকে

কাকে বলে তাকওয়া, কাকে বলে দ্বীনদারি তা যদি জানতে হয় তাহলে পবিত্র সীরাতের সান্নিধ্যে আসতে হবে। তিনিই তো আদর্শ গোটা মানবজাতির। তাঁর পবিত্র জীবনই হচ্ছে আল্লাহর হক ও বান্দার হক আদায়ের বরং আদ্ল ও ইহসানের সর্বোত্তম নমুনা। তাকওয়া ও দ্বীনদারিকে যদি দু'টো শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করতে হয় তাহলে তা আল্লাহর হক ও বান্দার হক আদায়- এই দুই শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা সম্ভব। দ্বীনদারির উচ্চতর স্তরগুলোকেও যদি শামিল করতে হয় তাহলে কুরআন মাজীদের অনন্যসাধারণ দুই শব্দ- 'আদ্ল' ও 'ইহসানের' শরণাপন্ন হতে হবে । সহজ-সরল ভাষায় আমরা এ দুই শব্দের তরজমা করতে পারি- 'ন্যায়পরায়ণতা' ও 'অনুগ্রহপরায়ণতা'। জীবনজুড়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রে এই দুই স্তরের কোনো একটিতে থাকতে পারাই তো যথার্থ তাকওয়া। আল্লাহ তাআলা ও তাঁর বান্দাদের ক্ষেত্রে তাকওয়ার উচ্চতম স্তরের বাস্তব ও প্রোজ্জ্বল নমুনার নাম পবিত্র সীরাত। কাজেই যথার্থ মুত্তাকী হতে হলে, পবিত্র ও মহৎ জীবনের অধিকারী হতে হলে অবশ্যই আমাদের পবিত্র সীরাতের কাছেই ফিরে আসতে হবে।

আজ মুসলিম-সমাজেও পবিত্র ও নির্মল জীবনের, সদাচার ও সচ্চরিত্রের, উদারতা ও মহানুভবতার, উন্নত চিন্তা ও ভারসাম্যপূর্ণ কর্মের যে অভাব পরিলক্ষিত হয় তার এক বড় কারণ হচ্ছে পবিত্র সীরাত থেকে দূরে সরে যাওয়া। আল্লাহ মাফ করুন, আজ মুসলিম-সমাজেরই এক বিরাট অংশের, বিশেষত তরুণ ও নতুন প্রজন্মের আদর্শ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নন, তাদের আদর্শ এমন সব নর-নারী, যাদের কাছে না ছিল ঈমানের সম্পদ, না সদাচার-সচ্চরিত্রের

সৌরভ। সেইসব বিচ্যুত বিপথগামী এবং অতি ক্ষুদ্র ও খণ্ডিত ইহজাগতিক চিন্তা-চেতনার অধিকারী নারী-পুরুষকে জীবন ও কর্মের আইডল হিসেবে গ্রহণ করে মুসলিম তরুণ-প্রজন্ম বিচ্যুতি ও বিপথগামিতার গভীর গহ্বরের দিকেই ধাবমান।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, তরুণ প্রজন্মই উম্মাহর ভবিষ্যত। উম্মাহর এই শ্রেণিটিকে যদি অবক্ষয়-অধঃপতন থেকে রক্ষা করতে হয়, যথার্থ ও মহৎ জীবনাদর্শের সন্ধান দিয়ে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে উন্নত চেতনার তৃষ্ণা তাদের মন-মননে জাগ্রত করতে হয় তাহলে তাদেরকে পবিত্র সীরাতের সাথেই পরিচিত করতে হবে। মহান আল্লাহ তাআলা সীরাতকে নিখুঁতভাবে সংরক্ষণই করেছেন কিয়ামত পর্যন্ত সকল শ্রেণির মানুষের সৌভাগ্যের সূতিকাগার হিসেবে।

তিন. দাওয়াত ইলাল্লাহর দিক থেকে

ইসলামে দাওয়াত ঐচ্ছিক বিষয় নয়, অবশ্যপালনীয় বিধান। প্রত্যেক মুসলিমকে স্ব স্ব যোগ্যতা ও সক্ষমতা অনুসারে ইসলামের কল্যাণপূর্ণ আদর্শের দিকে দাওয়াত দিয়ে যেতে হবে। এখানে একথাও মনে রাখতে হবে যে, এই অপরিহার্য দায়িত্ব পালনের জন্য নির্ধারিত নিয়ম-নীতি আছে, যা অনুসরণ করে এ দায়িত্ব পালন করতে হবে। অন্যথায় তা দ্বীনী কাজ হিসেবে গণ্য হবে না এবং তাতে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণের আশঙ্কাই বেশি থাকবে।

ইসলামী দাওয়াতের এই নিয়ম-নীতি ও তার বাস্তব প্রায়োগিক নমুনা কোথায় পাওয়া যাবে? তা পাওয়া যাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাতে। কারণ গোটা নবী-জীবনই হচ্ছে এককথায় দাওয়াতী জীবন। আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর পথের দায়ী ও উজ্জ্বল প্রদীপ রূপেই পাঠিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে-

وَ دَاعِيًا اِلَى اللهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا.

এবং আল্লাহর নির্দেশে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী ও আলো বিস্তারকারী প্রদীপরূপে। -সূরা আহযাব (৩৩) : ৪৬

অতএব পবিত্র সীরাত ও সুন্নাহ থেকেই জানতে হবে দাওয়াতের ব্যাপ্তি ও বিষয়বস্তু, দাওয়াতের কর্ম ও কর্ম-পদ্ধতি, দায়ীর গুণ, যোগ্যতা, শর্ত ও বৈশিষ্ট্য। তাঁর পবিত্র জীবন-চরিতের স্বচ্ছ দর্পণেই দেখা যাবে- কেমন হয় আল্লাহর পথের দায়ীর আদব-আখলাক, উদারতা-মহানুভবতা, মানুষের প্রতি শুভকামনা ও কল্যাণকামিতা। এখানেই দেখা যাবে, ধৈর্য্য ও বুদ্ধিমত্তার অনন্য দৃষ্টান্ত। দেখা যাবে, দাওয়াতের পথে গভীর নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার এবং ত্যাগ ও কুরবানীর অতুলনীয় নমুনা। সর্বোপরি সীরাতের পাঠশালা থেকেই অর্জিত হবে দাওয়াতের ক্ষেত্রে 'সুন্নাতুল্লাহ' বা আল্লাহ তাআলার নিয়ম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, যা দায়ীর সামনে তার চলার পথকে আলোকিত করে দেবে।

দায়ীয়ে ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রাহ. লেখেন-

'নবীগণের জীবন ও কর্মকে সংরক্ষণকারী একমাত্র গ্রন্থ আলকুরআনুল কারীম যিনি পাঠ করবেন তিনি খুব পরিষ্কারভাবে এই দৃশ্য দেখতে পাবেন যে, আল্লাহর নবীগণ সবসময় অত্যন্ত অন্ধকার ও বিরূপ পরিবেশে প্রেরিত হয়েছেন। বাহ্যিক উপায়-উপকরণের দিক থেকেও তারা সবল-সমৃদ্ধ ছিলেন না। অর্থ-সম্পদ, রাজ্য-ক্ষমতা, সঙ্গী-সহচর এবং এ ধরনের উপায়-উপকরণ, যা নিয়ে মানুষ গর্ব করে থাকে, সবই ছিল তাদের প্রতিপক্ষের কব্জায়। আম্বিয়ায়ে কেরামের সম্পদ ছিল সব রকমের দ্বিধা ও সংশয়মুক্ত অটল ঈমান, লোভ-লালসা ও কপটতার মিশ্রনহীন খাঁটি ইখলাস, পরম আল্লাহমুখিতা, আল্লাহর উপর অগাধ ভরসা ও নির্ভরতা, তাঁরই চৌকাঠের ভিখারী হওয়া, সৎকর্ম, তাকওয়া, সচ্চরিত্র ও সদাচার এবং এইসকল গুণাবলির পাশাপাশি ঐ বিশুদ্ধ ঈমানী দাওয়াত, যার সাফল্যের নিশ্চয়তা স্বয়ং আল্লাহ তাআলা দান করেছেন।

ইরশাদ হয়েছে-

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ.

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলগণকে এবং মুমিনদেরকে পার্থিব জীবনেও সাহায্য করি এবং সেই দিনও করব, যেদিন সাক্ষীগণ দাঁড়িয়ে যাবে -সূরা মু'মিন (৪০) : ৫১

كَتَبَ اللهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَ رُسُلِىْ اِنَّ اللهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ.

আল্লাহ লিখে দিয়েছেন, আমি ও আমার রাসূলগণ অবশ্যই জয়যুক্ত হব। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি শক্তিমান, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। -সূরা মুজাদালা (৫৮) : ২১

وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ. اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ. وَ اِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ.

আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে পূর্বেই আমার একথা স্থিরীকৃত রয়েছে যে, নিশ্চিতভাবেই তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। এবং নিশ্চয়ই আমার বাহিনীই হবে জয়যুক্ত। -সূরা সাফফাত (৩৭) : ১৭১-১৭৩

কুরআনের ঈমানদার পাঠক আরো দেখতে পাবেন যে, আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূলের যেসব ঘটনা, তাঁদের দাওয়াতের যে বর্ণনা এবং এক্ষেত্রে ঘটে যাওয়া দ্বন্দ্ব-সংঘাত, লড়াই, চক্রান্ত, কওমের সম্মিলিত শত্রুতা ও জোটবদ্ধতার যে বৃত্তান্ত তুলে ধরেছেন, তাতে সবসময় একদিকে ছিল কোনো কমজোর মর্দে ফকীর, অন্যদিকে কোনো বিত্তবান প্রভাবশালী গোষ্ঠী অথবা কোনো স্বৈরাচারী শাসক। কিন্তু এই ভীতিকর দ্বন্দ্ব-সংঘাতের যে পরিণাম কুরআন মাজীদে উল্লেখিত হয়েছে তা হচ্ছে, পরিশেষে নববী দাওয়াতের ঝাণ্ডাবাহী ব্যক্তি তার বাহ্যিক দুর্বলতা ও উপকরণহীনতা সত্ত্বেও বিজয়ী হয়েছেন আর বিত্ত-বৈভবের অধিকারী প্রভাবশালী গোষ্ঠী, দাম্ভিক শাসক তাদের সকল ক্ষমতা ও উপায়-উপকরণের প্রাচুর্য সত্ত্বেও ব্যর্থ ও পরাজিত হয়েছে কিংবা এ দাওয়াতের বাধ্য-অনুগত হয়েছে।

ইতিহাসের এই ধারা কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়; বরং এ হচ্ছে শাশ্বত আসমানী নিয়ম ও ফয়সালা। আর বলাবাহুল্য যে, আল্লাহ তাআলার শক্তি ও ফয়সালার সাথে 'অকস্মাৎ ঘটে যাওয়া'

বা ‘ঘটনাচক্রে ঘটে যাওয়া’র কোনো সম্পর্ক নেই। এসব তো নিতান্তই মূর্খ ও কর্মবিমুখ লোকদের সান্ত্বনা লাভের উপকরণমাত্র।

এই ইতিবৃত্ত কুরআন মাজীদে বারবার শোনানো হয়েছে এবং এর দ্বারা ঐ সর্বশক্তিমান সত্তার প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দেয়া হয়েছে, যিনি সকল উপায়-উপকরণের স্রষ্টা ও মালিক। উপায়-উপকরণের কার্যকারিতাও তাঁরই হাতে। তাঁরই আদেশে এগুলো কার্যকর হয়, তাঁরই আদেশে অকার্যকর হয়ে পড়ে।

সেই সর্বশক্তিমান সত্তা এইসকল উপায়-উপকরণ সৃষ্টি করার পর নিজে অক্ষম হয়ে যাননি। অন্যকে তা দান করে নিজে রিক্তহস্ত হয়ে পড়েননি। কোনো কিছুকে সৃষ্টি বা অস্তিত্ব দানের জন্য, বিজয় ও সাফল্য তৈরির জন্য তিনি এসব উপায়-উপকরণের মুখাপেক্ষীও নন।

এইসকল বৃত্তান্ত হকের শক্তি ও তা বিদ্যমান থাকার যোগ্যতা আর বাতিলের দুর্বলতা ও ভিত্তিহীনতাকে প্রমাণ করে দেয় এবং পাঠককে ঈমানের দাওয়াত দেয়।’ -মানসিবে নবুওত আওর উসকে আলী মাকাম হামিলীন, পৃ. ১৩৩-১৩৫

কুরআন মাজীদে আম্বিয়ায়ে কেরামের দাওয়াতের ইতিবৃত্ত সম্পর্কে দায়ীয়ে ইসলাম এখানে যা কিছু বলেছেন তা সবচেয়ে বিস্তারিত ও প্রাঞ্জলভাবে দেখা যাবে খাতামুন্নাবিয়্যীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে। কুরআন মাজীদে তাঁর দাওয়াতের বৃত্তান্তই সবচেয়ে বিস্তারিতভাবে এসেছে। আর তাই কুরআনের ঈমানদার মনোযোগী পাঠক সর্বোত্তম সূত্র থেকে শ্রেষ্ঠ নবী ও শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাতের জ্যোতির্ময় সান্নিধ্য লাভে সক্ষম হয়ে থাকেন। দাওয়াত ইলাল্লাহর অপরিহার্য দায়িত্ব পালনে যার কোনো বিকল্প নেই।

সারকথা হচ্ছে, ইসলামী জীবন-ব্যবস্থায় প্রত্যেক মুমিনের যে অপরিহার্য দায়িত্ব- নিজের ও অন্য সকলের ঈমান-আমল গঠনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, এক্ষেত্রে সীরাত ও সুন্নাহ্ই হচ্ছে ঐ নির্বিকল্প আলোকবর্তিকা, কিয়ামত পর্যন্ত সকল মুমিনকে বারবার যার কাছে ফিরে আসতে হবে। দেখার বিষয় হচ্ছে, ঐ ঐশী আলোকধারা থেকে কে কতটুকু নিজেকে আলোকিত করে।

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রাহ.-এর ভাষায়-

وَإِذَا كَانَتْ سَعَادَةُ الْعَبْدِ فِي الدّارَيْنِ مُعَلّقَةً بِهَدْيِ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِوَسَلّمَ فَيَجِبُ عَلَى كُلّ مَنْ نَصَحَ نَفْسَهُ وَأَحَبّ نَجَاتَهَا وَسَعَادَتَهَا أَنْ يَعْرِفَمِنْ هَدْيِهِ وَسِيرَتِهِ وَشَأْنِهِ مَا يَخْرُجُ بِهِ عَنِ الْجَاهِلِينَ بِهِ، وَيَدْخُلُ بِهِ فِيعِدَادِ أَتْبَاعِهِ وَشِيعَتِهِ وَحِزْبِهِ، وَالنّاسُ فِي هَذَا بَيْنَ مُسْتَقِلّ وَمُسْتَكْثِرٍوَمَحْرُومٍ، وَالْفَضْلُ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.

যেহেতু বান্দার উভয় জাহানের সৌভাগ্য ও সফলতা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের মাঝেই নিহিত তাই যে নিজের কল্যাণ, মুক্তি ও সফলতা কামনা করে তার কর্তব্য হচ্ছে, নবীজীর সীরাত ও তাঁর হেদায়েত-নির্দেশনা সম্পর্কে এ পরিমাণ জ্ঞান অর্জন করা, যাতে সে এ বিষয়ে অজ্ঞদের কাতার থেকে বের হতে পারে এবং এর মাধ্যমে সে নবীজীর দল ও অনুসারীদের কাতারে প্রবেশ করতে পারে।

আর এক্ষেত্রে মানুষ কয়েক ভাগে বিভক্ত। কেউ তো এ বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখে, কেউ সামান্যই জানে আবার কেউ একেবারেই অজ্ঞ থেকে যায়। বস্তুত এটি আল্লাহর অনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। তিনি তো মহা অনুগ্রহশীল। (যাদুল মাআদ ১/৬৯)

পবিত্র সীরাতকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে

সীরাত-সুন্নাহর সঠিক জ্ঞান অর্জন ও তার যথার্থ অনুসরণের জন্য দুটো বিষয় খুব মনোযোগের দাবিদার :

এক. সীরাতের জ্ঞান সঠিক সূত্র থেকে গ্রহণ করা। আর

দুই. সঠিক বিষয়টি সঠিকভাবে বোঝা ও উপলব্ধি করা।

এ দুই শর্ত পূরণ হলে আশা করা যায়, এ অনুসরণ সুন্নাহর অনুসরণ হবে। অন্যথায় তা হবে সুন্নাহর শিরোনামে অন্য কিছুর অনুসরণ।

কোনো রেওয়ায়েত বা বর্ণনা যখন সামনে আসে তখন প্রথমে দেখতে হয় তা বিশুদ্ধ ও প্রমাণিত কি না। যে কোনো বইয়ে যে কোনো বর্ণনা পাওয়ামাত্রই তা গ্রহণ করার সুযোগ নেই। বিশেষত যেসকল বর্ণনায় কুরআন-সুন্নাহর পারদর্শী উলামা-সুলাহার যুগ যুগ ধরে চলে আসা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং নীতি ও কর্মের বিপরীত কিছু প্রতীয়মান হয়।

এরপর রেওয়ায়েতের অর্থ-মর্ম, প্রয়োগক্ষেত্র ও প্রয়োগ-পদ্ধতি সঠিকভাবে বুঝতে হবে। সঠিকভাবে বোঝার পর যে অনুসরণ হবে, সেটিই হবে প্রকৃত অনুসরণ। অন্যথায় তা প্রকৃত অনুসরণ হবে না। কোনো বর্ণনার ভুল অর্থ বুঝে কেউ যদি তা পালন করে তাহলে সেটিকে ঐ ব্যক্তির বুঝের অনুসরণ বলা যেতে পারে, সীরাতের অনুসরণ বলা যাবে না। কারণ তিনি যে অর্থ অনুসারে আমল করছেন তা তো ঐ বর্ণনায় বলাই হয়নি। কাজেই এ বিষয়ে সতর্ক-সচেতন হতে হবে।

পবিত্র সীরাতকে সঠিকভাবে বোঝার জন্য পশ্চিমা ধ্যান-ধারণার ব্যাপারে সতর্ক হওয়াও খুব প্রয়োজন। বিশেষত পশ্চিমের ইহবাদী চিন্তা মুসলিম-সমাজেরও এক শ্রেণির চিন্তাবিদ-দার্শনিককে অত্যন্ত গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। শিক্ষা-দীক্ষা, নিরক্ষরতা দূরিকরণ, মানবসেবা, সমাজসেবা, কর্মসংস্থান, জীবনমানের উন্নয়ন ইত্যাদি কোনো কিছুই ইসলামে নিন্দিত নয়, কিন্তু বর্তমান ইহবাদী জীবন-দর্শন আখেরাতের মুক্তি ও নাজাত সম্পর্কে সম্পূর্ণ গাফেল হয়ে এই সবকিছুকে নিছক জাগতিক উন্নয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। এ যেন কুরআন মাজীদের বর্ণনায়ই এক বাস্তব উদাহরণ-

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ وَ هُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ.

তারা পার্থিব জীবনের প্রকাশ্য দিকটাই জানে আর আখেরাত সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ গাফেল। -সূরা রূম (৩০) : ৭

ইতিহাসে পাই, পশ্চিমা ইহবাদী চিন্তা-দর্শনের অধিকারী একশ্রেণির সমাজ-বিপ্লবীর দ্বারা বিভিন্ন সময় পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে শোষক ও স্বৈরাচারী-বিরোধী বহু আন্দোলন-সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছে। যেসব সংগ্রামের মানবতাবাদী শ্লোগান ও শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামমুখর অবস্থান মানুষকে ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট করলেও বলাই বাহুল্য যে, তাতে মানবতার প্রকৃত মুক্তির যোগ্যতা

অনুপস্থিত ছিল। একে তো এসব বিপ্লবী দশর্নে না ছিল আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও আখিরাতের জবাবদিহিতার চেতনার কোনো স্থান, না ছিল মানুষের পারলৌকিক নাজাত ও মুক্তির কোনো বার্তা। দ্বিতীয়ত মানুষের জাগতিক মুক্তি ও সাম্যেরও যথার্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা তাতে অনুপস্থিত ছিল। ফলে এসব ইহবাদী বিপ্লবের শেষ পরিণাম ছিল মানুষকে এক স্বৈরাচারের কারাগার থেকে আরেক স্বৈরাচারের কারাগারে নিক্ষেপ করা।

সমাজ-বিপ্লবের এই ইহবাদী ধারা কাঠামো ও ফলাফলের বিচারে যতই ব্যর্থ ও খণ্ডিত হোক, একটা সময় পর্যন্ত তা ব্যাপকভাবে চর্চিত ও আলোচিত হয়। যুগ যুগ ধরে তা শিল্প-সাহিত্যের এক বিরাট অঙ্গনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। ফলে এসব চিন্তা-দর্শনের স্লোগান ও পরিভাষা আধুনিক শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে পরিচিত ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। দুঃখজনক বিষয় এই যে, মুসলিম-সমাজের একশ্রেণির লেখক-চিন্তাবিদ এই ইহবাদী ধারার সমাজ-বিপ্লবীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাদের ভাষায় ইসলামের দাওয়াতকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন, যা সীরাত ও সুন্নাহকে তার প্রকৃত রূপে বোঝার ক্ষেত্রে বড় ধরনের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মুফাককিরে ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রাহ. লেখেন-

‘বর্তমান যুগের কিছু ইসলামপ্রিয় লেখক-সাহিত্যিক, মুসলিম উম্মাহর পুনর্জাগরণের কিছু দায়ী ও নেতৃত্বও ঐসব চিন্তাভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েন। তারা আম্বিয়ায়ে কেরামের দাওয়াত ও সীরাতের ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করেন প্রচলিত রাজনীতি ও সমাজনীতির ভাষায়, যা বর্তমান যুগের মানুষের জন্য নবুওতের স্বরূপ ও মর্যাদা, আম্বিয়ায়ে কেরামের রুচি-প্রকৃতি, তাঁদের পয়গাম ও দাওয়াতের ধরন ও বৈশিষ্ট্য এবং তাদের সকল কর্মতৎপরতার মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সঠিকভাবে বোঝার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং তাদের সঠিক ইত্তিবা ও অনুসরণের ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধক হচ্ছে। এই চিন্তাধারা মন-মস্তিষ্ককে ঐ রাস্তার দিকে (ইহবাদ) নিয়ে যাচ্ছে, যা নবুওতের পথ-পদ্ধতির সাথে কিছুতেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।’ -মানসিবে নবুওত, পৃ. ৫৩

আম্বিয়ায়ে কেরামের দাওয়াতের বিশেষত্ব বর্ণনা করে হযরত মাওলানা লেখেন-

‘আম্বিয়ায়ে কেরামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, যার মাধ্যমে তাঁরা অন্য সবার চেয়ে আলাদা, তা এই যে, তারা যে ইলম প্রচার করেন, যে আকীদার দিকে মানুষকে ডাকেন এবং যে পয়গামের তাবলীগের দায়িত্ব তাদের উপর অর্পিত- তা না তাদের মেধা ও মননের ফসল, না তাদের চারপাশের সামাজিক অনাচার-অবক্ষয়ের প্রতিক্রিয়া, না তাদের সূক্ষ্ম সংবেদনশীল অনুভব-অনুভূতির সৃষ্টি, আর না তাদের ব্যাপক ও গভীর প্রজ্ঞাপূর্ণ অভিজ্ঞতার ফলাফল; বরং এর সূত্র হচ্ছে আসমানী ওহী ও নির্দেশনা, যা ধারণ ও বহনের জন্য তারা আল্লাহর পক্ষ হতে নির্বাচিত ও সৌভাগ্যপ্রাপ্ত। একারণে কিছুতেই তাদেরকে অন্য সকল কবি-দার্শনিক, সমাজ-চিন্তক ও সমাজপতির কাতারে দাঁড় করানো যায় না, কারণ এদের উপস্থাপিত মতবাদ হয়তো তাদের চারপাশের সমাজ ও পরিবেশের ফসল, অথবা তাদের ব্যক্তিগত মেধা-মননের ফলাফল কিংবা

পরিবেশ-পারিপার্শিকতার প্রতিধ্বনি আর না হয় চারপাশের অবিচার-অরাজকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়া।

এই প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার সূক্ষ্ম লক্ষণসমূহ- যা কখনো কখনো অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া দৃষ্টিগোচর হয় না- এমন অনেক ইসলামপ্রিয় লেখক-চিন্তকের লেখাজোখায় দৃষ্টিগোচর হয়, যাদের বর্তমান ইহবাদী জীবন-দর্শন, পশ্চিমা রাজনৈতিক অগ্রযাত্রা, নিজ দেশের মুসলমানদের অব্যবস্থিত জীবনযাত্রা বা গোলামীর যিন্দেগী ইসলামের পাঠ ও অধ্যয়নে, পরিস্থিতির মোকাবেলায় এবং ঐসকল দর্শন ও জীবন-ব্যবস্থার সমান্তরালে 'ইসলামী দর্শন ও জীবন-ব্যবস্থা'র উপস্থাপনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। তাদের আলোচনা, উপস্থাপনা ও চিন্তার গতিপ্রকৃতির মধ্যে এই প্রতিক্রিয়ার ছায়া এমন যে কোনো ব্যক্তির খুব সহজেই দৃষ্টিগোচর হতে পারে, যিনি পরিবেশের প্রভাব ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ঊর্ধ্বে উঠে মুক্ত মনে সরাসরি কিতাব-সুন্নাহর অধ্যয়নের সুযোগ পেয়েছেন। একইসাথে এই আধুনিক দর্শন ও জীবন-ব্যবস্থার লৌহকঠিন প্রভাব এবং দেহমনে এর গভীর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কেও সচেতন।

এই আধুনিক ইসলামী সাহিত্য এবং ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর নবজাগরণের প্রচেষ্টাসমূহকে যদি দ্বীন ও ইলমেদ্বীনের পরিপক্বতার অধিকারী কিংবা ঈমানী সোহবত ও তারবিয়তের সৌভাগ্যপ্রাপ্ত নায়েবে নবী ও মুসলিহ-মুজাদ্দিদগণের কর্মপন্থার সাথে তুলনা করা হয় তাহলে এ দুই ধারার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। প্রথমোক্ত দলের কর্মতৎপরতার বড় লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হয়ে থাকে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা অর্জন, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং মানবজীবনের শান্তি-শৃঙ্খলা বিধান, পক্ষান্তরে দ্বিতীয় দলের মূল লক্ষ্য হয় আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন, আখিরাতের সফলতা, ঈমান ও নেক আমলের প্রেরণা এবং নবীর অনুসরণ ও আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করার জযবা...'। -মানসিবে নবুওত আওর উসকে আলী মাকাম হামিলীন, পৃ. ৫৫-৫৬

আমাদের কর্তব্য, পবিত্র সীরাত ও তার ঘটনাবলির অধ্যয়ন ও নির্দেশনা গ্রহণের ক্ষেত্রে এই মৌলিক আলোচনা মনে রাখা। তাহলে আশা করা যায়, আমাদের সীরাত পাঠ আমাদের মধ্যে যথার্থ ঈমান, আমল, আল্লাহমুখিতা ও আখিরাতমুখিতা তৈরি করবে। পবিত্র সীরাতের আলোকিত সান্নিধ্য আমাদের 'রাব্বানী' হয়ে ওঠারই পয়গাম শোনায়।

আল্লাহ তাআলা নিজ ফযল ও করমে আমাদের তাওফীক দান করুন।

هذا وصلى الله تعالي على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابهأجمعين، وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين

প্রাক কখন: নবুওয়াত পূর্ববর্তী আরব

সীরাহ লেখকগণ সাধারণত নবীজির জন্মের সময়কাল থেকে সীরাহ শুরু করেন না, বরং এই মিল্লাতের পিতা ইবরাহীমের ওর ঘটনা দিয়ে শুরু করেন। আর শুরুতেই থাকে ইবরাহীম এর কর্তৃক স্ত্রী হাজেরা গুত্র ও পুত্র ইসমা'ঈলকে এ মক্কায় রেখে আসার কাহিনি।

ইবরাহীমের কাহিনি

যমযম কূপের উদ্ভব

ইবরাহীম (আ) তাঁর স্ত্রী হাজেরা (আ) ও সদ্যজাত পুত্র ইসমা'ঈলকে নিয়ে হিজাযের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি তাদেরকে যে জায়গাটিতে নিয়ে যান সে জায়গাটিই এখন মক্কা নামে পরিচিত। ওই সময় মক্কা ছিল জনমানবশূন্য। তবে যে স্থানে কাবা নির্মাণ করা হয়েছিল তা সৃষ্টির শুরু থেকেই পবিত্র ছিল। ইবরাহীম তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকে অল্প কিছু পানি ও এক থলে খেজুরসহ সেই নিরিবিলি জায়গায় রেখে আসেন। তারপর কিছু না বলেই সেখান থেকে উল্টো পথে হাঁটা শুরু করেন।

হাজেরা (আ) বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর স্বামী তাদেরকে রেখে যাবেন, কিন্তু তিনি এটা আশা করেননি যে এরকম জনমানবহীন মরুভূমির মাঝে তিনি তাদেরকে এভাবে ফেলে চলে যাবেন। তিনি স্বামীর পিছে পিছে গিয়ে প্রশ্ন করেন, 'ইবরাহীম, আপনি কি আমাদেরকে এখানে ফেলে রেখে যাচ্ছেন? এখানে না আছে কোনো জনবসতি, না কোনো ফল-ফসল।'

ইবরাহীম (আ) চুপ করে রইলেন।

তাঁর স্ত্রী আবারও একই প্রশ্ন করলেন, ইবরাহীম (আ) কোনো উত্তর দিলেন না। তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করা হলো। তখনও তিনি নিশ্চুপ।

হাজেরা (আ) প্রশ্ন করলেন, 'তবে কি আল্লাহ তাআলা আপনাকে এ নির্দেশ দিয়েছেন?'

এবার উত্তর এল, 'হ্যাঁ।'

হাজেরা (আ) বললেন, 'তাহলে চিন্তার কোনো কারণ নেই। আল্লাহ তাআলাই আমাদের দেখাশোনা করবেন। তিনি আমাদের কখনোই অবহেলা করবেন না।'

হাজেরা (আ) জানতেন, যদি আল্লাহ তাআলার আদেশে ইবরাহীম (আ) তাদেরকে এমন জনমানবহীন অঞ্চলেও রেখে যান, তবুও দুশ্চিন্তার কিছু নেই, কেননা আল্লাহ তাআলাই এই আদেশ করেছেন। আল্লাহ তাআলার উপর তাঁর এই বিশ্বাস আছে যে আল্লাহ তাআলাই তাঁকে দেখে রাখবেন। যদি সে আদেশ হয় এরকম নিরিবিলি স্থানে একাকী বসবাস করা, তবে সেখানেও আল্লাহর হেফাজতের চাদর তাদের ঘিরে রাখবে।

ইবরাহীম (আ) চলে গেলেন। তিনি অনেক দূরে চলে গেলেন, তাঁর স্ত্রী ও ছেলেকে আর দেখা যাচ্ছিল না। তখন কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে একটি দুআ করেন। এই চমৎকার দুআটি আছে কুরআনের সূরা ইবরাহীমে,

"হে আমাদের রব, আমি নিজের এক সন্তানকে তোমার পবিত্র গৃহের সন্নিকটে অনুর্বর উপত্যকায় আবাদ করেছি। হে আমাদের রব, যাতে তারা সালাত কায়েম রাখে। আপনি কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দিন এবং তাদেরকে রিযিক প্রদান করুন ফল-ফলাদি থেকে, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।" (সূরা ইবরাহীম, ১৪: ৩৭)

Maslow's hierarchy of needs নামে একটি তত্ত্ব আছে যেখানে মানুষের বিভিন্ন চাহিদাকে একটি পিরামিড আকারে দেখানো হয়েছে। এই পিরামিডের সবচেয়ে নিচের স্তরে আছে মানুষের শারীরবৃত্তীয় চাহিদা। অর্থাৎ এই তত্ত্ব অনুসারে শারীরিক চাহিদা (যেমন খাদ্যগ্রহণ) মানব জাতির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা। গুরুত্বের দিক থেকে এর পরে আছে যথাক্রমে সামাজিক চাহিদা (সমাজবদ্ধ হয়ে থাকা), আধ্যাত্মিক চাহিদা (ধর্মচর্চা) এবং পিরামিডের চূড়ায় আছে আত্মোপলব্ধি; নিজের সম্ভাবনা ও প্রতিভাকে আবিষ্কার করে তা বিকশিত করতে ধাবিত হওয়া (self-actualization)। মাসলোর এই তত্ত্ব অনুযায়ী বলতে হয়, একজন মানুষ প্রথমে তার শারীরবৃত্তীয় চাহিদা পূরণ করতে সচেষ্ট হবে, তারপর দলবদ্ধ হয়ে থাকতে শুরু করবে, এরপর ধর্মের খোঁজ করবে এবং অবশেষে সে নিজস্ব স্বকীয়তা ও সৃষ্টিশীলতার সন্ধান করতে শুরু করবে।

কিন্তু ইবরাহিমের (আ) দুআতে তত্ত্বের এই পিরামিডটিকে সম্পূর্ণ উল্টো রূপে দেখা যায়। তিনি তাঁর পরিবারের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে প্রথমেই যা চেয়েছেন তা হলো-লি ইউকীমুস স্বলাহ-

যেন তারা সালাত কায়েম করে। অর্থাৎ তিনি প্রথমে অগ্রাধিকার দিয়েছেন আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণের প্রতি। এরপর তিনি দুআ করেছেন, ফাজ 'আল আফ-ইদাতাম মিনান নাস-আপনি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করুন। এখানে তিনি তাঁর পরিবারের জন্য মানুষের অন্তরে ভালোবাসা গড়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে অনুরোধ করেছেন। এটি হলো তাঁর পরিবারের জন্য সামাজিক চাহিদা। সবশেষে তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে যা চাইলেন তা হলো রিযক অর্থাৎ তাদের শারীরবৃত্তীয় চাহিদাপূরণ-ওয়ারযুকুহুম মিনাস সামারাত- তাদেরকে ফলাদি দ্বারা রুজি দান করুন। তবে এখানে এটাও লক্ষণীয়, ইবরাহীম তাঁর দুআর শেষ অংশে শুধুমাত্র রুজির ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেননি বরং এর সাথে ইবাদাতের ব্যাপারটিও যুক্ত করে দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, লা আল্লাহুম ইয়াশকুরুন-যেন, তারা শুকরিয়া আদায় করে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

ইবরাহীম এর চলে গেলেন। মা হাজেরার এ কাছে অল্প যে খাবার ছিল তা কিছুদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। আর ইসমা'ঈল তখনো ছিলেন দুধের শিশু। হাজেরা তাঁর শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছিলেন কিন্তু সেই দুধও একসময় শুকিয়ে গেল। ইসমা'ঈল প্রচণ্ড ক্ষুধায় কাঁদছে। সন্তানের কান্না সহ্য করতে না পেরে মা খাদ্যের খোঁজে বের হলেন। একটি পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন, এ পাহাড়ই পরে আস-সাফা নামে পরিচিত হয়েছিল। সেই পাহাড়ের উপর উঠে একবার ডানে তাকান, আবার বাঁয়ে তাকান, কিন্তু তিনি কাছাকাছি কোনো মানববসতির সন্ধান পেলেন না। এরপর পাহাড় থেকে নেমে উপত্যকায় ফিরে এলেন, কাপড় গুটিয়ে এবার উঠতে লাগলেন আরেকটি পাহাড়ে, পরবর্তীতে যা আল-মারওয়া নামে পরিচিত হয়। এ পাহাড়ের চূড়ায় উঠেও ডানে-বায়ে তাকাতে লাগলেন। কিন্তু এবারও কাউকে দেখতে পেলেন না।

একদিকে পুত্র ইসমা'ঈল প্রচণ্ড ক্ষুধায় কাতরাচ্ছে, অন্যদিকে মা হাজেরা (আ) এর কিছু পাওয়ার আশায় আস-সাফা ও আল-মারওয়া পাহাড় দুটির মাঝে ছোটাছুটি করছেন। এভাবে ইতিমধ্যে সাতবার দুই পাহাড়ে ওঠানামা করে ফেলেছেন। সপ্তম বার তিনি যখন পাহাড়ের চূড়ায় উঠলেন, তখন একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন। আওয়াজটি কোথা থেকে এসেছে তা বোঝার জন্য আশেপাশে তাকাতে লাগলেন। হঠাৎ অবাক বিস্ময়ে আবিষ্কার করলেন যে, শিশু ইসমা'ঈলের পায়ের কাছ থেকে আওয়াজটি আসছে। আল্লাহ তাআলার নির্দেশে জিবরীল (আ) ও সেখানে যমযম কূপ খনন করে দিয়েছেন আর হাজেরা এই কুপের আওয়াজই শুনতে পেয়েছিলেন। প্রচণ্ড খুশিতে তিনি পানির উৎসের দিকে দৌড়ে গেলেন। মরুভূমিটি শুষ্ক ছিল, তাই পানি শুকিয়ে যেতে পারে চিন্তা করে হাজেরা পানি ধরে রাখার জন্য কুয়ার মতো একটি জায়গা তৈরি করলেন। এ ঘটনা বর্ণনা করার সময় রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন, 'ইসমা'ঈলের (আ) মায়ের উপর আল্লাহ

তাআলা রহম করুন। তিনি যদি এভাবেই তা ফেলে রাখতেন তাহলে সেখানে নদী প্রবাহিত হয়ে যেত', অর্থাৎ তিনি কুয়া বানিয়ে পানি ধরে না রাখতেন তাহলে তা থেকে একটি নদী প্রবাহিত হতো।

চোখের সামনে ক্ষুধায় কাতর পুত্রের কষ্ট ও কান্না দেখে নিশ্চয়ই হাজেরা (আ) অনেক কষ্ট পাচ্ছিলেন, তাঁর বুক ভেঙে গিয়েছিল, হয়তোবা তিনি কাঁদছিলেনও। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন মু'মিনাহ ও মুত্তাকী বান্দী। আল্লাহ আযযা ওয়াজাল তাঁকে পরীক্ষা করছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য এক মহাপুরস্কার ঠিক করে রেখেছিলেন, কিন্তু হাজেরা তা জানতেন না। তাই তিনি নিশ্চয়ই প্রচণ্ড কষ্টের মাঝে ছিলেন। হাজেরার এই ঘটনা বর্ণনা করার সময় রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন, 'আর এ কারণেই আমরা (হাজ্জের সময়) সাফা-মারওয়ায় ওঠানামা করি।' অর্থাৎ আজ পর্যন্ত আমরা হাজেরার পদাঙ্ক অনুসরণ করে এসেছি। হাজেরা যদি জানতে পারতেন যে এমন এক সময় আসবে যখন সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মুসলিম তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করবে তাহলে তিনি মুখে এক চিলতে হাসি নিয়েই সাফা-মারওয়ায় ওঠানামা করতেন।

এ ঘটনা থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। মাঝে মাঝে আল্লাহ আমাদেরকে বিশেষ কিছু পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে পরীক্ষা নেন, কিন্তু আমরা জানি না আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য কী ঠিক করে রেখেছেন। কোনো কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, হাজেরাও এক সময় কষ্টকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন আর সেই মুহূর্তে আল্লাহ তাআলার উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাসের কারণে তাঁকে দেওয়া হয়েছে এক অসাধারণ প্রতিদান।

কুরাইশ বংশের উৎপত্তি

জুরহুম গোত্র দীর্ঘ দিন ধরে মক্কায় ছিল। ধীরে ধীরে তারা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং ক্ষমতার অপব্যবহার শুরু করে। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের স্থলে বনু খুযাআ গোত্রকে পাঠান। বনু খুযাআ জুরহুম গোত্রকে মক্কা থেকে বের করে দেয়। বনু খুযাজা ছিল একটি ইয়েমেনি গোত্র এবং অন্যান্য গোত্রসমূহের মতো এটিও ইয়েমেন ত্যাগ করেছিল। অবশেষে তারা হিজাযে কর্তৃত্ব স্থাপন করে। এদিকে জুরহুম মক্কা ছেড়ে যাওয়ার আগে দুটো কাজ করলো, প্রথমত, তারা যমযম কূপের মুখ বন্ধ করে এর সমস্ত চিহ্ন মুছে দিল। দ্বিতীয়ত, আল-কাবার ভেতরে যে মূল্যবান সম্পদগুলো ছিল সেগুলো তারা সাথে করে নিয়ে গেল।জুরহুম গোত্র চলে যাওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই মক্কার শাসন ক্ষমতা চলে গেল বনু খুযাআর হাতে। যদিও সে সময় ইসমাঈলের (আ) বংশধররা সংখ্যায় অনেকগুণ বেড়ে যায় এবং অনেক গোত্রে বিভক্ত হয়ে সমগ্র আরবে ছড়িয়ে পড়ে। মক্কায় একটিমাত্র শাখা গোত্র রয়ে যায় আর এই শাখা গোত্রটির নাম হলো কুরাইশ। অর্থাৎ ইসমাঈল, এ থেকে উদ্ভূত গোত্রগুলোর একটি হলো কুরাইশ। তবে মক্কার কর্তৃত্ব তখনো কুরাইশদের হাতে নয়, বরং বনু খুযাআর হাতেই ছিল।বনু খুযাআর অন্যতম নেতা ছিল আমর ইবন লুহাই আল খুযাই। আরবের ধর্মীয় পটভূমির আলোচনায় তাকে নিয়ে আলোচনা করা হবে। অন্যদিকে কুরাইশদের নেতা ছিল কুসাই ইবন কালব-সে সকল কুরাইশকে ঐক্যবদ্ধ করে বনু খুযাআর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং তাদেরকে পরাজিত করে মক্কা থেকে বের করে দেয়। প্রথমবারের মতো মক্কার রাজনৈতিক ও ধর্মীয়-উভয় নেতৃত্ব কুসাই তথা কুরাইশদের হস্তগত হয়। কুসাইর হাতে তখন কাবা ঘরের অভিভাবকত্ব চলে আসে। সে একই সাথে কাবা ঘরের সিকায়াহ ও নিফাদা এর ব্যাপারে কর্তৃত্বশীল হয়। সিকায়াহ ও নিফাদা হলো কাবায় আগত হাজীদের খাবার ও পানি পান করানোর দায়িত্ব।এই কাজগুলো সাধারণভাবে খুব আহামরি মনে না হলেও আরবে আল্লাহ তাআলার অতিথিদেরকে আপ্যায়ন করতে পারাটা অত্যন্ত সম্মানজনক একটি ব্যাপার ছিল। এই দায়িত্ব লাভের মাধ্যমে হাজ্জ করতে আগত হাজীদের মেহমানদারির দায়িত্ব বর্তায় কুরাইশদের উপর। তৎকালীন কুরাইশদের রাজনৈতিক পরিষদ আন-নাদওয়ার কর্তৃত্বও কুসাই ইবন কালবের হাতে ছিল। আন-নাদওয়া ছিল অনেকটা বর্তমান যুগের সংসদের মতো। তার হাতে আরও ছিল আল-লিওয়ার নিয়ন্ত্রণ। আল-লিওয়া ছিল যুদ্ধের ব্যানার, অর্থাৎ যুদ্ধ ঘোষণা দেওয়ার সকল ক্ষমতাও ছিল কুসাইয়ের হাতে। এক কথায় বলা যায় যে কুসাই ইবন কালব ছিল তৎকালীন মক্কার একচ্ছত্র অধিপতি।কুসাই ইবন কালবের মৃত্যুর পর এসব ক্ষমতা তার সন্তানরা নিজেদের মাঝে ভাগ করে নেয়। কুসাইয়ের নাতি আমর পৈত্রিক সূত্রে হাজীদের খাবার ও পানীয় দিয়ে আপ্যায়ন করার দায়িত্ব লাভ করেন। সচরাচর শুধুমাত্র স্যুপ দিয়ে হাজীদের আপ্যায়ন করা হতো। কিন্তু আমর এ খাবারে কিছুটা নতুনত্ব আনেন। তিনি রুটি ছিঁড়ে স্যুপের মধ্যে ভেজানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। ফলে খাবারটির স্বাদ আরও বেড়ে গিয়েছিল। কোনো কিছু

ভেঙ্গে গুঁড়ো করার পদ্ধতিকে আরবিতে 'হাশম' বলা হয়। এই হাশম থেকেই তখন আমরকে হাশিম নামে ডাকা হতো। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহর (সা) প্রপিতামহ। হাশিম বিয়ে করেছিলেন মদীনার এক মহিলাকে। এরপর তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে ফিলিস্তিনে যান এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। গাযাতে তাকে দাফন করা হয়। এর মধ্যে তার স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে পড়ে এবং পরবর্তীতে তিনি এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। পুত্রের নাম রাখা হয়েছিল 'শায়বা'। শায়বা মানে হলো বৃদ্ধ লোক। ছোটো শিশুর এরূপ অদ্ভুত নামকরণের কারণ হলো জন্ম থেকেই তার মাথার কিছু চুল ধূসর ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর শায়বার মা ইয়াসরিবে পিতামাতার কাছেই থেকে গিয়েছিলেন। তাই শায়বার ছোটবেলা কেটেছিল ইয়াসরিবে তার নানাবাড়িতে। আর এই ইয়াসরিবে যখন রাসূলুল্লাহ হিজরত করলেন তখন সেই ইয়াসিরবের নাম বদলে হয়ে গেলো মদীনা।

রাসূল সাঃ এর বংশধারা

রাসূল সা.-এর বংশধারাকে তিন ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে। যার প্রথম ভাগ হচ্ছে আদনান পর্যন্ত। যার বিশুদ্ধতা নিয়ে ইতিহাসবিদ ও বংশ বিশেষজ্ঞগণ একমত। দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে, আদনান থেকে হজরত ইবরাহিম আ. পর্যন্ত। এ স্তরের বিশুদ্ধতা নিয়ে ইতিহাসবিদ ও বংশ বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। এ স্তরে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কেউ কেউ চুপ থেকেছেন। আর কেউ কেউ আলোচনা করেছেন। তৃতীয় স্তর হচ্ছে, হজরত ইবরাহিম আ. থেকে নিয়ে হজরত আদম আ. পর্যন্ত। এ স্তরে কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে ভুল রয়েছে সে ব্যাপারে আমরা সন্দেহ পোষণ করি না। ইতিপূর্বেও সংক্ষিপ্ত পরিসরে নবিজির বংশধারা সম্পর্কে ইশারা-ইঙ্গিত করা হয়েছিল। তবে এখন বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে।

প্রথম স্তর : মুহাম্মদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু আবদুল মুত্তালিব; যার আসল নাম শাইবাহ। যার পিতার নাম হাশিম। হাশিমের আসল নাম আমর। তার পিতার নাম আবদে মানাফ। যার আসল নাম মুগিরাহ। তার পিতার নাম কুসাই; যার আসল নাম জাইদ। তার পিতার নাম কিলাব ইবনু মুররাহ ইবনু কাব ইবনু লুওয়াই ইবনু গালিব ইবনু ফাহর (তার উপাধি ছিল কুরাইশ। এ সূত্রেই কুরাইশ বংশের উদ্ভব)। তার পিতার নাম মালিক ইবনু নাজর। যার আসল নাম কাইস। তার পিতার নাম কিনানা ইবনু খুজাইমাহ ইবনু মুদরিকাহ; তার আসল নাম আমির। পিতার নাম ইলয়াস ইবনু মুজার ইবনু নিজার ইবনু মাআদ ইবনু আদনান। [৫৯]

দ্বিতীয় স্তর: আদনান ইবনু উদাদ ইবনু হামাইসা ইবনু সালামান ইবনু আউস ইবনু বুজ ইবনু কামওয়াল ইবনু উবাই ইবনু আওয়াম ইবনু নাশিদ ইবনু হিজা ইবনু বালদাস ইবনু ইয়াদলাফ ইবনু তাবিখ ইবনু জাহিম ইবনু নাহিশ ইবনু মাখি ইবনু আইজ ইবনু আবকার ইবনু উবাইদ ইবনু আদ-দুআ ইবনু হামাদান ইবনু সুনবার ইবনু ইয়াসরিবি ইবনু ইয়াহজুন ইবনু ইয়ালহান ইবনু আরআওয়া ইবনু আইজ ইবনু দিশান ইবনু আইসার ইবনু

আফনাদ ইবনু আইহাম ইবনু মুকসির ইবনু নাহিস ইবনু জারিহ ইবনু সুমাই ইবনু মুজি ইবনু আওজাহ ইবনু ইরাম ইবনু কাইদার ইবনু ইসমাইল ইবনু ইবরাহিম আ.।

তৃতীয় স্তর : ইবরাহিম আ. থেকে ওপরে ইবরাহিম ইবনু তারিহ (আজর) নাহুর ইবনু সারু অথবা সারুগ ইবনু রাউ ইবনু ফালাখ ইবনু আবির ইবনু শালাথ ইবনু আরফাখশান ইবনু সাম ইবনু নুহ আ. ইবনু লামিক ইবনু মাতাওশালথ ইবনু আখমুখ (কথিত আছে এ নাম ছিল ইদরিস আ.-এর নাম) ইবনু ইয়ার ইবনু মাহলায়াল ইবনু কাইনান ইবনু আনুশ ইবনু শিস ইবনু আদম আ.

রাসুলুল্লাহ সাঃ এর জন্ম

রাসুলুল্লাহ সা. মক্কায় বনু হাশিম বংশে ৯ রবিউল আওয়াল সোমবারে জন্মগ্রহণ করেন। সে বছরই হাতির যুদ্ধের ঘটনা ঘটেছিল। সে সময় সম্রাট নওশেরওয়ার সিংহাসনে আরোহণের চল্লিশ বছর পূর্ণ হয়েছিল। জন্ম তারিখ ছিল ২০ অথবা ২২ এপ্রিল। ৫৭১ ঈসায়ি সাল। সাইয়িদ সোলায়মান নদবি, সালমান মনসুরপুরি এবং মুহাম্মদ পাশা ফালাকি গবেষণা করে এ তথ্য প্রদান করেছেন।

ইবনু সাদের বর্ণনায় রয়েছে, রাসুলুল্লাহ সা.-এর মাতা বলেছেন, যখন তিনি জন্মগ্রহণ করেন তখন দেহ থেকে একটি নুর বের হলো, সেই নুর দ্বারা শামদেশের মহলগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ইমাম আহমদ এরবাজ ইবনু সারিয়া থেকে প্রায় একই ধরনের একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।

কোনো কোনো বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, নবুওয়াতের পটভূমি হিসেবে আল্লাহর রাসুলের জন্মের সময় কিছু কিছু ঘটনা প্রকাশ পেয়েছিল। কিসরার রাজপ্রাসাদের ১৪টি পিলার ধসে পড়েছিল, অগ্নিউপাসকদের অগ্নিকুণ্ড নিভে গিয়েছিল, বহিরার গির্জা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এটি ছিল বাইহাকির বর্ণনা। কিন্তু মুহাম্মদ গাজালি এ বর্ণনা সমর্থন করেননি।

জন্মের পর মা আমিনা দাদা আবদুল মুত্তালিবের কাছে নাতির জন্মের সুসংবাদ দেন। তিনি খুব খুশি হলেন এবং সানন্দে তাঁকে কাবাঘরে নিয়ে আল্লাহর দরবারে দুআ করলেন এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। এ সময় তিনি তাঁর নাম রাখেন 'মুহাম্মদ'। এ নাম ছিল আরববাসীর নামের তালিকায় অভিনব। অতঃপর আরবের নিয়ম অনুযায়ী সপ্তম দিন খাতনা করান।

মায়ের পর তাঁকে আবু লাহাবের দাসী সুওয়াইবা দুধ পান করান। সে সময় সুওয়াইবার কোলের শিশুর নাম ছিল মাসরুহ। সুওয়াইবা তাঁর আগে হামজা ইবনু আবদিল মুত্তালিব এবং তাঁর পর আবু সালমা ইবনু আবদিল আসাদ মাখজুমিকে দুধ পান করিয়েছেন।

বক্ষ বিদারণ

এভাবে দুগ্ধ পানের সময়সীমা অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরও বালক নাবী (ﷺ) বনু সা'আদ গোত্রে অবস্থান করতে থাকলেন। দ্বিতীয় দফায় বনু সা'আদ গোত্রে অবস্থান কালে জন্মের ৪র্থ কিংবা ৫ম বছরে তাঁর বক্ষ বিদারণের ঘটনাটি ঘটে। আনাস (রাঃ) হতে সহীহুল মুসলিমে ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত হয়েছে। ব্যাপারটি হচ্ছে একদিন বালক নাবী (ﷺ) যখন সঙ্গী-সাথীদের

সঙ্গে খেলাধূলা করছিলেন এমন সময় জিবরাঈল (আঃ) সেখানে এসে উপস্থিত হন। তারপর তাঁকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে চিৎ করে শুইয়ে দিলেন এবং তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করে হৃৎপিন্ডটি বের করে আনলেন। তারপর তার মধ্য থেকে কিছুটা জমাট রক্ত বের করে নিয়ে বললেন, ‘এটা হচ্ছে শয়তানের অংশ যা তোমার মধ্যে ছিল।’ তারপর হৃৎপিন্ডটিকে একটি সোনার তস্তুরীতে রেখে যমযমের পানি দ্বারা তা ধুয়ে তা যথাস্থানে প্রতিস্থাপন করে কাটা অংশ জোড়া লাগিয়ে দিলেন। এ সময় তাঁর খেলার সঙ্গী-সাথীগণ দৌড়ে গিয়ে দুধমা হালীমাহকে বলল যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) নিহত হয়েছেন। হালীমাহ এবং তাঁর স্বামী এ কথা শুনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও অস্থির হয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে নাবী (ﷺ)-এর মুখমণ্ডলে মালিন্য এবং পেরেশানির ভাব লক্ষ্য করলেন। এ অবস্থার মধ্যে তাঁরা তাঁকে বাড়িতে নিয়ে এসে তাঁরা সেবাযত্নে লিপ্ত হলেন।আনাস (রাঃ) বলেন, আমি তাঁর বক্ষে ঐ সেলাইয়ের চিহ্ন দেখেছি।

স্নেহময়ী মাতৃক্রোড়ে

বালক নাবী (ﷺ)-এর বক্ষ বিদারণের ঘটনায় দুধমা হালীমাহ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে তাঁকে তাঁর মার নিকট ফেরত দেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ছয় বছর বয়স পর্যন্ত মা হালীমাহর ঘরে বড় হন। দুধমা’র ঘর থেকে প্রাণের টুকরো নয়নমণি সন্তানকে ফেরত পাওয়ার পর আমিনাহ ইয়াসরিব গিয়ে তাঁর স্বামীর কবর যিয়ারত করার মনস্থ করেন। তারপর শশুর আব্দুল মুত্তালিবের ব্যবস্থাপনায় শিশুপুত্র মুহাম্মাদ (ﷺ) এবং পরিচারিকা উম্মু আয়মানকে সঙ্গে নিয়ে মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী পাঁচশ’ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে মদীনায় পৌঁছেন। সেখানে এক মাস অবস্থানের পর মক্কায় ফেরার উদ্দেশ্যে তিনি মদীনা থেকে যাত্রা করেন। সামনে মক্কা অনেক দূরের পথ, পেছনে মদীনা তুলনামূলক কম দূরত্বে অবস্থিত। পথ চলার এমন এক পর্যায়ে আমিনাহ হয়ে পড়লেন অসুস্থ। ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকল তাঁর অসুখ। তারপর তিনি ইয়াতিম শিশু নাবী (ﷺ) এবং আত্মীয়-স্বজনকে শোক সাগরে ভাসিয়ে আবওয়া নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন।

পিতামহের স্নেহ-ছায়ার আশ্রয়ে

পিতার মৃত্যুর পর রইলেন স্নেহময়ী মা, মাতার মৃত্যুর পর বেঁচে রইল বৃদ্ধ দাদা। মায়ের মৃত্যুর পর শোকাভিভূত দাদা নিয়ে এলেন পিতা-মাতাহীন পুত্রকে নবুয়ত ও রিসালাতের নিকেতন মক্কায়। প্রাণের চেয়ে বেশী প্রিয় পুত্র আব্দুল্লাহ’র মৃত্যুতে আব্দুল মুত্তালিব যতটা ব্যথা অনুভব করেছিলেন, তার চাইতে অনেক বেশী ব্যথা অনুভব করলেন পুত্রবধূ আমিনাহর মৃত্যুতে। কারণ, আব্দুল্লাহ’র মৃত্যুর পর শিশু মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর অবলম্বন ছিলেন তাঁর মা আমিনাহ। কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পর তাঁর যে আর কোন অবলম্বনই রইল না। এ দুঃখ তাঁর শতগুণে বেড়ে গেল। অন্য

দিকে তেমনি আবার ইয়াতিম শিশুটির জন্য তাঁর স্নেহসুধাও শত ধারায় বর্ষিত হতে থাকল। মনে হতো যেন ঔরসজাত সন্তানের চাইতেও বেশী মাত্রায় তিনি তাঁকে স্নেহ করতে লাগলেন।

ইবনে হিশামের বর্ণনায় আছে যে, কা'বাহ ঘরের ছায়ায় আব্দুল মুত্তালিবের জন্য বিশেষ একটি আসন বিছানো থাকত। আব্দুল মুত্তালিব এ আসনে বসতেন এবং সন্তানগণ বসতেন সেই আসনের পার্শ্ববর্তী স্থানে। পিতার সম্মানার্থে তাঁর কোন সন্তান এ আসনে বসতেন না। কিন্তু শিশু নাবী (ﷺ) সেখানে আগমন করে সেই আসনেই বসতেন। এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে তাঁর চাচাগণ তাঁর হাত ধরে তাঁকে সেই আসন থেকে নামিয়ে দিতেন। কিন্তু আব্দুল মুত্তালিবের উপস্থিতিতে শিশু নাবী (ﷺ)-কে সেই আসন থেকে নামানোর চেষ্টা করা হলে তিনি বলতেন, 'ওকে তোমরা এ আসন থেকে নামানোর চেষ্টা করো না, ওকে ছেড়ে দাও। কারণ, আল্লাহর শপথ! এ শিশুকে সাধারণ শিশু বলে মনে হয় না। ও হচ্ছে ভিন্ন রকমের এক শিশু, অনন্য এক ব্যক্তিত্ব'। তারপর তাঁকে নিজের কাছেই বসিয়ে নিতেন সে আসনে, তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে সোহাগ করতেন এবং তাঁর চাল-চলন ও কাজকর্ম দেখে আনন্দ প্রকাশ করতেন।

নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর বয়স যখন আট বছর দু'মাস দশ দিন তখন তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব মৃত্যুবরণ করলেন। নাবী (ﷺ) এ দুঃখ-শোকের মুহূর্তে দুঃখ-বেদনার বোঝা লাঘব করতে এগিয়ে এলেন চাচা আবূ ত্বালিব। হৃষ্টচিত্তে তিনি আপন কাঁধে তুলে নিলেন বালক মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর লালন-পালনের সকল দায়িত্ব। বৃদ্ধ আব্দুল মুত্তালিব মৃত্যুর আগে আবূ তালেবকে সেই অসিয়তই করে গিয়েছিলেন।

চাচা আবু তালিবের স্নেহ ছায়ায়

দাদার ইনতিকালের পর তিনি চাচা আবু তালিবের সঙ্গে থাকতে লাগলেন। তিনি ছিলেন পিতা আবদুল্লাহ্র সহোদর। 'আবদু'ল-মুত্তালিব তাঁকে তাঁর দেখাশোনা ও তাঁর সঙ্গে উত্তম আচরণের নিমিত্ত বরাবর উপদেশ দিতেন। এ জন্য তিনি একাগ্র চিত্তে তাঁর দিকে মনোযোগ দেন এবং আপন সন্তান 'আলী, জা'ফর ও 'আকীল (রা)-এর চেয়েও বেশী কোমল, স্নেহপরবশ, যত্ন-তদবীর ও প্রতিপালনপ্রবণ হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সাথে রাখেন।

বলা হয়ে থাকে যে, একবার আবূ তালিব বাণিজ্য উপলক্ষে একটি কাফেলার অন্তর্ভুক্ত হয়ে সিরিয়া যাচ্ছিলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বয়স ছিল নয় বছর। তিনি চাচাকে রওয়ানা হতে দেখেই জড়িয়ে ধরেন। আবূ তালিব এতে খুব অভিভূত হয়ে পড়েন এবং ভাতিজাকে সফরসঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করেন। ২

এই বাণিজ্য কাফেলা 'বুসরা' নামক স্থানে পৌছল এবং সেখানে ছাউনি ফেলল। এটি সিরীয় এলাকায় অবস্থিত। এখানে বুহায়রা নামক একজন রাহেব (খৃস্টান সাধু-সন্ন্যাসী)-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। রাহেব তাঁর খানকাহতে বসবাস করতেন। সাধু বুহায়রা অভ্যাসের বিপরীত এই কাফেলাকে দাওয়াত করেন, উষ্ণ আন্তরিকতা সহকারে সকলকে অভ্যর্থনা জানান এবং ভূরিভোজে আপ্যায়িত করেন এজন্য যে, তিনি এই কাফেলার সঙ্গে আল্লাহর বিশেষ রকমের আচরণ ও অস্বাভাবিক ঘটনাবলী দেখতে পাচ্ছিলেন। যখন তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে দেখতে পেলেন তখন তিনি আরও বেশি খাতির-যত্ন করেন এবং নিশ্চিত হন যে, বালকের ভেতর নবুওয়াতের লক্ষণসমূহ বিদ্যমান। তিনি আবূ তালিবকে তাঁর সমুন্নত মর্যাদা ও 'আলীশান সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বলেন, আপনি আপনার ভাতিজাকে নিয়ে ঘরে ফিরে যান এবং ইয়াহুদীদের হাত থেকে তাঁকে বিশেষভাবে হেফাজত করবেন। কেননা আপনার ভাতিজা ভবিষ্যতে বিরাট মর্যাদার অধিকারী হবেন। এরপর আবূ তালিব তাঁকে নিয়ে নিরাপদে মক্কায় ফিরে আসেন।

ফিজার যুদ্ধ

নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর বয়স যখন বিশ বছর তখন ওকায বাজারে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধের একপক্ষে ছিলেন কুরাইশগণ এবং তাঁদের মিত্র বনু কিনানাহ। বিপক্ষে ছিলেন ক্বায়স আয়লান। এ যুদ্ধ ‘ফিজার যুদ্ধ’ হিসেবে খ্যাত। কেননা বনু কিনানাহর বার্রায নামে এক ব্যক্তি ক্বায়স আয়লানের তিন লোককে হত্যা করে। এ খবর ওকাযে পৌছলে উভয় দলের মাঝে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে যুদ্ধ বেধে যায়। কুরাইশ-কিনানা মিত্রপক্ষের সেনাপতি ছিলেন হারব বিন উমাইয়া। কারণ, প্রতিভা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির ফলে তিনি কুরাইশ ও কিনানাহ গোত্রের মধ্যে নিজেকে মান-মর্যাদার উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রথম দিকে কিনানাহদের উপর ক্বায়সদের সমর্থন ছিল বেশী, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে কিনানাহদেরই সমর্থন হয়ে যায় বেশী। অতঃপর কুরাইশের কতক ব্যক্তি উভয় পক্ষের নিহতদের বিষয়ে সমঝোতার লক্ষ্যে সন্ধির প্রস্তাব দেন এবং বলেন যে, কোন পক্ষে বেশি নিহত থাকলে অতিরিক্ত নিহতের দিয়াত গৃহীত হবে। এতে উভয়পক্ষ সম্মত হয়ে সন্ধি করে এবং যুদ্ধ পরিত্যাগ করে পরস্পর শত্রুতা বিদ্বেষ ভুলে যায়। একে ফিজার যুদ্ধ এ জন্যই বলা হয় যে, এতে নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ এবং পবিত্র মাসের পবিত্রতা উভয়ই বিনষ্ট করা হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কিশোর বালক অবস্থায় এ যুদ্ধে গমন করেছিলেন। এ যুদ্ধে তিনি তীরের আঘাত থেকে তাঁর চাচাদের রক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

হিলফুল ফুযূল

ফিজার যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা ও ভয়াবহতা সুচিন্তাশীল ও সদিচ্ছাপরায়ণ আরববাসীগণকে দারুণভাবে বিচলিত করে তোলে। এ যুদ্ধে কত যে প্রাণহানি ঘটে, কত শিশু ইয়াতীম হয়, কত নারী বিধবা হয় এবং কত সম্পদ বিনষ্ট হয় তার ইয়ত্তা করা যায় না। ভবিষ্যতে আরববাসীগণকে যাতে এ রকম অর্থহীন যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির শিকার হতে না হয় সে জন্য আরবের বিশিষ্ট গোত্রপতিগণ আব্দুল্লাহ বিন জুদয়ান তাইমীর গৃহে একত্রিত হয়ে আল্লাহর নামে একটি অঙ্গীকারনামা সম্পাদনা করেন। আব্দুল্লাহ বিন জুদ'আন ছিলেন তৎকালীন মক্কার একজন অত্যন্ত ধণাঢ্য ব্যক্তি। অধিকন্তু, সততা, দানশীলতা এবং অতিথি পরায়ণতার জন্য সমগ্র আরবভূমিতে তাঁর বিশেষ প্রসিদ্ধি থাকার কারণে আবরবাসীগণের উপর তাঁর যথেষ্ট প্রভাবও ছিল। এ প্রেক্ষিতেই তাঁর বাড়িতেই অঙ্গীকারনামা সম্পাদনের এ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়।

যে সকল গোত্র আলোচনা বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন তার মধ্যে প্রধান গোত্রগুলো হচ্ছে বনু হাশিম, বনু মুত্তালিব, বনু আসাদ বিন আব্দুল উযযা, বনু যুহরা বিন কিলাব এবং বনু তামীম বিন মুররাহ। বৈঠকে একত্রিত হয়ে সকলে যাবতীয় অন্যায়, অনাচার এবং অর্থহীন যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রতিকার সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করেন। তখনকার সময়ে নিয়ম ছিল গোত্রীয় কিংবা বংশীয় কোন ব্যক্তি, আত্মীয়-স্বজন অথবা সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ কোন ব্যক্তি শত অন্যায়-অনাচার করলেও সংশ্লি-ষ্ট সকলকে তাঁর সমর্থন করতেই হবে তা সে যত বড় বা বীভৎস অন্যায় হোক না কেন। এ পরামর্শ সভায় এটা স্থিরীকৃত হয় যে, এ জাতীয় নীতি হচ্ছে ভয়ংকর অন্যায়, অমানবিক ও অবমাননাকর। কাজেই, এ ধরণের জঘন্য নীতি আর কিছুতেই চলতে দেয়া যেতে পারে না। তাঁরা প্রতিজ্ঞা করলেন:

(ক) দেশের অশান্তি দূর করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

(খ) বিদেশী লোকজনের ধন-প্রাণ ও মান-সম্ভ্রম রক্ষা করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

(গ) দরিদ্র, দুর্বল ও অসহায় লোকদের সহায়তা দানে আমরা কখনই কুণ্ঠাবোধ করব না।

(ঘ) অত্যাচারী ও অনাচারীর অন্যায়-অত্যাচার থেকে দুর্বল দেশবাসীদের রক্ষা করতে প্রাণপণ চেষ্টা করব।

এটা ছিল অন্যায় ও অনাচারের বিরুদ্ধে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য অঙ্গীকার নামা। এ জন্য এ অঙ্গীকারনামা ভিত্তিক সেবা সংঘের নাম দেয়া হয়েছিল 'হিলফুল ফুযূল' বা 'হলফ-উল ফুযূল'। একদা এ প্রসঙ্গের উল্লেখ কালে তিনি দৃপ্তকণ্ঠে বলেছিলেন, 'আজও যদি কোন উৎপীড়িত ব্যক্তি বলে, 'হে, ফুযুল অঙ্গীকারনামার ব্যক্তিবৃন্দ! আমি নিশ্চয়ই তার সে আহবানে সাড়া দিব।

অধিকন্তু, এ ব্যাপারে অন্য এক প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, 'আব্দুল্লাহ বিন জুদ'আনের বাসভবনে আমি এমন এক অঙ্গীকারনামায় শরীক ছিলাম যার বিনিময়ে আমি আসন্ন

প্রসবা উটও পছন্দ করি না এবং যদি ইসলামের যুগে এরূপ অঙ্গীকারের জন্য আমাকে আহবান জানানো হয় তাহলেও 'আমি উপস্থিত আছি কিংবা প্রস্তুত আছি' বলতাম।

'হলফ-উল-ফুযুল' প্রতিষ্ঠার অন্য একটি প্রাসঙ্গিক প্রত্যক্ষ পটভূমির কথাও জানা যায় এবং তা হচ্ছে, জুবাইদ নামক একজন লোক মক্কায় এসেছিলেন কিছু মালপত্র নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে। আস বিন ওয়ায়িল সাহমী তাঁর নিকট থেকে মালপত্র ক্রয় করেন কিন্তু তাঁর প্রাপ্য তাঁকে না দিয়ে তা আটক রাখেন। এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্যের জন্য তিনি আব্দুদ্দার, মাখযুম, জুমাহ, সাহম এবং আদী এ সকল গোত্রের নিকট সাহায্যের আবেদন জানান। কিন্তু তাঁর আবেদনের প্রতি কেউই কর্ণপাত না করায় তিনি জাবালে আবূ কুবাইশ পর্বতের চূড়ায় উঠে উচ্চ কণ্ঠে কিছু কবিতা আবৃত্তি করেন যার মধ্যে তাঁর নিজের অত্যাচার-উৎপীড়নের মুখোমুখি হওয়ার বিষয়টিও বর্ণিত ছিল। আবৃত্তি শ্রবণ করে জুবাইর বিন আব্দুল মুত্তালিব দৌড়ে গিয়ে বলেন, 'এ লোকটি অসহায় এবং সহায় সম্বলহীন কেন? তাঁরই অর্থাৎ জুবাইরের প্রচেষ্টায় উপরোক্ত গোত্রগুলো একত্রিত হয়ে একটি সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেন এবং পরে আস বিন ওয়ায়িলের নিকট থেকে জুবাইরের পাওনা আদায় করে দেয়া হয়।'

দুঃখময় জীবন যাপন

নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর বাল্য, কৈশোর এবং প্রথম যৌবনে পেশাভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কোন কাজ-কর্মের কথা পাওয়া যায় না। তবে নির্ভরযোগ্য বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে জানা যায় যে, বনু সা'দ গোত্রে দুধমা'র গৃহে থাকাবস্থায় অন্যান্য বালকদের সঙ্গে ছাগল চরানোর উদ্দেশে মাঠে গমন করতেন।মক্কাতেও কয়েক কীরাত অর্থের বিনিময়ে তিনি ছাগল চরাতেন।

অধিকন্তু, কৈশোরে চাচা আবূ ত্বালীবের সঙ্গে বাণিজ্য উপলক্ষে তিনি সিরিয়া গমন করেছিলেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি (ﷺ) সায়িব বিন আবূ মাখযূমীর সাথে ব্যবসা করতেন এবং তিনি একজন ভাল অংশীদার ছিলেন। না তোষামোদী ছিলেন, না ঝগড়াটে ছিলেন। তিনি যখন মক্কা বিজয়ের সময় আগমন করেন তখন তাকে সাদর সম্ভাষন জানান এবং বললেন, হে আমার ভাই এবং ব্যবসায়ের অংশীদার।

তারপর যখন তিনি পঁচিশ বছর বয়সে পদার্পণ করেন তখন খাদীজাহ (রাঃ)-এর সম্পদ নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে শাম দেশে গমন করেন। ইবনে ইসহাক্ব হতে বর্ণিত আছে যে, খাদীজাহ (রাঃ) বিনতে খুওয়াইলিদ এক সম্ভ্রান্ত সম্পদশালী ও ব্যবসায়ী মহিলা ছিলেন। ব্যবসায়ে অংশীদারিত্ব এবং প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী লভ্যাংশের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে তিনি ব্যবসায়ীগণের নিকট অর্থলগ্নী করতেন। পুরো কুরাইশ গোত্রই জীবন জীবিকার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত থাকতেন। যখন খাদীজাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সত্যবাদিতা, উত্তম চরিত্র, সদাচার এবং আমানত হেফাজতের নিশ্চয়তা সম্পর্কে অবগত হলেন তখন তিনি মুহাম্মাদ (ﷺ)-

এর নিকট এক প্রস্তাব পেশ করলেন যে, তিনি তাঁর অর্থ নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে তাঁর দাস মায়সারার সঙ্গে শাম দেশে গমন করতে পারেন। তিনি স্বীকৃতিও প্রদান করেন যে, অন্যান্য ব্যবসায়ীগণকে যে হারে লভ্যাংশ বা মুনাফা প্রদান করা হয় তাঁকে তার চাইতে অধিকমাত্রায় মুনাফা প্রদান করা হবে। মুহাম্মাদ (ﷺ) এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং তার অর্থ সম্পদ নিয়ে দাস মায়সারার সঙ্গে শাম দেশে গমন করলেন।

খাদীজাহ (রাঃ) এর সঙ্গে বিবাহ

সিরিয়া থেকে যুবক নাবী (ﷺ)-এর প্রত্যাবর্তনের পর ব্যবসা বাণিজ্যের খতিয়ান করা হল। হিসাব নিকাশ করে আমানতসহ এত বেশী পরিমাণ অর্থ তিনি পেলেন ইতোপূর্বে কোন দিনই তা পাননি। এতে খাদীজাহ (রা.)-এর অন্তর তৃপ্তির আমেজে ভরে ওঠে। অধিকন্তু, তাঁর দাস মায়সারার কথাবার্তা থেকে মুহাম্মাদ (ﷺ) মিষ্টভাষিতা, সত্যবাদিতা, উন্নত চিন্তা-ভাবনা, আমানত হেফাজত করার ব্যাপারে একাগ্রতা ইত্যাদি বিষয় অবগত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধ ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে এবং তাঁকে পতি হিসেবে পাওয়ার একটা গোপন বাসনা ক্রমেই তাঁর মনে দানা বেঁধে উঠতে থাকে। এর পূর্বে বড় বড় সরদার, নেতা ও প্রধানগণ অনেকেই তাঁর নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠান কিন্তু তিনি কোনটিই মঞ্জুর করেন নি। অথচ মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে স্বামী রূপে পাওয়ার জন্য তিনি যার পরনাই ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তিনি নিজ অন্তরের গোপন বাসনা ও ব্যাকুলতার কথা তাঁর বান্ধবী নাফীসা বিনতে মুনাবিবহ এর নিকট ব্যক্ত করলেন এবং বিষয়টি নিয়ে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সঙ্গে আলোচনা করার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানালেন। নাফীসা খাদীজাহ (রাঃ)-এর প্রস্তাব সম্পর্কে নাবী কারীম (ﷺ)-এর সঙ্গে আলোচনা করলেন। নাবী কারীম (ﷺ) এ প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করে বিষয়টি চাচা আবূ ত্বালীবের সঙ্গে আলোচনা করলেন। আবূ ত্বালিব এ ব্যাপারে খাদীজাহ (রাঃ)-এর পিতৃব্যের সঙ্গে আলোচনার পর বিয়ের প্রস্তাব পেশ করেন এবং এক শুভক্ষণে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত দুইটি প্রাণ বিশ্বমানবের অনুকরণ ও অনুসরণযোগ্য পবিত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যান। বিবাহ অনুষ্ঠানে বনু হাশিম ও মুযারের প্রধানগণ উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেন।

নাবী কারীম (ﷺ) এবং খাদীজাহ (রাঃ)-এর মধ্যে শুভ বিবাহপর্ব অনুষ্ঠিত হয় শাম দেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের দু'মাস পর। তিনি সহধর্মিনী খাদীজাহকে মোহরানা স্বরূপ ২০টি উট প্রদান করেন। ঐ সময় খাদীজাহ (রাঃ)-এর বয়স হয়েছিল ৪০ বছর। বংশ-মর্যাদা, সহায়-সম্পদ, বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন সমাজের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়া। তিনি ছিলেন উত্তম চরিত্রের এক অনুপমা মহিলা এবং নাবী কারীম (ﷺ)-এর প্রথমা সহধর্মিনী। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি আর অন্য কোন মহিলাকে বিবাহ করেন নাই। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সন্তানদের মধ্যে ইবরাহীম ব্যতীত অন্যান্য সকলেই ছিলেন খাদীজাহ (রাঃ)-এর গর্ভজাত সন্তান। নাবী দম্পতির প্রথম সন্তান ছিলেন কাসেম, তাই উপনাম হয় 'আবুল কাসেম'। তারপর যথাক্রমে জন্মগ্রহণ করেন যায়নাব, রুকাইয়্যাহ, উম্মে কুলসুম, ফাত্বিমাহ ও আব্দুল্লাহ। আব্দুল্লাহর উপাধি ছিল 'ত্বাইয়িব' এবং 'ত্বাহির'। নাবী কারীম (ﷺ)-এর সকল পুত্র সন্তানই বাল্যাবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তবে কন্যাদের মধ্যে সকলেই ইসলামের যুগ পেয়েছেন, মুসলিম হয়েছেন এবং মুহাজিরের মর্যাদাও লাভ করেছেন। কিন্তু ফাত্বিমাহ (রাঃ) ব্যতীত কন্যাগণ সকলেই পিতার জীবদ্দশাতেই মৃত্যু বরণ করেন। ফাত্বিমাহ (রাঃ)-এর মৃত্যু হয়েছিল নাবী কারীম (ﷺ)-এর ছয় মাস পর।

নবুওয়াত ও রিসালাতের শীতল ছায়া

আরবের আল-হেরায়

নবি সা.-এর বয়স যখন চল্লিশের কাছাকাছি হলো, তাঁর পরিচ্ছন্ন অনমনীয় ব্যক্তিত্বেং কারণে স্বজাতির সাথে মানসিক ও চিন্তার দূরত্ব অনেক বেড়ে গেল। এ অবস্থায় রাসুল সা. নিঃসঙ্গপ্রিয় হয়ে উঠলেন। ছাতু এবং পানি নিয়ে মক্কা থেকে দুই মাইল দূরে অবস্থিত হেরা পাহাড়ের গুহায় গিয়ে সময় কাটাতে লাগলেন। এটি একটি ছোট গুহা, এর দৈর্ঘ্য নিচের দিকে গভীর নয়। ছোট একটি চারণের প্রান্তরের সঙ্গমস্থলে এ গুহা অবস্থিত। প্রিয় রাসুল এম রাসুল যাওয়ার পর বিদি খাদিজাও তাঁর কাছে যেতেন এবং খাবার দিয়ে আসতেন। প্রিয় রাসুল পুরা রমজান মাস এ গুহায় কাটিয়ে দিতেন। জগতের দৃশ্যমান এবং এর পেছনে কুদরতের কারিশমা সম্পর্কে চিন্তা করতেন। স্বজাতির লোকদের দেবতাপূজা এবং নোংরা জীবনযাপন দেখে তিনি শান্তি পেতেন না। কিন্তু তাঁর সামনে সুস্পষ্ট কোনো পথ, সুনির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি প্রচলিত অবস্থার বিপরীত কোনো কর্মসূচি ছিল না। যার ওপর জীবন কাটিয়ে তিনি মানসিক স্বস্তি ও শান্তি লাভ করতে পারেন। নবিজির এ নিঃসঙ্গ-প্রিয়তা ছিল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ পাকের হিকমতের একটি অংশ। এমন করে আল্লাহ পাক তাঁকে ভবিষ্যতের গুরুদায়িত্বের জন্য তৈরি করছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে মানবজীবনের বাস্তব সমস্যার সমাধান দিয়ে যিনি জীবনধারায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট হবেন, তিনি পারিপার্শ্বিক হৈ চৈ হট্টগোল থেকে দূরে নির্জনতায় কোলাহলমুক্ত পরিবেশে কিছুকাল থাকবেন এটাই স্বাভাবিক। এ নিয়ম অনুযায়ী আল্লাহ পাক ধীরে ধীরে তাঁর প্রিয় রাসুলকে আমানতের বিরাট বোঝা বহনের এবং বিশ্ব মানবের জীবনধারায় পরিবর্তনের ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের জন্য তৈরি করছিলেন। তাঁকে আমানতের জিম্মাদারি অর্পণের তিন বছর আগে নির্জনে ধ্যান করা তাঁর জন্য আগেই নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। এ নির্জনতায় কখনো এক মাস পর্যন্ত তিনি ধ্যানমগ্ন থাকতেন। আধ্যাত্মিক সফরে তিনি সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতেন,

গবেষণা করতেন, যাতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পেলে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনে সক্ষম হন।

জিবরাইলের আগমন ও জ্যোতির্ময় ওহি

৪০ বছর বয়স হচ্ছে মানুষের পরিপক্কতার বয়স। পয়গম্বররা এ বয়সেই ওহি লাভ করে থাকেন। প্রিয় রাসুলের বয়স ৪০ হওয়ার পর তাঁর জীবনের দিগন্তে নবুওয়াতের নিদর্শন চমকাতে থাকে। এ নিদর্শন প্রকাশ পাচ্ছিল স্বপ্নের মাধ্যমে। এ সময় প্রিয় রাসুল যে স্বপ্নই দেখতেন, সেই স্বপ্ন শুভ্র সকালের মতো প্রকাশ পেত। এ অবস্থায় ছয় মাস কেটে গেল। এ সময়টুকু নবুওয়াতের সময়ের ৪৬তম অংশ এবং নবুওয়াতের মোট মেয়াদ হচ্ছে ২৩ বছর। হেরা গুহার নির্জনবাসের তৃতীয় বছরই আল্লাহ পাক জগতবাসীকে তাঁর করুণাধারায় সিঞ্চিত করতে চাইলেন। আল্লাহ

পাক তখন তাঁর প্রিয় রাসুলকে নবুওয়াত দান করলেন। হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত নিয়ে উপস্থিত হলেন।

ইতিহাসের যুক্তি প্রমাণ এবং কুরআনসহ বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়ন করে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী জানা যায়, প্রথম ওহি এসেছিল রমজান মাসের ২১ তারিখ সোমবার রাতে। চান্দ্র মাসের হিসাব মোতাবেক সে সময় রাসুলে কারিম হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুজতবা সা.- এর বয়স ছিল ৪০ বছর ছয় মাস ১২ দিন। সৌরবর্ষ হিসেবে ৩৯ বছর তিন মাস ২০ দিন।

আসুন, হজরত আয়িশা রাদি-এর জবানে এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ শোনা যাক। কুরআন অবতীর্ণ ছিল এক অলৌকিক আলোক শিখার আবির্ভাব, সেই আলোক শিখার ফলে গুমরাহি ও পথভ্রষ্টতার অন্ধকার তিরোহিত হয়েছিল। ইতিহাসের গতিধারা এ ঘটনায় আমূল বদলে গিয়েছিল। হজরত আয়িশা রাদি, বলেন, প্রিয় নবির ওপর ওহি অবতীর্ণের সূচনা স্বপ্নের মাধ্যমে হয়েছিল। তিনি যে স্বপ্ন দেখতেন, সে স্বপ্ন শুভ্র সকালের মতো প্রকাশ পেত। তারপর তিনি নির্জনতা প্রিয় হয়ে যান। তিনি হেরা গুহায় ইবাদত-বন্দেগিতে কাটাতে থাকেন এবং এ সময় একাধারে কয়েকদিন ঘরে ফিরতেন না। পানাহার সামগ্রী শেষ হয়ে গেলে সেসব নেওয়ার জন্য পুনরায় বাড়িতে ফিরতেন। এমন করে একপর্যায়ে হজরত জিবরাইল আ. তাঁর কাছে আসেন এবং তাঁকে বলেন, পড়ো। তিনি বললেন, আমি পড়তে জানি না। ফিরিশতা তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে সজোরে চাপ দিয়ে বললেন, পড়ো। তিনি বললেন, আমার সব শক্তি যেন নিংড়ে নেওয়া হলো। তারপর ফিরিশতা তাঁকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, পড়ো। তিনি বললেন, আমি তো পড়তে জানি না। পুনরায় ফিরিশতা আমাকে বুকে জড়িয়ে চাপ দিলেন।

তারপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, পড়ো, তৃতীয়বার তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে সজোরে চাপ দিলেন এবং বললেন, পড়ো-

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ : خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم. ُ

তথা পড়ো সেই প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন...

এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার পর প্রিয়নবি সা. ঘরে ফিরে এলেন। তার বুক ধুকধুক করছিল। স্ত্রী হজরত খাদিজা বিনতু খুয়াইলিদকে বললেন, আমাকে চাদর গিয়ে ঢেকে দাও, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও। হজরত খাদিজা প্রিয়নবিকে চাদর জড়িয়ে শুইয়ে দিলেন। তাঁর ভয় কেটে গেল। তারপর তিনি খাদিজাকে সব কথা খুলে বললেন।

বললেন,আমার কী হয়েছে? আমি নিজের জীবনের আশঙ্কা করছি। খাদিজা রাদি তাকে অভয় দিয়ে বললেন, আল্লাহ পাক আপনাকে অপমান করবেন না। আপনি আত্মীয়-স্বজনের চায় সদায়াত করেন, বিপদগ্রস্ত লোকাদের সাহায্য করেন, মেহমানদারী করেন, সত্য প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেন। হজরত খাদিজা এরপর প্রিয়নবিকে মেহমানদারী ওয়ারাকা ইবন নাওফালের কাছে নিয়ে গেলেন।

ওয়ারাকা ইবনু নাওফাল ইবনু আবদিল উজ্জা আইয়ামে জাহিলিয়াতে ঈসায়ি ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি হিব্রু ভাষায় লিখতে জানতেন। আল্লাহ তাআলা যত তাওফিক দিতেন হিব্রু ভাষায় তত ইঞ্জিল তিনি লিখতেন। সে সময় তিনি ছিলেন বয়সের ভারে ন্যুব্জ এবং দৃষ্টিহীন। খাদিজা বললেন, ভাইজান, আপনি আপনার ভাতিজার কথা শুনুন। ওয়ারাকা বললেন, ভাতিজা, তুমি কী

দেখেছ? নবি সা. যা যা দেখেছেন সব তাকে খুলে বললেন। সব শুনে ওয়ারাকা বললেন, তিনি সেই দূত, যিনি হজরত মুসা আ.-এর কাছে এসেছিলেন। হায়, যদি আমি সে সময় বেঁচে থাকতাম, যখন তোমার কওম তোমাকে বের করে দেবে। রাসুল অবাক হয়ে বললেন, তবে কি আমার কওম আমাকে সত্যি সত্যিই বের করে দেবে? ওয়ারাকা বললেন, হ্যাঁ, তুমি যে ধরনের বাণী লাভ করেছ এ ধরনের বাণী যখনই কেউ পেয়েছে, তার সঙ্গে শত্রুতা করা হয়েছে। যদি আমি বেঁচে থাকি তবে অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করব। এর কিছুকাল পরেই ওয়ারাকা ইনতিকাল করেন। তারপর হঠাৎ ওহির আগমন বন্ধ হয়ে যায়।

তাবারি এবং ইবনু হিশামের বর্ণনা থেকে জানা যায়, ওহি অবতীর্ণ বন্ধ হওয়ার সময়ও তিনি হেরা গুহায় কিছুকাল অবস্থান করেন এবং নির্ধারিত মেয়াদ পূর্ণ করেন। তারপর মক্কায় ফিরে যান। তাবারির বর্ণনায় নবিজির ঘর থেকে বের হওয়ার ওপরও আলোকপাত করা হয়েছে। এ বর্ণনা নিম্নোযুক্ত। ওহি আসার পরের মানসিক অবস্থা আলোচনা করতে গিয়ে রাসুলে কারিম সা. বলেন, আল্লাহ তাআলার মাখলুকের মধ্যে কবি এবং পাগল ছিল আমার সবচেয়ে ঘৃণিত। প্রচণ্ড ঘৃণার কারণে এদের প্রতি চোখ তুলে তাকাতেও আমার ইচ্ছা হতো না। ওহি আসার পর আমি মনে মনে বললাম, কুরাইশরা আমাকে কবি বা পাগল বলবে না তো? এমন চিন্তার পর আমি পাহাড়ের চূড়ায় উঠে নিচে পড়ে নিজেকে শেষ করে দেওয়ার চিন্তা করলাম। এমনকি এক পাহাড়ে উঠেও গেলাম। পাহাড়ের মাঝামাঝি ওঠার পর হঠাৎ আসমান থেকে আওয়াজ এলো, মুহাম্মদ, আপনি আল্লাহ তাআলার রাসুল। আমি জিবরাইল। প্রিয় রাসুল বলেন, এ আওয়াজ শোনার পর আকাশের দিকে তাকালাম। দেখলাম জিবরাইল মানুষের আকৃতি

ধরে দিগন্তে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বললেন, হে মুহাম্মদ, আপনি আল্লাহ তাআলার রাসুল, আমি জিবরাইল বলছি। রাসুল বলেন, আমি থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। সামনেও যেতে পারছিলাম না পেছনেও যেতে পারছিলাম না। আকাশের যেদিকেই তাকাচ্ছিলাম সেদিকেই জিবরাইলকে দেখতে পাচ্ছিলাম। আমি সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। এর মধ্যে খাদিজা আমার খোঁজে লোক পাঠালেন। খুঁজে খুঁজে তিনি মক্কায় ফিরে এসেছেন।

জিবরাইল চলে যাওয়ার পর আমি নিজের ঘরে ফিরে এলাম। খাদিজার উরুর পাশে হেলান দিয়ে বসলাম। তিনি বললেন, আবুল কাসিম, আপনি কোথায় ছিলেন? আপনার খোঁজে আমি একজন লোক পাঠিয়েছি যে মক্কায় গিয়ে খুঁজে এসেছে আপনাকে পায়নি। আমি তখন যা কিছু দেখেছিলাম খাদিজাকে সে কথা বললাম। তিনি বললেন, হে আমার চাচাতো ভাই, আপনি খুশি হোন এবং

দৃঢ়পদ থাকুন, আমার আশা আপনি এ উম্মতের নবি হবেন। তারপর তিনি ওয়ারাকা ইবনু নাওফালের কাছে গেলেন। তাঁকে সব কথা শোনালেন। তিনি সব শুনে বললেন, সে সত্তার শপথ-যাঁর হাতে ওয়ারাকার প্রাণ রয়েছে, তাঁর কাছে সেই ফিরিশতা এসেছেন, যিনি হজরত মুসা আ.-এর কাছে এসেছিলেন। মুহাম্মদ এই উম্মতের নবি। তাঁকে বলবে তিনি যেন দৃঢ়পদ থাকেন। তারপর হজরত খাদিজা ফিরে এসে রাসুলকে ওয়ারাকার কথা শোনালেন। প্রিয়নবি হেরা গুহায় তাঁর অবস্থানের মেয়াদ পূর্ণ করে মক্কায় আসেন। এ সময় ওয়ারাকা ইবনু নাওফাল বলল, কসম সেই সত্তার, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, আপনি হচ্ছেন এ উম্মতের নবি।

আপনার কাছে সেই বড় ফিরিশতা এসেছিলেন, যিনি হজরত মুসা আ.-এর কাছে এসেছিলেন।

সাময়িক ওহি স্থগিত

ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে, প্রথম ওহি আসার পর নবিজির নিকট কিছু সময় ওহির আগমন বন্ধ ছিল। কিন্তু কত সময় বন্ধ ছিল, তা নির্ধারণে ঐতিহাসিকদের প্রচুর মতানৈক্য রয়েছে। বিশুদ্ধ মত হলো, ওহির আগমন কয়েকদিন বন্ধ ছিল। ইবনু সাদ রহ. হজরত ইবনু আব্বাস রাদি.-এর সূত্রে এ মতের সমর্থনে একটি হাসিস উল্লেখ করেছেন।

এ সম্পর্কে আড়াই কিংবা তিন বছরের যে বক্তব্যটি রয়েছে, তা সঠিক নয়। এ সম্পর্কে বর্ণিত সমস্ত বর্ণনা আমি গভীরভাবে চিন্তা করেছি। তখন আমার কাছে একটি সূক্ষ্ম ব্যাপার প্রকাশিত হয়। তা হলো, সব রিওয়ায়াত থেকেই এ কথা স্পষ্ট হয়, নবিজি প্রতি বছর রমজান মাসে হেরার গুহায় নির্জনবাস করতেন। এভাবে নবুওয়াত পাওয়ার পূর্বে

নবিজি তিন বছর নির্জনবাসে যান। সে তিন বছরের শেষ বছরেই নবুওয়াত প্রাপ্ত হন। তবে নবুওয়াত পেয়েও নবিজি হেরা থেকে আসেননি। বরং রমজান মাস পূর্ণ করে পরে সকালে বাড়ি ফেরেন। সেটা ছিল শাওয়াল মাসের এক তারিখ।

এদিকে বুখারি ও মুসলিমের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, নবিজির কাছে দ্বিতীয়বার ওহি আসে, যখন তিনি হেরার নির্জনবাস সমাপ্ত করে বাড়ি ফিরছিলেন। সুতরাং বলা যায়, নবিজির কাছে দ্বিতীয়বার ওহি আসে শাওয়ালের এক তারিখে। প্রথম ওতি এসেছিল রমজান মাসের ২১ তারিখে: পূর্বে যার আলোচনা হয়েছে। এ হিসেবে বলা পুনরায় ওহির আগমন হয়। রমজানের শেষ দশককে ইতিকাফের জন্য নির্ধারণ করা এবং শাওয়ালের প্রথম তারিখকে ঈদুল ফিতরের আনন্দ প্রকাশের জন্য নির্ধারণ রহস্য সম্ভবত এটাই। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

জিবরাইলের পুনরায় আগমন

হাফিজ ইবনু হাজার লিখেছেন, ওহি কিছুকাল স্থগিত থাকার কারণ ছিল এই, তিনি যে ভয় পেয়েছিলেন সেই ভয় যেন কেটে যায় এবং পুনরায় ওহি প্রাপ্তির আগ্রহ এবং প্রতীক্ষা তাঁর মনে জাগে।

বিস্ময়ের ঘোর কেটে যাওয়ার পর, বাস্তব অবস্থা তার সম্মুখে প্রকাশ পেল। তিনি সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারলেন, তিনি আল্লাহ পাকের নবি হয়েছেন। তিনি আরও বুঝতে সক্ষম হলেন, তাঁর কাছে যিনি এসেছিলেন, তিনি ওহির বাণী বহনকারী; আসমানি সংবাদবাহক। এরূপ বিশ্বাস তাঁর মনে দৃঢ় হওয়ার পর তিনি আগ্রহের সাথে ওহির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, তাঁকে দৃঢ় হয়ে থাকতে হবে এবং এ দায়িত্ব বহন করতে হবে। মানসিক অবস্থার এ পর্যায়ে হজরত জিবরাইল আ. পুনরায় উপস্থিত হলেন। সহিহ বুখারি শরিফে হজরত জাবির ইবনু আবদিল্লাহ রাদি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি প্রিয় নবির মুখে ওহি স্থগিত হওয়ার বিবরণ শুনেছেন। রাসুল সা বলেছেন, আমি পথ চলছিলাম, হঠাৎ আকাশ থেকে একটি আওয়াজ শোনা গেল। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি সেই ফিরিশতা, যিনি হেরা গুহায় আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি আসমান জমিনের মাঝখানে একখানি কুর্সিতে বসে আছেন। আমি ভয় পেয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। তারপর বাড়ি এসে আমার স্ত্রীকে বললাম, আমাকে চাদর জড়িয়ে দাও, আমাকে চাদর জড়িয়ে দাও। স্ত্রী আমাকে চাদর জড়িয়ে শুইয়ে দিলেন। তারপর আল্লাহ পাক সুরা মুদ্দাসসিরের আয়াত-

يَأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ، قُمْ فَانْذِرْ، وَ رَبَّكَ فَكَبِر، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ، وَالرُّجْزَ فَاهْجُر .ْ

অবতীর্ণ করেন। এ ঘটনার পর থেকে ঘন ঘন ওহি অবতীর্ণ হতে থাকে।

এ বর্ণনায় এ কথাও উল্লেখ রয়েছে, রাসুল সা. বলেছেন, আমি হেরা গুহায় ইতিকাফ করেছি। ইতিকাফ পূর্ণ করার পর নিচে এলাম। তারপর আমি যখন প্রান্তর ধরে অগ্রসর হচ্ছিলাম, তখন আমাকে ডাকা হলো। ডানে-বায়ে সামনে-পেছনে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেলাম না। ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখি সেই ফিরিশতা।

ওহির বিভিন্ন প্রকার

প্রিয় নবির ওপর ওহি অবতীর্ণ হওয়া তথা তিনি নবুওয়াত পাওয়ার পর তাঁর যে জীবন শুরু হয়, সে আলোচনায় যাওয়ার আগে ওহির বিভিন্ন প্রকার সম্পর্কে আলোকপাত করা দরকার। এতে রিসালাত ও নবুওয়াত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহ. নিম্নোক্ত কয়েক প্রকার ওহির কথা উল্লেখ করেছেন-

১. সত্য স্বপ্ন: স্বপ্নের মাধ্যমে নবিজির ওপর ওহি অবতীর্ণ।

২. ফিরিশতা তাঁকে দেখা না দিয়ে তাঁর মনে কথা বসিয়ে দিত। যেমন প্রিয় নবি বলেছেন, রুহুল কুদস আমার মনে এ কথা বসিয়ে দিলেন, কোনো মানুষ তার জন্য নির্ধারিত রিজিক পাওয়ার আগে মৃত্যুবরণ করে না। কাজেই আল্লাহকে ভয় করো এবং ভালো জিনিস তালাশ করো। রিজিক পেতে হলে আল্লাহ তাআলার নাফরমানির মাধ্যমে রিজিক তালাশ করো না। কেননা, আল্লাহ তাআলার কাছে যা কিছু রয়েছে সেটা তাঁর আনুগত্য ছাড়া পাওয়া যায় না।

৩. ফিরিশতা মানুষের আকৃতি ধরে তাকে সম্বোধন করতেন। তিনি যা কিছু বলতেন, প্রিয় রাসুল সেসব মুখস্থ করে নিতেন। এ সময় কখনো কখনো সাহাবায়ে কিরামও ফিরিশতাদের দেখতে পেতেন।

৪. নবিজির কাছে ওহি ঘণ্টাধ্বনির মতো টন টন শব্দে আসত। এটি ছিল ওহির সবচেয়ে কঠিন অবস্থা। এ সময় ফিরিশতা তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন এবং প্রচণ্ড শীতের মওসুম হলেও প্রিয় নবি ঘেমে যেতেন। তাঁর কপাল থেকে ঘাম ঝরে পড়ত। তিনি উটের ওপর সওয়ার থাকলে মাটিতে বসে পড়তেন। একবার হজরত জাইদ ইবনু সাবিতের উরুর ওপর তাঁর উরু থাকা অবস্থায় ওহি এলো, হজরত জাইদ এত ভারী বোধ করলেন, তাঁর উরু থ্যাঁতলে যাওয়ার মতো অবস্থা হলো।

৫. তিনি ফিরিশতাকে তার প্রকৃত চেহারায় দেখতেন। সে অবস্থায়ই আল্লাহ তামা ইচ্ছায় তাঁর ওপর ওহি অবতীর্ণ হতো। দুবার এমন হয়েছিল। সুরা নাজম-এ আতাআলার সে কথা উল্লেখ করেছেন।

৬. মিরাজের রাতে নামাজ ফরজ হওয়া এবং অন্যান্য বিষয়ক ওহি আকাশে অবতীর্ণ হয়েছিল। প্রিয় নবি তখন আকাশে ছিলেন।

৭. ফিরিশতার মাধ্যম ছাড়া আল্লাহ পাকের সরাসরি কথা বলা। হজরত মুসা আ.-এর সঙ্গে আল্লাহ পাক যেমন কথা বলেছিলেন। হজরত মুসার সঙ্গে আল্লাহ তাআলার কথা বলার প্রমাণ কুরআনে রয়েছে। প্রিয় নবির সঙ্গে আল্লাহ তাআলার কথা বলার প্রমাণ মিরাজের হাদিসে রয়েছে।

৮. একটি প্রকার অনেকে উল্লেখ করেছেন। এটি হচ্ছে আল্লাহ পাকের মুখোমুখি পর্দা বিহীন অবস্থায় কথা বলা। কিন্তু এ ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে।

তিন বছর গোপনে প্রচার

সূরাহ মুদ্দাসসিরের প্রথম আয়াত প্রথম থেকে ষষ্ঠ আয়াত পর্যন্ত

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنذِرْ (2) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (3) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (5) وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ (6) ُ

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِر7ْ

'১. ওহে বস্ত্র আবৃত (ব্যক্তি)। ২. ওঠ, সতর্ক কর। ৩. আর তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। ৪, তোমার পোশাক পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ। ৫. (যাবতীয়) অপবিত্রতা থেকে দূরে থাক। ৬. (কারো প্রতি) অনুগ্রহ করো না অধিক পাওয়ার উদ্দেশে। ৭. তোমার প্রতিপালকের (সন্তুষ্টির) জন্য ধৈর্য ধর। (আল-মুদ্দাসসির ৭৪ : ১-৭)

সূরাহ মুদ্দাসসিরের উপযুক্ত আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পথহারা মানুষদেরকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়ার কাজ শুরু করলেন এমন অবস্থায় যে, তাঁর জাতি কুরাইশদের মূর্তি ও প্রতিমার পূজা-অর্চনা ব্যতীত কোন দীন ছিল না। তাদের সঠিক কোন হজ্জ ছিল না, তবে তারা হজ্জ করতো যেভাবে তাদের পিতৃপুরুষদেরকে দেখেছে। তাদের আত্মমর্যাদা ও বংশগৌরব

ব্যতীত কোন সৎচরিত্র ছিল না। তাদের কোন সমস্যা তলোয়ার ব্যতীত সমাধান হতো না। তা সত্ত্বেও মক্কা ছিল আরববাসীগণের ধর্মীয় চেতনার কেন্দ্রস্থল। এ মক্কাবাসীই ছিলেন কা'বাহর তত্ত্বাবধায়ক ও খাদেমগণ। এ জন্যই দূরবর্তী স্থানের তুলনায় মক্কায় সংস্কারমুখী কর্মসূচী বাস্তবায়নের ব্যাপারটি ছিল অনেক বেশী কঠিন ও কষ্টকর। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেও প্রাথমিক পর্যায়ে মক্কায় প্রচার ও তাবলীগের কাজকর্ম সন্তর্পণে ও সঙ্গোপনে করার প্রয়োজন ছিল যাতে মক্কাবাসীগণের সামনে আকস্মিকভাবে বৈপ্লবিক কিংবা উত্তেজনামূলক কোন অবস্থার সৃষ্টি হয়ে না যায়।

নামাজ

ইসলামের সকল হুকুম-আহকামের মধ্যে প্রথম নামাজের ব্যাপারে নির্দেশ এসেছিল। হাফিজ ইবনু হাজার রহ. বলেন, ইসরা ও মিরাজের পূর্বে রাসুলে কারিম সা. ও তাঁর সাহাবায়ে কিরাম নামাজ পড়তেন-এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। কিন্তু মতানৈক্য যে জায়গাটিতে তা হলো, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়ার আগে অন্য কোনো নামাজ ফরজ হয়েছিল। কি না। কারও কারও মতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়ার আগে প্রতিদিন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের আগে একটি বিশেষ নামাজ ফরজ ছিল। অপরদিকে হারিস ইবনু আবি উসামা ইবনু লাহিয়ার সূত্রে জাইদ ইবনুল হারিসা থেকে বর্ণনা করেন, সর্বপ্রথম যখন রাসুলে কারিম সা.-এর ওপর ওহি নাজিল হলো তখন হজরত জিবরাইল আ. তাঁর নিকট আগমন করলেন, তারপর তিনি রাসুলে কারিম সা.-কে অজু শিক্ষা দিলেন। যখন তিনি অজু করে শেষ করলেন তখন এক অঞ্জলি পানি নিয়ে লজ্জাস্থানে ছিটিয়ে দিলেন। ইবনু মাজাহ থেকেও এর কাছাকাছি রিওয়ায়াত পাওয়া যায়। বারা ইবনুল আজিব এবং ইবনু আব্বাস রাদি, থেকেও এ ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। এর পাশাপাশি ইবনু আব্বাসের হাদিসে পাওয়া যায়, এটা ছিল প্রাথমিক সময় অবতীর্ণ ফরজ নামাজের একটি।ইবনু হিশাম বর্ণনা করেন, যখন নামাজের সময় হতো তখন রাসুলে কারিম সা. ও সাহাবায়ে কিরাম নির্জন পাহাড়ে চলে যেতেন এবং সেখানে লোকচক্ষু অন্তরালে লুকিয়ে নামাজ আদায় করতেন। একদিন আবু তালিব রাসুলে কারিম সা. ও আলি রাদি.-কে নামাজ আদায় করতে দেখলেন। এরপর তাদের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বললেন। যখন তিনি মূল বিষয় বুঝতে পারলেন তখন তাদেরকে এ কাজ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

এ সময় মুমিনগণ কেবল এ ইবাদত করতেই আদিষ্ট হয়েছিলেন। নামাজ ব্যতীত এ সময় তাদের জন্য কোনো ইবাদত কিংবা বিধি-নিষেধের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না তখনও। কিন্তু প্রসিদ্ধ দিক ও রূপরেখা তুলে ধরছিল। আত্মশুদ্ধির প্রতি তাদেরকে উৎসাহিত করছিল। রাসুলে কারিম সা.-এর ওপর অনবরত অবতীর্ণ ওহি তাদের নিকট তাওহিদের বিভিন্ন মহোত্তম চরিত্র-মাধুর্যের প্রতি তাদেরকে প্রলুব্ধ করে তুলছিল। তাদের সামনে জান্নাত আর জাহান্নামের কথা এমনভাবে তুলে ধরছিল যেন জান্নাত জাহান্নাম তাদের খোলা চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। তাদেরকে এমন সুন্দর ও অমূল্য উপদেশমালা দিয়ে যাচ্ছিল যা তাদের হৃদয়ের বন্ধ দুয়ারকে খুলে দিত। তাদের প্রাণে তেজ আর আত্মায় পুষ্টি যোগাত। তৎকালীন যে মানব সমাজে তারা বাস করতেন সেখান থেকে ভিন্ন এক দুনিয়ায় তাদেরকে ঠেলে দিচ্ছিল। এ ছিল এক নতুন দুনিয়া। ইতিপূর্বে পৃথিবীর কোনো মানুষের কাছে যার কোনো ঠিকানা ছিল না।

এভাবেই কেটে গেল তিনটি বছর। কিন্তু দাওয়াতের কার্যক্রম তখনও ব্যক্তিসীমা ছাপিয়ে যেতে পারেনি। আরবের সভা-সমিতি আর হাট-বাজারে তখনও রাসুলে কারিম সা. তাঁর দাওয়াতকে প্রকাশ্যে তুলে ধরেননি। কিন্তু কুরাইশরা তাঁর কথা জেনে গিয়েছিল। মক্কার প্রতিটি অলি-গলি

আর পথে-প্রান্তরে ইসলামের আলোচনা ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি মানুষের কথাবার্তা আর আলোচনা-পর্যালোচনার আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছিলেন। কিন্তু কেউ কেউ কখনো কখনো তার চরম বিরোধিতা করছিল। কোনো কোনো মুমিনের ওপর তারা সীমালঙ্ঘন আর বাড়াবাড়ি করছিল। সবকিছুর পরও এ ব্যাপারে তখনও তারা ততটা গুরুত্ব দিচ্ছিল না। কারণ, রাসুলে কারিম সা. তখনও তাদের ধর্মের পথে না কখনো বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন, না তাদের সে ব্যাপারে কখনো কোনো মন্তব্য করেছেন।

ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম দলঃ

একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারীগণ হলেন-

১) খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ রাঃ

হেরা গুহা থেকে ফিরে এসে রাসূল সাঃ যখন খাদিজা রাঃ কে সবকিছু খুলে বললেন এবং ওয়ারাকা ইবনে নাওফাল রাসূল সাঃ এর নবুওয়াতের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিলেন তখন খাদিজা রাঃ রাসূল সাঃ কে আল্লাহর নবী হিসেবে মেনে নিলেন। তিনি ছিলেন ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম ব্যক্তি এবং প্রথম মহিলা।

২) ওয়ারাকা ইবনে নাওফাল রাঃ

যদিও ওয়ারাকা ইবনে নাওফাল শাহাদাত পাঠ করেন নি, তবুও তিনি মুসলিম হিসেবে গণ্য হবেন কারণ তিনি রাসূল সাঃ কে নবী ও রাসূল হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন। উপরন্তু ঐ সময় কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করে মুসলিম হওয়ার বিষয়টিও ছিল না। আর হাদসেও রাসূল সাঃ ওয়ারাকার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়েছেন। এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, ওয়ারাকা ইবনে নাওফাল আল্লাহর দৃষ্টিতে একজন মুসলিম ছিলেন।

আলী ইবনে আবি ত্বালিব রাঃ, আবু বকর ইবনে আবি কুহাফা রাঃ এবং যায়েদ বিন হারিসা রাঃ এর মধ্যে ইসলাম গ্রহণের ক্রম নিয়ে 'আলিমগণ মতভেদ করেছেন। সহজে বলা যায়- বালকদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী হলেন আলী ইবনে আবি ত্বালিব রাঃ, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের মধ্যে আবু বকর ইবনে আবি কুহাফা রাঃ এবং মুক্তকৃত ক্রীতদাসদের মধ্যে যায়েদ বিন হারিসা রাঃ।

৩) আলী ইবনে আবি ত্বালিব রাঃ

তিনি মাত্র ১০ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল সাঃ এর সাথে খাদিজা রাঃ এর বিবাহের সময় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। যেহেতু আবু তালিব খুব দরিদ্র ছিলেন তাই রাসূ সাঃ আলী রাঃ এর ভরণপোষণের দায়িত্ব নিজে নিয়ে নেন এবং আলী রাঃ কে নিজের কাছে রেখে বড় করতে থাকেন। রাসূল সাঃ তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি ইসলাম কবুল করেন।

৪) আবু বকর ইবনে আবি কুহাফা রাঃ

নবুওয়াতের আগে থেকেই আবু বকর রাঃ ছিলেন মুহাম্মাদ সাঃ এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁর ইসলাম গ্রহণের সুনির্দিষ্ট ঘটনা/বর্ণনা হাদীস থেকে জানা যায় না তবে রাসূল সাঃ জানিয়েছেন আবু বকর রাঃ কে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার সাথে সাথেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, "আমি যাকেই ইসলামের দাওয়ায়ত দিয়েছি সেই ইসলাম গ্রহণ করতে কিছু না কিছু ইতস্তত করেছে। কিন্তু আবু বকর ইসলাম গ্রহণে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব করেনি"।

৫) যায়েদ বিন হারিসাঃ

আমরা আগেই জেনেছি যায়েদ ছিলেন রাসূল সাঃ এর মুক্তকৃত ক্রীতদাস। তিনি ৭/৮ বছর বয়স থেকেই

রাসূল সাঃ এর কাছে প্রতিপালিত হতে থাকেন। এক পর্যায়ে রাসূল সাঃ তাঁকে মুক্ত করে দেন। মুক্ত হওয়ার পরও তিনি রাসূল সাঃ এর কাছেই অবস্থান করতেন। তিনি ছিলেন রাসূল সাঃ এর অত্যাধিকপ প্রিয় পাত্র।

তিনিও ইসলামের দাওয়াত পাওয়ার সাথে সাথেই ইসলাম কবুল করেন।

দাওয়াত পাওয়ার সাথে সাথেই ইসলাম কবুল করেন।

উপরে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ রাসূল সাঃ এর দাওয়াতে ইসলাম গ্রহণ করেন। আবু বকর রাঃ নিজেও জোরেশোরে দাওয়াতি কাজ শুরু করেন। তাঁর দাওয়াতে ইসলাম কবুল করেন- সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাঃ, উসমান ইবনে আফফান রাঃ, যুবায়ের ইবনে আওয়াম রাঃ এবং আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাঃ।

৬) সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাঃ

ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৬ বছর। তিনি কুরাইশের এক সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের ফলে তাঁর মা খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং সে ইসলাম ত্যাগ না করলে এভাবেই মরে যাওয়ার হুমকি দেয়। কিন্তু সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাঃ কিছুতেই ইসলাম ত্যাগ করেন নি। তিনি ইসলামের পক্ষে প্রথম তীর নিক্ষেপকারী সাহাবী।

৭) উসমান ইবনে আফফান রাঃ

তাঁর পরিচয় ও প্রসিদ্ধির কথা স্বপ পরিসরে বলে শেষ করা সম্ভব নয়। সমগ্র সীরাহ-র বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর কথা আমরা জানব।

৮) যুবায়ের ইবনে আওয়াম রাঃ

তাঁর মা ছিলেন সাফিয়্যাহ বিনতে আব্দুল মুত্তালিব। অর্থাৎ তিনি ছিলেন রাসূল সাঃ এর ফুফাত ভাই। তিনি ছিলেন সাহাবী, সাহাবীর পিতা, সাহাবীর সন্তান এবং সাহাবীর ভাই। রাসূল সাঃ তাঁর মর্যাদা বোঝাতে গিয়ে বলেছেন, "প্রত্যেক নবীকে একজন সাহায্যকারী সাথী দেওয়া হয়েছে। আমার সাহায্যকারী সাথী হল যুবায়ের ইবনে আওয়াম"।

৯) আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাঃ

ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁর বয়স ছিল ৩০ বছর। আবু বকরের পর তিনিই নওমুসলিমদের মধ্যে সবচেয়ে সিনিয়র ছিলেন। তিনি একজন ধনী ও প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন। হিজরতের সময় তাঁর সমস্ত সম্পদ কুরাইশদের হাতে দিয়ে তিনি শুধু পরনের কাপড় ও পিঠে একটি ব্যাগ নিয়ে মদীনায় উপস্থিত হন। সেখানে পুনরায় আল্লাহ তাঁর ব্যবসায় বরকত দান করেনে বং তিনি বিপুল সম্পত্তির মালিক হন।

এরপর ইসলাম গ্রহণ করেন-

.আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ

.আমের ইবনে জাররাহ

.আরকাম ইবনে আবুল আরকাম
.উসমান ইবনে মাযউন
.কুদামা ইবনে মাযউন
.আব্দল্লাহ ইবনে মাযউন
.উবায়দা ইবনে হারিস
.সাইদ বিন যায়েদ বিন আমর বিন নুফায়েল (উমার রাঃ এর ভগ্নিপতি)
.ফাতিমা বিনতে খাত্তাব (উমার রাঃ এর বোন)
.আসমা বিনতে আবু বকর রাঃ এবং আরও কয়েকজন।

এরপর কুরাইশের বাইরে থেকে কয়েকজন ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁরা হলেন-
.আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ
.মাসউদ বিন রাবিয়াহ রাঃ
.আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ রাঃ
.আহমাদ বিন জাহাশ রাঃ
.সুহাইব বিন সিনান রুমী রাঃ এবং আরও কয়েকজন।
এরপর কয়েকজন ক্রীতদাস ইসলাম গ্রহণ করেন।তাঁরা হলেন-
.বিলাল ইবনে রাবাহ রাঃ
.খাব্বাব ইবনুল আরাত রাঃ
.উম্মু আইমান বারাকাত রাঃ
.আমির বিন ফুহাইরা রাঃ
.ইয়াসির রাঃ এবং তাঁর স্ত্রী সুমাইয়া রাঃ ও পুত্র আম্মার ইবনে ইয়াসির রাঃ।

প্রকাশ্য দাওয়াত

এরপর লোকেরা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে। ফলে মক্কার সর্বত্র ইসলামের কথা ছড়িয়ে পড়ে এবং এ বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা হতে থাকে। অতঃপর মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে তাঁর বাণী উচ্চকণ্ঠে প্রচার করার নির্দেশ দেন এবং আল্লাহর দীনের দাওয়াত নিয়ে জনগণের মধ্যে প্রকাশ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেন নবুওয়াত লাভের পর ইসলামের প্রকাশ্য প্রচার শুরু হবার আগে গোপন প্রচার কাজ তিন বছর ধরে চলে। তখন আল্লাহ এই নির্দেশ দেন, "হে নবী, এখন আপনি উচ্চকণ্ঠে প্রচার শুরু করুন এবং মুশরিকদের কথার

প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে না।" তিনি আরো বলেন, "হে নবী, আপনি আপনার নিকট-আত্মীয়দেরকে সতর্ক করুন আর আপনার অনুসারী মু'মিনদের প্রতি অনুকম্পাশীল ও সদয় থাকুন।
আর বলুন: আমি প্রকাশ্য সতর্ককারী।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণ নামায পড়ার সময় দুর্গম গিরিগুহায় চলে যেতেন এবং লোকজনের চোখের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে নামায পড়তেন। একদিন সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস সহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের একটি ক্ষুদ্র দল মক্কার কোন এক পর্বত গুহায় নামায

ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের একটি ক্ষুদ্র দল মক্কার কোন এক পর্বত গুহায় নামায পড়ছেন, এমন সময় মক্কার মুশরিকদের একটি দল সেখানে উপস্থিত হয়। তারা মুমিনদেরকে কঠোরভাবে নিন্দা ও গালিগালাজ করতে থাকে এবং এক পর্যায়ে তারা তাদের ওপর হামলা চালিয়ে তাদেরকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস এই সময় একটা মরা উটের চোয়ালের হাড় দিয়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত হেনে মুশরিকদের একজনের মাথা ফাটিয়ে দেন। ইসলামের জন্য এটাই ছিল রক্তপাতের প্রথম ঘটনা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক প্রকাশ্য দাওয়াত দিলেও যতক্ষণ তাদের দেব-দেবীর নামোল্লেখ বা সমালোচনা করেননি ততক্ষণ তারা তাঁর থেকে দূরে সরে যায়নি কিংবা তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখরও হয়নি। কিন্তু যখন তিনি তাদের দেব-দেবীর সমালোচনা করলেন তখনই তারা তাঁর আন্দোলনকে একটা ভয়ংকর ও মারাত্মক জিনিস বলে মনে করলো। তাঁর বিরুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে ক্ষেপে উঠলো এবং তাঁর বিরুদ্ধতা ও শত্রুতায় কোমর বেঁধে নামলো। তবে স্বল্পসংখ্যক লোক যারা তখনো আত্মপ্রকাশ করেননি- ইসলামের খাতিরে এই শত্রুতা থেকে আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাঁর চাচা আবু তালিব পূর্ণ সহানুভূতি ও অনুকম্পা দেখাতে থাকেন। তিনি কুরাইশদের আক্রমণের মুখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্ষা করতে থাকলেন এবং তার পাশে এসে দাঁড়ালেন।ফলে তিনি আল্লাহর দ্বীন প্রচারের কাজ অপ্রতিহত গতিতে চালিয়ে যেতে সক্ষম হলেন। কিন্তু কুরাইশরা যখন দেখলো, সম্পর্কচ্ছেদ ও দেব-দেবীর সমালোচনার বিরুদ্ধে তাঁদের প্রবল আপত্তিকেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিন্দুমাত্র পরোয়া করছেন না, অধিকন্তু তাঁর চাচা আবু তালিব তাঁকে পুরোপুরি সহযোগিতা করে যাচ্ছেন এবং তাঁকে আশ্রয় দিয়ে চলছেন, কোন মতেই তাঁকে কুরাইশদের হাতে সমর্পণ করছেন না; তখন একদিন কুরাইশদের গণ্যমান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ সদলবলে আবু তালিবের কাছে গিয়ে বললো, "হে আবু তালিব, আপনার ভাতিজা আমাদের দেব-দেবীকে গালি- গালাজ করেছে, আমাদের ধর্মের নিন্দা করেছে, আমাদের বুদ্ধিমত্তাকে বোকামী ঠাউরিয়েছে এবং আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করেছে। এমতাবস্থায় হয়

আপনি তাকে এসব থেকে বিরত রাখুন নতুবা তাকে শায়েস্তা করার জন্য আমাদেরকে সুযোগ দিন।" আবু তালিব তাদেরকে হৃদয়গ্রাহী ভাষায় জবাব দিলেন এবং বুঝিয়ে-সুজিয়ে বিদায় করলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাজ যথারীতি চালিয়ে যেতে লাগলেন। তিনি আল্লাহর দীনের দিকে মানুষকে দাওয়াত দিতে থাকলেন ও তাঁর প্রচার-প্রসারের কাজ অব্যাহত রাখলেন। ফলে কুরাইশদের বিদ্বেষ ও আক্রোশ দিন দিন বেড়ে যেতে লাগলো। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনায় মেতে উঠলো এবং পরস্পরকে তাঁর বিরুদ্ধে উস্কানী দিতে আরম্ভ করলো।

তাই পুনরায় তারা আবু তালিবের কাছে উপস্থিত হয়ে বললো, হে আবু তালিব, আপনি আমাদের মধ্যে প্রবীণ ও মুরুব্বী। আমরা আপনাকে গণ্যমান্য ও শ্রদ্ধেয় মনে করি।

আমরা বলেছিলাম, আপনার ভাতিজাকে নিষেধ করুন কিন্তু আপনি তা করলেন না। আল্লাহর কসম, আমরা এভাবে আর চলতে দিতে পারি না। সে আমাদের সমালোচনা, দেব-দেবীর নিন্দা ও আমাদের বুদ্ধিমত্তাকে বোকামী ঠাওরানোর যে ধৃষ্টতা দেখিয়ে যাচ্ছে তা আমরা আর সহ্য করতে পারি না। এখন হয় আপনি তাকে নিবৃত্ত করবেন নচেৎ আমরা আপনাকে সহ তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবো এবং একপক্ষ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আগে আর থামবো না।"

আবু তালিব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডেকে পাঠালেন। তিনি তাঁকে বললেন, "ভাতিজা, তোমার সম্প্রদায়ের লোকজন আমার কাছে এসে এইসব কথা বলেছে।" এই বলে তিনি কুরাইশ নেতৃবৃন্দ যা বলেছিলো তা তাঁকে বললেন। তারপর বললেন, "অবস্থা যখন এই পর্যায়ে উপনীত হয়েছে তখন তুমি নিজেকে ও আমাকে সামলে চলো। আমার ওপর আমার সাধ্যের বেশী কোন কিছু চাপিয়ে দিও না।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনে করলেন, চাচা মত পাল্টে ফেলেছেন, কুরাইশদের মুকাবিলায় তাঁকে একাকী ছেড়ে দিতে চাচ্ছেন এবং তাঁর সহায়তা করতে অক্ষম হয়ে পড়েছেন। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "চাচা, আল্লাহর কসম করে বলছি, তারা যদি আমার ডান হাতে সূর্য ও বাম হাতে চাঁদ এনে দেয় এবং তার বিনিময়ে আমাকে এই কাজ ত্যাগ করতে বলে, তবুও আমি এটা ত্যাগ করবো না। আমি ততদিন পর্যন্ত এ কাজ করতে থাকবো, যতদিন না আল্লাহ তাঁর দীনকে বিজয়ী করেন কিংবা এই কাজ করতে করতে আমি ধ্বংস হয়ে যাই।" এই কথা বলার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু' চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো।

অতঃপর তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং চলে যেতে উদ্যত হলেন। কিছুদূর অগ্রসর হলে আবু তালিব তাঁকে ডেকে বললেন, "হে ভাতিজা, কাছে এসো।" তিনি কাছে গেলেন। আবু তালিব বললেন,

"ভাতিজা, ঠিক আছে। তুমি যা বলতে চাও বলতে থাক। আমি কখনো কোন কারণে তোমাকে ওদের কাছে সমর্পণ করবো না।"

কুরাইশরা যখন জানতে পারলো যে, আবু তালিব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবমাননাকর অবস্থার মুখে একা ছেড়ে দিতে রাজী নন এবং তাদের সম্পর্কচ্ছেদ ও শত্রুতা সত্ত্বেও তাঁকে তাদের হাতে তুলে না দিতেও অবিচল, তখন তারা উমারাহ ইবনে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা নামক এক যুবককে আবু তালিবের কাছে নিয়ে গিয়ে বললো, “হে আবু তালিব, এই যুবককে দেখুন, এর নাম উমারাহ ইবনে ওয়ালীদ। কুরাইশ গোত্রে এর মত সাহসী, শক্তিমান ও সুদর্শন যুবক আর নেই। একে আপনি পুত্র হিসেবে গ্রহণ করুন। এর বুদ্ধিমত্তা ও সাহায্য-সহযোগিতা দ্বারা আপনি উপকৃত হতে পারবেন। আর আপনার ঐ ভাতিজাকে আমাদের হাতে তুলে দিন, যে আপনার পূর্বপুরুষের ধর্মের বিরোধিতা করছে, আপনার সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে এবং তাদের বুদ্ধিমত্তাকে বোকামী ঠাওরাচ্ছে। তাকে আমাদের হাতে তুলে দিন, আমরা তাকে হত্যা করি। একজন মানুষের বিনিময়ে একজন মানুষ আপনি পেয়ে যাচ্ছেন।"

আবু তালিব বললেন, “আল্লাহর কসম, তোমরা অত্যন্ত জঘন্য ব্যাপার আমার ওপর চাপিয়ে দিচ্ছ। আমি কি এমন প্রস্তাব মেনে নিতে পারি যে, তোমরা তোমাদের সন্তান আমাকে দেবে, আমি তাকে খাইয়ে-দাইয়ে মানুষ করবো আর আমার সন্তান তোমাদের হাতে তুলে দেবো, তোমরা তাকে হত্যা করবে? খোদার কসম, জেনে রেখো, এটা কখনো হবে না।" মুতয়িম ইবনে আদী বললো, “হে আবু তালিব, আপনার সম্প্রদায় আপনার কাছে
ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাবই দিয়েছে। আপনি নিজেও যা পছন্দ করনে না তা থেকে তারা
আপনাকে অব্যাহতি দিতে চাচ্ছে। অথচ মনে হচ্ছে, আপনি তাদের কোন প্রস্তাবই গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন।” আবু তালিব মুতয়িমকে বললেন, "আল্লাহর কসম, তারা আমার প্রতি সুবিচার করেনি। আসলে তুমি আমাকে অপমানিত করতে বদ্ধপরিকর। এজন্য গোটা সম্প্রদায়কে আমার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতে চাচ্ছ। এখন তোমার যা ইচ্ছা করতে পার।"

এবার ব্যাপারটা সবার আয়ত্তের বাইরে চলে গেল এবং যুদ্ধ পরিস্থিতি দেখা দিল। কুরাইশরা পরস্পরকে যুদ্ধের জন্য ক্ষেপিয়ে তুলতে লাগলো। বিভিন্ন গোত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেসব সাহাবা ছিলেন এবং যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে কুরাইশরা পরস্পরকে ক্ষেপিয়ে তুলতে লাগলো। প্রত্যেক গোত্র তার মধ্যে অবস্থানকারী মুষ্টিমেয় মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, ভয়ংকর নির্যাতন শুরু করে দিল এবং ইসলাম ত্যাগ করার জন্য কঠোর চাপ দিতে লাগলো। একমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নির্যাতন থেকে নিরাপদ রইলেন। চাচা আবু তালিবের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করলেন।

আবু তালিব যখন দেখলেন কুরাইশরা চরম হিংসাত্মক পথ বেছে নিয়েছে, তখন বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব গোত্রের লোকদের সাথে তিনি যোগাযোগ স্থাপনের উদ্যোগ নিলেন। রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্ষা করা ও তাঁর প্রতি যে কোন অশোভন আচরণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর যে নীতি তিনি গ্রহণ করেছিলেন তার প্রতি সমর্থন ও সহযোগিতা দানের জন্য সকলকে আহ্বান জানালেন। এই দুই গোত্রের সকলেই তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলো ও তাঁকে সমর্থনের আশ্বাস দিলেন। একমাত্র
আল্লাহর দুশমন অভিশপ্ত আবু লাহাব সমর্থন দিল না।

রাসূলুল্লাহর (সা) ওপর উৎপীড়নের বিবরণ

ক্রমেই কুরাইশরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ ও তাঁর সহচরদের শত্রুতায় তারা বেসামাল হয়ে উঠলো। তারা মূর্খ ও বখাটে ধরনের লোকদের উস্কিয়ে দিতে লাগলো। এইসব অর্বাচীন তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে গালাগালি এবং নানাভাবে কষ্ট দিতে লাগলো। তাঁকে কবি, যাদুকর, জ্যোতিষী ও পাগল বলে অপবাদ দিলো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দীন প্রচার ও প্রসার করার কাজে অবিচল থাকলেন। ক্রমেই তিনি অধিকতর প্রকাশ্যভাবে দাওয়াত দিতে লাগলেন। 'আরবদের বাতিল রসম রেওয়াজের সমালোচনা, তাদের মূর্তিপূজা প্রত্যাখ্যান ও তাদের কুফরী মতবাদের সাথে তাঁর সম্পর্কচ্ছেদের কথা তাদের কাছে ঘোর আপত্তিকর হওয়া সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তা করতে লাগলেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস বলেন-
"একদিন যখন কুরাইশ সরদারগণ হাজরে আসওয়াদের নিকট সমবেত হয়েছে, তখন আমি সেখানে উপস্থিত হলাম। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বললো, "এই লোকটার ব্যাপারে আমরা যতটা সহিষ্ণুতা দেখিয়েছি তা নজিরবিহীন। সে আমাদেরকে বোকা বানিয়েছে এবং আমাদের দেবদেবীকে গালাগালি করেছে। অত্যন্ত নাজুক ও মারাত্মক ব্যাপারে আমরা তাকে সহ্য করেছি।" এভাবে তাদের মধ্যে আলোচনা চলতে থাকাকালে সহসা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে আবির্ভূত হলেন। শান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে তিনি হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করলেন। অতঃপর সমবেত লোকদের পাশ দিয়ে তিনি পবিত্র কা'বার তাওয়াফ করতে লাগলেন। তাদের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় কেউ কেউ বিরূপ মন্তব্য করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমণ্ডলে আমি সে মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলাম। দ্বিতীয়বার যখন তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন তখন তারা আবার শ্লেষপূর্ণ মন্তব্য করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেহারায় আমি তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলাম। তৃতীয় বারে তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় আবার তারা অনুরূপ মন্তব্য করলে তিনি সেখানে থেমে বললেন, "হে কুরাইশগণ, শোন, যার হাতে আমার প্রাণ সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি, আমি তোমাদের সর্বনাশ বয়ে এনেছি (যদি তোমরা ঈমান না আন)।"

তাঁর উক্তিতে জনতা বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধ ও হতবাক হয়ে গেল। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ক্ষণকাল আগেও তার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশী আক্রোশ ও উস্কানিমূলক কথা বলেছে, সেও যথাসম্ভব মিষ্ট কথা বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শান্ত করতে উদ্যত হলো। এমনকি সে বলতে বাধ্য হলো, "আবুল কাসিম, তুমি যাও। তুমি তো আর নির্বোধ নও।"

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান থেকে চলে গেলেন। পরদিন আবার সবাই একই স্থানে সমবেত হলো। আমিও সেখানে ছিলাম। 'তখন তারা বলাবলি করতে লাগলো, "দেখলে তো। মুহাম্মাদের কতদূর বাড় বেড়েছে এবং সে কতদূর ধৃষ্টতা দেখালো। তোমরা যে কথা একেবারেই পছন্দ কর না তা সে তোমাদের মুখের ওপর স্পষ্ট বলে দিল। আর তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে।"

ঠিক সেই মুহূর্তেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে আবির্ভূত হলেন।

আর যায় কোথায়! সকলে একযোগে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। সবাই তাঁকে ঘেরাও করে বলতে থাকলো, "তুমিই তো আমাদের ধর্ম ও দেব-দেবীর বিরুদ্ধে আপত্তিকর কথা বলে থাকো।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "হ্যাঁ, আমিই ঐসব কথা বলে থাকি।" আমি দেখলাম তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহকে তাঁর গলার ওপরের চাদরের দু'পাশ ধরে ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। সেই মুহূর্তে হযরত আবু বাক্স এগিয়ে গিয়ে বাধা দিলেন। তিনি কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, "একটি লোক আল্লাহকে নিজের রব বলে ঘোষণা করেছে, এই কারণে কি তোমরা তাঁকে হত্যা করে ফেলবে।"

এরপর জনতা সেখান থেকে চলে গেল। সেদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর কুরাইশদের যেরূপ মারাত্মক আক্রমণ দেখেছি, তেমন আর কখনও দেখিনি।"

প্রথম হিজরত: আবিসিনিয়া

হাবাশা অর্থাৎ আবিসিনিয়াতে দু'বার হিজরত হয়েছিল। প্রথমবার বারো জন পুরুষ ও চার জন মহিলার একটি ছোট দল সেখানে হিজরত করে। এটি নবুওয়াতের পঞ্চম বছরের ঘটনা। আর দ্বিতীয়বার বেশ বড়সড় একটি দল হিজরত করে। সে দলে ছিল তিরাশি জন পুরুষ এবং আঠারো-উনিশ জন মহিলা।

প্রথম দলটি আল-হাবাশাতে পৌঁছে গুজব শুনতে পায় যে, মক্কার কুরাইশরা মুসলিম হয়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা ছিল ভিন্ন। রাসূলুল্লাহ সূরা আন-নাজমের আয়াতগুলো কুরাইশদের লোকদের পড়ে শোনালে সেই আয়াতগুলো তাদেরকে ব্যাপকভাবে নাড়া দেয়। তিনি শেষ আয়াতে পৌঁছানো মাত্রই সবাই সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। এই শেষের আয়াতটি ছিল সিজদাহ'র আয়াত। সে সময় নবীজি আর মুসলিমদের সাথে সাথে কাফেররাও সিজদা দেয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, কুরাইশের লোকেরা মুসলিম হয়ে গেছে। ফলে হাবাশা থেকে মুসলিমরা মক্কায় ফিরে আসেন। এসে বুঝতে পারেন যে, এ খবর মিথ্যা।

সাহাবীদের কষ্ট আর যন্ত্রণা দেখে রাসূলুল্লাহ তাদেরকে বললেন, 'তোমরা হাবাশাতে চলে গেলেই পারো, কেননা সেখানে একজন ন্যায়পরায়ণ রাজা আছেন। তিনি কারো সাথে জুলুম করেন না।' এই রাজা হলেন আন-নাজ্জাশী, খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী। নবীজির পরামর্শ অনুযায়ী সাহাবারা এ দ্বিতীয়বারের মতো হাবাশায় হিজরত করেন। সবার আগে উসমান ইবন আফফান, তাঁর স্ত্রী নবীকন্যা উম্ম কুলসুমকে নিয়ে মক্কা ত্যাগ করেন। তাঁরা চলে গেলে দ্বিতীয় দলটিও মক্কা ত্যাগ করে। কিন্তু মক্কার লোকেরা তাদেরকে এত সহজে ছেড়ে দেয়নি।

আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুসলিমরা রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কোনোদিক দিয়েই মক্কার জন্য হুমকিস্বরূপ ছিল না। তারপরও কুরাইশরা মুসলিমদের পিছু নিলো। আন- নাজ্জাশীর কাছে দূত পাঠালো যেন সে আবিসিনিয়ার মুসলিমদেরকে তাদের হাতে হস্তান্তর করে দেয়। এই মিশনের জন্য মনোনীত করা হয় আমর ইবন আস এবং আবদুল্লাহ ইবন রাবিআ অথবা আমর ইবন রাবিয়াকে। ঘটনার কেন্দ্রীয় চরিত্র আমর ইবন আস একজন দক্ষ কূটনীতিবিদ, কুরাইশদের খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। দেশ- বিদেশের বহু লোকের সাথে তার পরিচয়, রাজাবাদশা এবং বড় বড় লোকদের সাথে তার ওঠাবসা। কূটকৌশল আর কথার লড়াইয়ে তুখোড়। তাই এ কাজের জন্য কুরাইশরা তাকেই বেছে নেয়।

আমর ইবন আস নাজ্জাশীর দরবারে গেলো। কথা ছিল, সে প্রথমে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করবে। তাদের প্রত্যেককে কিছু 'উপহার' দিয়ে-সোজা বাংলায় ঘুষ দিয়ে, তারপর নিজের প্রস্তাবনা তুলবে। তার কথার সারমর্ম হবে এরকম: মক্কার কিছু মূর্খ লোক পালিয়ে তোমাদের দেশে ঢুকেছে, আমরা চাই তোমরা তাদেরকে আমাদের হাতে তুলে দাও। অর্থাৎ তাঁর পরিকল্পনা ছিল উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে কথাবার্তা বলে আগেভাগেই সব ঠিক করে রাখবে। এরপর

নাজ্জাশীর সাথে সাক্ষাতের আনুষ্ঠানিকতা সেরে নেবে। তাহলে নাজ্জাশীর সাথে যখনই সে মুসলিমদের বিষয়ে কথা তুলবে, তখন এই ঘুষখোর কর্মকর্তারা আমরের পক্ষে সায় দেবে। আমর ঠিক এই কাজটাই করলো। কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসারের সাথে দেখা করে তাদেরকে উপহার দিয়ে কথাবার্তা বলে রাখলো, বললো, 'নাজ্জাশীর সাথে দেখা করার আগেই যদি তোমরা এই (মুসলিম) লোকগুলোকে আমাদের হাতে হস্তান্তর করতে পারো, তাহলে আমি আরও খুশি হবো।' কারণ মুসলিমদের কথা নাজ্জাশীর মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, সে এই ঝুঁকি নিতে চায় নি। মূলত তারা কুরআনের আয়াতকে ভয় পেতো। তাই চাচ্ছিলো না যে মুসলিমদের সাথে রাজার দেখা হোক।

এরপর আমর গেলো নাজ্জাশীর সাথে দেখা করতে। বললো, 'আমাদের ভেতর কিছু গণ্ডমূর্খ আছে। ওরা আপনার দেশে আশ্রয় নিয়েছে। তারা আমাদের ধর্ম তো ত্যাগ করেছেই, আপনার ধর্মও তারা গ্রহণ করেনি...', এভাবে আরও নানা রঙ্গচঙ্গে উত্তেজক কথা বলে নাজ্জাশীকে বিভ্রান্ত করতে চায়, ক্ষেপিয়ে তোলার সর্বাত্মক চেষ্টা করে। তারপর বললো, 'আমি চাই আপনি ওদেরকে আমাদের হাতে তুলে দিন।' এসময় নাজ্জাশীর বাদ বাকি কর্মকর্তারাও আমর ইবন আসকে সমর্থন করছিল।

আন-নাজ্জাশী বললেন, 'না, যারা আমার দেশে আশ্রয় নিয়েছে আমি তাদের কথা না শুনে অন্য কারো হাতে তাদেরকে তুলে দেবো না।' রাসূলুল্লাহ এ কারণেই মুসলিমদেরকে হাবাশায় হিজরত করতে বলেছিলেন। কেননা তিনি জানতেন আন- নাজ্জাশী একজন ন্যায়পরায়ণ রাজা, তিনি তাঁর আদর্শকে সব কিছুর ওপরে স্থান দেন।

নাজ্জাশী মুসলিমদের ডেকে পাঠান। তাদেরকে বলা হলো যে, মক্কার আমর ইবন আস নাজ্জাশীর সাথে দেখা করেছে। এখন নাজ্জাশী তোমাদের সাথে দেখা করতে চান। এ কথা শুনে মুসলিমরা শুরা (পরামর্শ) করে। সিদ্ধান্ত হয় যে, জাফর ইবন আবি তালিব মুসলিমদের মুখপাত্র হবেন। যা সত্যি তিনি সেটাই বলবেন। তারা নাজ্জাশীর দরবারে এলে নাজ্জাশী তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কোন ধর্মে বিশ্বাসী? তোমরা তোমাদের দেশের লোকেদের ধর্ম ত্যাগ করেছো, আবার আমাদের ধর্মও গ্রহণ করোনি। তোমরা পৃথিবীর কোনো ধর্মই মানছো না। তোমরা কারা?'

জাফর উত্তরে যা বলেন, তাঁর পুরো বক্তব্য উম্মে সালামা হাদীসে উল্লেখ আছে। আল্লাহর রাসূলের সাঃ চাচাতো ভাই জাফর থেকে বর্ণিত একটি বলেন,

'হে রাজা। আমরা ছিলাম মুশরিক। মূর্তিপূজা করতাম, মৃত পশুর মাংস খেতাম, আতিথেয়তার থোড়াই-কেয়ার করতাম, অবৈধ কাজকে বৈধ করে নিতাম, একে- অপরের রক্ত ঝরাতাম। আমরা ভালো-মন্দের তোয়াক্কা করতাম না। আর তাই আল্লাহ তাআলা আমাদের কাছে আমাদেরই মধ্য থেকে এমন একজন নবী প্রেরণ করেছেন, যাঁর সততা ও বিশ্বস্ততা নিয়ে কোনোকালেই আমাদের কোনো সন্দেহ ছিল না।

তিনি আমাদেরকে আদেশ করেছেন শুধুমাত্র এক আল্লাহর ইবাদত করতে, তাঁর ইবাদতে আর কাউকে শরীক না করতে। তিনি আমাদেরকে আত্মীয়ের হক আদায় করতে আদেশ করেছেন, অতিথিদের সম্মান করতে বলেছেন আর শিখিয়েছেন মহান রবের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করা ও রোজা রাখার কথা- তাঁর ইবাদতে অন্য কাউকে পরীক না করার কথা। তিনি আমাদের আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছেন। যেন আমরা আমাদের রবের একত্ববাদের ঘোষণা দিই, একমাত্র তাঁরই ইবাদত করি আর তিনি ছাড়া আর যত মূর্তি, পাথর আছে, যেগুলোকে আমাদের বাপদাদারা পূজা করেছে, সেগুলো ভেঙে ফেলি। তিনি আমাদেরকে সত্য কথা বলার আদেশ দেন, লোকের আমানত রক্ষা করতে বলেন, আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা ও আতিথেয়তার নিয়ম মেনে চলতে নির্দেশ দেন। হারাম কাজ, অবৈধ কাজ, একে-অপরের রক্তপাত করা থেকে বিরত থাকতে বলেন। তিনি আমাদেরকে সকল প্রকার খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকার শিক্ষা দেন। মিথ্যা বলা, এতিমের সম্পদে ভাগ বসানো, সতী-সাধ্বী নারীর নামে কুৎসা রটাতে নিষেধ করেন। তিনি আমাদের বলেন আল্লাহর ইবাদত করতে, ইবাদতে কাউকে অংশীদার না করতে।'

এভাবে জাফর এ আন-নাজ্জাশীর কাছে একেবারে অল্প কথায় ইসলামের সারসংক্ষেপ তুলে ধরেন। জাফর এ ইসলামের এমন সব সুন্দর শিক্ষার কথা উল্লেখ করেছেন, যা সৎ গুণসম্পন্ন যেকোনো লোক ভালো বলে মানতে বাধ্য। তিনি নাজ্জাশীর কাছে এটা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন যে, ইসলাম কোনো খারাপ কাজের নির্দেশ দেয় না, কোনো অনৈতিক কাজকে প্রশ্রয় দেয় না। বরং এর প্রতিটি হুকুম-আহকাম, প্রতিটি শিক্ষাই কল্যাণকর। এর মাঝেই তিনি ইসলামের চারটি স্তম্ভের কথাও উল্লেখ করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল সংক্ষিপ্ত, পরিমিত। সবশেষে জাফর বলেন,

'আর তাই আমরা তাঁর ওপর ঈমান এনেছি, তাঁকে বিশ্বাস করেছি, তিনি আল্লাহর থেকে যা কিছু দিকনির্দেশনা এনেছেন, সেগুলোকে মেনে চলেছি। আমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করি, কাউকে তাঁর সাথে শরীক করি না। আল্লাহ তাআলা যেগুলো হারাম করেছেন, আমরাও সেগুলোকে হারাম হিসেবে মানি আর তিনি যেগুলোর অনুমতি দিয়েছেন, আমরাও সেগুলোকে হালাল হিসেবে গ্রহণ করে সিই। কিন্তু আমাদের দেশের লোকেরা আমাদের সাথে সীমালঙ্ঘন করে। আমাদের ওপর অত্যাচার করে। তারা চায় আমাদেরকে ঈমান থেকে বিচ্যুত করতে, আমাদেরকে জাহেলি যুগের মূর্তিপূজায় ফিরিয়ে নিতে। তারা চায় আমাদের দিয়ে সেই সব হীন কাজ করাতে যেগুলোকে আমরা আগে সঠিক মনে করতাম। যখন তারা আমাদের ওপর জোর-জুলুম করতে লাগলো, দ্বীন পালনে একের পর এক বাধার সৃষ্টি করতে শুরু করলো, তখন আমরা আমাদের দেশ ত্যাগ করলাম, অন্য সবার ওপর আপনাকে পছন্দ করলাম। আমাদের আশা ছিল যে আমরা আপনার আতিথেয়তা পাবো, আর আমরা আশা রাখি আপনার এ রাজ্যে কেউ আমাদের ক্ষতি করতে আসবে না।

জুলুম-নির্যাতনের কথায় নাজ্জাশীর মন নরম হয়ে পড়ে। তাঁর মনে পড়ে যায় ঈসা ওত্র ও তাঁর অনুসারীদের সাথেও কী পরিমাণ অন্যায়-অত্যাচার করা হয়েছিল। তিনি নিজেও খুব ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। জাফরের বক্তব্যের সমাপ্তিটা ছিল সবচেয়ে চমৎকার এবং উপযুক্ত। তাঁর সব কথা শেষে নাজ্জাশী প্রশ্ন করলেন, 'মুহাম্মাদ তোমাদের কাছে যা এনেছেন, তাঁর কিছু কি তোমরা এনেছো?' তিনি কুরআনের আয়াত শুনতে চাচ্ছিলেন। জাফর ইবন আবি তালিব কুরআনের কয়েকটি আয়াত তাঁকে পড়ে শোনালেন। তিনি কুরআন থেকে যেকোনো অংশই তিলাওয়াত করতে পারতেন, কিন্তু বিচক্ষণ জাফর সূরা মারইয়ামের থেকে পড়তে শুরু করলেন, তিলাওয়াত করলেন প্রথম আটাশটি আয়াত।

"কাফ-হা-ইয়া-আইন-সাদ। এটা আপনার রবের অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বান্দা যাকারিয়্যার প্রতি। যখন সে তার রায়কে আহ্বান করেছিল নিভৃতে, সে বলেছিল, হে আমার রবা আমার হাড় দুর্বল হয়ে পড়েছে, বার্ধক্যে মাথার চুলগুলো সাদা হয়ে গেছে। হে আমার রবা আমি তো কখনো তোমাকে ডেকে ব্যর্থ হই নি। আমি আমার স্বগোত্রের স্বীনের ব্যাপারে আশঙ্কা করছি, (অপরদিকে) আমার স্ত্রী বন্ধ্যা; কাজেই আপনি আপনার পক্ষ থেকে আমাকে এক জন উত্তরাধিকারি দান করুন।" (সূরা মারইয়াম, ১৯: ১-৬)

নাজ্জাশী জাফরের তিলাওয়াত শুনে কাঁদতে লাগলেন, কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দাঁড়ি কান্নায় ভিজে গেল। আর তাঁর সব সভাসদরাও এতো করে কাঁদলো যে তাদের বাইবেলগুলো ভিজে গেলো। সেটি ছিল এক আবেগঘন, হৃদয়গ্রাহী কিরাত।

আন-নাজ্জাশী কুরাইশদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন, মুসলিমদের হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানালেন। কুরাইশ প্রতিনিধিরা চলে গেলো। যাওয়ার সময় আমর ইবন আস হুমকি দিয়ে গেলো যে করেই হোক মুসলিমদের সে মক্কায় ফিরিয়ে আনবে, তাদেরকে শেষ করে ছাড়বে। আমর ইবন আসের সঙ্গী তাকে বললো, 'এমন করে বোলো না, এরা তো তোমাদেরই আত্মীয়। নাজ্জাশী যদি এদেরকে ফিরিয়ে দিতে রাজি না-ই হয়, তাহলে বাড়াবাড়ি না করে দেশে ফিরে যাও।' কিন্তু আমর ইবন আস বললো, 'না, আমি কালই আবার আসবো, রাজাকে শুনিয়ে যাবো যে, মুসলিমরা ঈসাকে দাস বলে।'

আমর ইবন আস পরদিন আবার এসে নাজ্জাশীকে বললো, মুসলিমরা ঈসাকে আল্লাহর পুত্র বলে স্বীকার করে না, তাঁকে নিছক দাস বলে বিশ্বাস করে। আমর ইবন আস ছিল সে সময় একজন মুশরিক, নবী ঈসাকে নিয়ে আদতে তার এত মাথাব্যথার কিছু নেই। তিনি খোদা হন বা নবী হন বা নিছক একজন দাসই হন-তাতে তার কিছুই আসে যায় না। কিন্তু সে এই বিষয়টাকে পুঁজি করে নিজের ফায়দা হাসিল করতে চাচ্ছিল। তাই সে ফিতনা তৈরি করছিল। আন-নাজ্জাশী এ কথা শুনে কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি ছিলেন ধার্মিক। তাঁর রাজ্যে এসব নিয়ে কোনো ফিতনা হোক সেটা তাঁর কাম্য ছিল না। তাই তিনি মুসলিমদের আবার ডাকলেন।

মুসলিমরা আগের সিদ্ধান্তেই অটল। তারা পূর্বের সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন, যা-ই হোক না কেন, তারা সত্য কথাই বলবেন। এবারও আগের দিনের মত জাফর ইবন আবি তালিবই তাদের মুখপাত্র। দরবারে উপস্থিত হলে আন-নাজ্জাশী জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, ঈসা সম্পর্কে তোমাদের বক্তব্য কী?'

- তিনি আল্লাহর দাস, আল্লাহর নবী, আল্লাহর কালাম, জন্ম নিয়েছিলেন পবিত্র ও কুমারী নারী মারইয়ামের গর্ভে।'

- তাঁর সম্পর্কে তোমাদের বক্তব্য আর আমার বক্তব্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।এই কথা শোনার সাথে সাথে বিশপেরা উত্তেজিত হয়ে পড়লো। কীভাবে আন-নাজ্জাশী এই ধরনের কথা বলতে পারলেন। আবিসিনিয়ার খ্রিস্টানরা ছিল অর্থোডক্স খ্রিস্টান। তারা ঈসাকে এ ঈশ্বর মনে করতো, তাই তারা ঈসার এ ব্যাপারে মুসলিমদের বিশ্বাস শুনে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট, মুসলিমরা যে তাঁকে আল্লাহর দাস মনে করে এটা তারা মানতে পারলো না। আন-নাজ্জাশী উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, 'তোমরা যা খুশি বলতে পারো। আমি এই মানুষগুলোকে আমার রাজ্যে স্বাধীন ঘোষণা করলাম। মক্কার প্রতিনিধিরা আবিসিনিয়ায় এলে আন-নাজ্জাশী প্রথমেই তাদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তোমরা আমার জন্য তোমাদের দেশ থেকে কী এনেছো?' আমর ইবন আস বলেছিলেন, 'আমি আপনার জন্য চামড়ার তৈরি কিছু জিনিস এনেছি।' চামড়ার জিনিস ছিল আন-নাজ্জাশীর খুব পছন্দের। কিন্তু সেদিন, উম্মে সালামার ভাষায়, 'সেদিন আমর ইবন আস ও তার সঙ্গীরা অপমানিত হলো, কেননা আন-নাজ্জাশী তাদের বের করে দেন, এমনকি তাদের দেওয়া উপহারগুলিও ফেরত দেন।' আমর ইবন আসের সাথে আন-নাজ্জাশীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল, কিন্তু আদর্শের প্রশ্নে তিনি বন্ধুত্বকেও প্রশ্রয় দেননি, বরং সত্যের পক্ষেই দাঁড়িয়েছিলেন।

আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় হিজরত

অতঃপর মক্কায় ফিরে আসা মুহাজিরদের ওপর বিশেষভাবে এবং অন্য মুসলিমদের ওপর সাধারণভাবে কুরাইশদের অন্যায়-অত্যাচার ও উৎপীড়নের মাত্রা বহুগুণে বৃদ্ধি পেল। শুধু মুহাজিররাই নন, তাঁদের পরিবার-পরিজনও এ নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পেল না। এর কারণ হচ্ছে, ইতিপূর্বে কুরাইশরা যখন জানতে পেরেছিল, আবিসিনিয়ার মুহাজিরদের সাথে নাজ্জাশি অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ করছেন এবং তাঁদের প্রতি নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে চলেছেন, তখন মনে মনে কুরাইশরা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। আর সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। মুহাজিরগণ যখন মক্কায় ফিরে এলেন তখন কুরাইশরা আপনা থেকেই সে সুযোগ পেয়ে গেল।

মুসলিমদের প্রতি হিংসাপরায়ণ কুরাইশদের জুলুম-নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় রাসুলুল্লাহ সা. পরামর্শ দিলেন পুনরায় আবিসিনিয়ায় হিজরত করতে।

কিন্তু প্রথম হিজরতের তুলনায় দ্বিতীয় হিজরতের ব্যাপারটি ছিল অনেক বেশি সমস্যাসঙ্কুল ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ, প্রথমবার হিজরতের সময় কুরাইশরা বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন ছিল না। কিন্তু এবার তারা অনেক বেশি সচেতন এবং যেকোনো মূল্যে এ ধরনের প্রচেষ্টা প্রতিহত করার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর।

কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য সাধনে সাফল্যলাভের ব্যাপারে কুরাইশদের তুলনায় মুসলিমদের সচেতনতা ও ঐকান্তিকতার মাত্রা ছিল অনেক বেশি। উপরন্তু নিরীহ-নির্দোষ এবং ন্যায়নিষ্ঠ মুসলিমদের প্রতি ছিল আল্লাহ তাআলার বিশেষ রহমত। যার ফলে কুরাইশদের তরফ থেকে কোনো অনিষ্ট কিংবা প্রতিবন্ধকতা আসার আগেই তাঁরা সহিহ সালামতে গিয়ে পৌঁছলেন হাবশার সম্রাটের দরবারে।

দ্বিতীয় দফায় সর্বমোট ৮২ কিংবা ৮৩ জন পুরুষ হিজরত করেছিলেন (এর মধ্যে আম্মার রাদি.-এর হিজরত সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে), এবং ১৮ কিংবা ১৯ জন নারীও সে দলে ছিলেন। আল্লামা সুলাইমান মানসুরপুরি মহিলা মুহাজিরগণের সংখ্যা ১৮ জনের কথা উল্লেখ করেছেন।

আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুহাজিরগণের বিরুদ্ধে কুরাইশ ষড়যন্ত্র

জান-মাল ও ঈমান রক্ষার্থে মুসলিমগণ দেশত্যাগ করে আবিসিনিয়ায় গিয়ে সেখানে শান্তি স্বস্তি লাভ করায় কুরাইশগণের দারুণ গাত্রদাহ সৃষ্টি হয়ে যায়। এ প্রেক্ষিতে 'আমর বিন আস এবং গভীর জ্ঞানগরিমার অধিকারী আব্দুল্লাহ বিন রাবী'আহকে (যিনি তখনো ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নি) নাজ্জাশীর নিকট প্রেরণ করার জন্য দূত মনোনীত করা হয়। তারপর সম্রাট নাজ্জাশী এবং বেতরীকগণের (খ্রীষ্টান ও অগ্নিপূজকদের পুরোহিত) জন্য বহু মূল্যবান উপঢৌকনসহ দূত দ্বয়কে দৌত্যকর্ম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আবিসিনিয়ায় প্রেরণ করা হয়।

আবিসিনিয়ায় পৌঁছে তারা সর্বপ্রথম বেতরীক পুরোহিতগণের দরবারে উপস্থিত হয়ে উপঢৌকন প্রদান করেন। তারপর তাঁদের নিকট সেই সকল বিবরণ ও প্রমাণাদি উপস্থাপন করেন যার ভিত্তিতে তারা মুসলিমগণকে হাবশ হতে বাহির করার উদ্যোগ নিয়েছিল। যদি সেই সকল বিবরণ ও প্রমাণাদির তেমন কোন ভিত্তিই ছিল না, তবুও উপঢৌকনের সুবাদে বেতরীকগণ (পাদ্রীগণ) এ ব্যাপারে একমত হলেন যে, মুসলিমগণকে হাবশ হতে বহিস্কার করার ব্যাপারে সম্রাট নাজ্জাশীকে তাঁরা পরামর্শ দিবেন। বেতরীকগণের নিকট থেকে সহযোগিতা লাভের আশ্বাস পেয়ে কুরাইশ দূতেরা সম্রাট নাজ্জাশীর দরবারে উপস্থিত হয়ে উপঢৌকন প্রদান করে আরজি পেশ করেন। তাঁদের আরজির বিবরণ হচ্ছে এরূপঃ

“হে মহামান্য সম্রাট! আমাদের দেশের কিছু সংখ্যক অবোধ ও অর্বাচীন যুবক আমাদের দেশ থেকে পলায়ণ করে আপনার দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তাঁরা তাঁদের পূর্ব পুরুষগণের নিকট থেকে বংশপরম্পরা সূত্রে চলে আসা ধর্মমত পরিত্যাগ করেছে। আপনার দেশে আশ্রয় গ্রহণ করে আপনার ধর্মমতও গ্রহণ করেন নি। এ হচ্ছে তাঁদের চরম ধৃষ্টতার পরিচায়ক। শুধু তাই নয়, এরা নাকি একটা নতুন ধর্মমতও আবিস্কার করেছেন। এর চাইতে আজগুবি ব্যাপার আর কী হতে পারে বলুন। আমাদের গোত্রীয় প্রধান এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ, এ সকল অর্বাচিনের পিতামাতা, মুরুববী ও আত্মীয়-স্বজনগণ তাঁদেরকে স্বদেশে ফেরত পাঠানোর অনুরোধ জানিয়ে আমাদের দু’জনকে দূত হিসেবে দরবারে প্রেরণ করেছেন। আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের সঙ্গে ওঁদের ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। আমাদের প্রধানগণ এদের ভালমন্দ সম্পর্কে ভালভাবে বোঝেন এবং তাদের অসন্তোষের কারণ সম্পর্কে ওয়াকেবহাল রয়েছেন।’

কুরাইশ দূতেরা সম্রাটের নিকট যখন এ আরজি পেশ করলেন তখন পুরোহিতগণ বললেন, ‘মহামান্য সম্রাট! এরা উভয়েই খুব যুক্তিসংগত এবং সঠিক কথা বলেছেন। আপনি এদের হাতে ঐ দেশত্যাগী যুবকদের সমর্পণ করে দিন। আমাদের মনে হয় এটাই ভাল যে, তাঁরা তাঁদের স্বদেশে ফেরৎ নিয়ে যান।

কুরাইশ দূতগণের কথাবার্তা শ্রবণের পর সম্রাট নাজ্জাশী গভীরভাবে কিছুক্ষণ চিন্তা করে নিয়ে বললেন, ‘আলোচ্য বিষয়টির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের পূর্বে কোন কিছু মন্তব্য প্রকাশ করা কিংবা সিদ্ধান্ত নেয়া সমীচীন হবে না। সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে বিষয়টির খুঁটি নাটি সম্পর্কে ওয়াকেবহাল হওয়া তাঁর বিশেষ প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে তাঁর দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য তিনি মুসলিমদের আহবান জানালেন। মুসলিমগণও আল্লাহ তা‘আলার কথা স্মরণ করে বিষয়ের খুঁটি-নাটিসহ সকল কথা সম্রাট সমীপে পেশ করার জন্য উত্তম মানসিক প্রস্তুটি সহকারে সম্রাটের দরবারে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

সম্রাট নাজ্জাশী তাঁর দরবারে উপস্থিত মুসলিমদের লক্ষ্য করে বললেন, ‘যে ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার কারণে যুগ যুগ ধরে পূর্ব পুরুষগণের বংশপরম্পরা সূত্রে চলে আসা ধর্ম তোমরা পরিত্যাগ করেছ এবং এমন কি আমাদের দেশে আশ্রিত হয়েও তোমরা আমাদের ধর্মের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন রয়েছে সে ধর্মটি কোন্ ধর্ম?’

প্রত্যুত্তরে মুসলিমদের মনোনীত মুখপাত্র হিসেবে জা’ফার বিন আবূ ত্বালিব অকপটে বলে চললেন, ‘হে সম্রাট! আমরা ছিলাম অজ্ঞতা, অশ্লীলতা ও অনাচারের অন্ধকারে নিমজ্জিত দুষ্কর্মশীল এক জাতি। আমরা প্রতিমা পূজা করতাম, মৃত জীব-জানোয়ারের মাংস ভক্ষণ করতাম, নির্বিচারে ব্যভিচার ও অশ্লীলতায় লিপ্ত থাকতাম, আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম, পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করতাম, আমানতের খেয়ানত ও মানুষের হক পয়মাল করতাম এবং দুর্বলদের সহায়-সম্পদ গ্রাস করতাম, এমন এক অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজ জীবনে আমরা যখন

মানবেতর জীবন যাপন করে আসছিলাম তখন আল্লাহ রাববুল আলামীন অনুগ্রহ করে আমাদের মাঝে এক রাসূল প্রেরণ করলেন। তাঁর বংশ মর্যাদা, সততা, সহনশীলতা, সংযমশীলতা, ন্যায়-নিষ্ঠা, পরোপকারিতা ইত্যাদি গুণাবলী এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পূর্ব থেকেই আমরা অবহিত ছিলাম। তিনি আমাদেরকে আহবান জানিয়ে বললেন যে, 'সমগ্র বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা প্রতিপালক এক আল্লাহ ছাড়া আমরা আর কারো উপাসনা করব না। বংশ পরম্পরা সূত্রে এ যাবৎ আমরা যে সকল প্রস্তর মূর্তি বা প্রতিমা পূজা করে এসেছি সে সব বর্জন করব। অধিকন্তু মিথ্যা বর্জন করা, পাড়া-প্রতিবেশীগণের সাথে সদ্ব্যবহার করা, অশ্ল-ীল অবৈধ কাজকর্ম থেকে বিরত থাকা এবং রক্তপাত পরিহার করে চলার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। তাছাড়া মহিলাদের উপর নির্যাতন চালানো কিংবা মহিলাদের অহেতুক অপবাদ দেয়া থেকেও বিরত থাকার জন্য তিনি পরামর্শ দেন। আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা থেকে বিরত থাকার জন্যও তিনি পরামর্শ দেন। অধিকন্তু, নামায, রোযা এবং যাকাতের জন্যও তিনি আমাদের নির্দেশ প্রদান করেন।'

এইভাবে জা'ফার অত্যন্ত চিত্তোদ্দীপক এবং মর্মস্পর্শী ভাষায় ইসলামের মূলনীতি এবং বিধি-বিধানগুলো বর্ণনা করলেন। তারপর আবারও বললেন, 'এই পয়গম্বরকে বিশ্বজাহানের স্রষ্টা প্রতিপালক আল্লাহর (মহিমান্বিত প্রভূর) পয়গম্বর বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছি এবং তাঁর আনীত দ্বীনে এলাহীর অনুসরণে দৃঢ় প্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আল্লাহ এবং তদীয় রাসূলের পয়রবী করে চলছি। সুতরাং আমরা এক এবং অদ্বিতীয় প্রভূ আল্লাহর ইবাদত ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করি না এবং বিশ্ব জাহানে কোথাও তাঁর কোন শরীক আছে বলে আমরা বিশ্বাস করি না। পয়গম্বর যে সব কথা, কাজ ও খাদ্য আমাদের জন্য হারাম বলেছেন আমরা সেগুলোকে বিষবৎ পরিত্যাগ করেছি এবং যেগুলোকে হালাল বলেছেন আমরা সেগুলোকে বৈধ জেনে তার সদ্ব্যবহার করছি। এ কারণে আরব সমাজের বিভিন্নগোত্র ও সম্প্রদায় আমাদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছে। তাঁরা চান এ সত্য, সুন্দর, শাশ্বত ও সুনির্মল দ্বীপে থেকে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে অশ্লীলতা এবং অনাচারের গভীর পঙ্কে পুনরায় নিমজ্জিত করতে। কিন্তু আমরা তা অস্বীকার করায় তারা আমাদের উপর নারকীয় নির্যাতন চালিয়েছেন। এক আল্লাহর ইবাদত থেকে ফিরিয়ে নিয়ে প্রতিমা পূজায় লিপ্ত করানোর জন্য আমাদের উপর আঘাতের উপর আঘাত হেনেছে, নিদাঘের উত্তপ্ত কংকর ও বালুকারাশির উপর শুইয়ে বুকের উপর পাথর চাপা দিয়ে রেখেছে, জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর শুইয়ে দিয়ে বুকে পাথর চাপা দিয়েছে, পায়ে দড়ি বেঁধে পথে প্রান্তরে টেনে নিয়ে বেড়িয়েছে। এমনকি এইভাবে যখন তাঁরা আমাদের উপর অবিরামভাবে অন্যায় অত্যাচার চালাতে থাকলেন আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে আল্লাহর জমিনকে আমাদের জন্য সংকীর্ণ করে ফেললেন এবং এমন কি আমাদের ও আমাদের দ্বীনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে ও প্রাণনাশের হুমকি দিতে থাকলেন তখন আপনার মহানুভবতা, উদারতা ও ন্যায়-নিষ্ঠার কথা অবগত হয়ে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমাদের নির্দেশ প্রদান করলেন দেশত্যাগ করে আপনার দেশে

আশ্রয় গ্রহণ করতে। হে সম্রাট! আমরা আপনার সহৃদয়, উদারতা ও মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়েছি। আমরা চাই আপনার আশ্রয়ের সুশীতল ছায়াতলে অবস্থান করতে। অনুগ্রহ করে এ সব পাষন্ড যালেমদের (অত্যাচারীদের) হাতে আমাদের সমর্পণ করবেন না।'

সম্রাট নাজ্জাশী বললেন সেই পয়গম্বর যা এনেছেন তার কিছু অংশ তোমাদের কাছে আছে কি? হযরত জা'ফর বললেন, 'জী হ্যাঁ''।

নাজ্জাশী বললেন, 'তা হলে আমার সামনে পড়ে শোনাও।

জা'ফর (রাঃ) আল্লাহর সমীপে নিবেদিত এবং আত্মা-সমাহিত অবস্থায় ভাবগদগদ চিত্তে সুরায়ে মরিয়মের প্রথম কয়েকটি আয়াত পাঠ করে শোনালেন: (كهيعص)

নাজ্জাশী এতই মুগ্ধ হলেন যে, তাঁর চক্ষুদ্বয় হতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়ে দাঁড়ি ভিজে গেল। জাফরের তিলাওয়াত শ্রবণ করে নাজ্জাশীর ধর্মীয় মন্ত্রণাদাতাগণও এতই ক্রন্দন করেছিলেন যে, 'এ কালাম (বাণী) এবং সেই কালাম যা ঈসা (আঃ)-এর নিকট অবতীর্ণ হয়েছিল, উভয় কালামই এক উৎস হতে অবতীর্ণ হয়েছে।'

এরপর নাজ্জাশী 'আমর বিন আস এবং আব্দুল্লাহ বিন রাবী'আহকে সম্বোধন করে বললেন, 'তোমরা যে দূরভিসন্ধি নিয়ে আমার দরবারে আগমন করেছ তা সঙ্গে নিয়েই দেশে ফিরে যাও। তোমাদের হাতে এদের সমর্পণ করার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। অধিকন্তু, এ ব্যাপারে এখানে কোন কূট কৌশলেরও অবকাশ থাকবে না।'

সম্রাট নাজ্জাশীর নিকট থেকে এ নির্দেশ লাভের পর তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থমনোরথ হয়ে তাঁর দরবার কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসেন। আদম সন্তানদের গোমরাহ করার ব্যাপারে আযাযীল শয়তান যেমন একের পর এক কৌশল প্রয়োগ করতে থাকে এরাও তেমনি একটি কৌশল ব্যর্থ হওয়ায় অন্য কৌশল প্রয়োগের ফন্দি ফিকির সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। এক পর্যায়ে 'আমর বিন আস আব্দুল্লাহ বিন রাবী'আহকে বললেন, 'আল্লাহর কসম! আগামীকাল এদের সম্পর্কে এমন প্রসঙ্গ নিয়ে আসব যা এদের জীবিত থাকার মূল কর্তন করে ফেলবে। আর না হয়, এদের ব্যাপারে এমন মন্ত্রের অবতারণা করব যাতে এদের মূল কর্তিত হয়ে এবং সজীবতা ও সতেজতা বিনষ্ট হয়ে যায়। প্রত্যুত্তরে আব্দুল্লাহ বিন রাবী'আহ বললেন, 'না-না, এমনটি করা সমীচীন হবে না। কারণ, এরা যদিও আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন তবুও এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, তাঁরা আমাদের স্বজাতি এবং স্বগোত্রীয় লোক এবং আত্মীয়-স্বজনও বটে।

কিন্তু 'আমর বিন আস একথার তেমন গুরুত্ব না দিয়ে স্বীয় মতের উপর অটল রইলেন।

পরের দিন পুনরায় নাজ্জাশীর দরবারে উপস্থিত হয়ে, 'আমর বিন আস বললেন, 'হে সম্রাট! এরা ঈসা বিন মরিয়ম সম্পর্কে এমন একটি কথা বলেন যা কেউই কোন দিন বলেনি। আপনি ওদের কাছ থেকে এটা জেনে নিয়ে এর প্রতিকার করুন।'

একথা শোনার পর সম্রাট নাজ্জাশী পুনরায় মুসলিমদের ডেকে পাঠালেন। তাঁরা দরবারে এসে উপস্থিত হলে ঈসা (আঃ) সম্পর্কে মুসলিমগণ কী ধারণা পোষণ করেন তা তিনি জানতে চাইলেন। সম্রাটের মুখ থেকে এ কথা শুনে মুসলিমগণ দ্বিধা দ্বন্দ্ব এবং সংশয়ের মধ্যে নিপতিত হলেন। কারণ ঈসা (আঃ) সম্পর্কে খ্রীষ্টান এবং মুসলিমদের মধ্যে তত্ত্বগত মত পার্থক্য রয়েছে। খ্রীষ্টানগণ বলেন মসীহ (জেসাস) আল্লাহর পুত্র। কিন্তু পার্থক্য হেতু মুসলিমগণ বলেন ঈসা (আঃ) হচ্ছেন আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তত্ত্বগত এ পার্থক্য হেতু মুসলিমদের সংশয় এ কারণে যে, এ কথা বললে সম্রাট নাজ্জাশী যদি বা বিরূপ ভাব পোষণ করেন, তাহলে মুসলিমদের জন্য তা খুবই উদ্বেগের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু সেটা ছিল নেহাৎই একটা ক্ষণিকের ব্যাপার। আল্লাহর অনুগ্রহের উপর আস্থাশীল দৃঢ়চিত্ত মুসলিমগণ পরক্ষণেই মনস্থির করে ফেললেন যে, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে যে শিক্ষা তাঁরা পেয়েছেন সেটাই হবে তাঁদের মূলমন্ত্র এবং সেটাই হবে তাঁদের বক্তব্য তাতে ভাগ্যে যা ঘটবে ঘটুক।

নাজ্জাশীর প্রশ্নের উত্তরে জা'ফর বললেন আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর পক্ষ থেকে আমরা যে শিক্ষা লাভ করেছি তাতে আমরা জেনেছি যে ঈসা (আঃ) হচ্ছেন আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল। তাঁর মা মরিয়ম ছিলেন সতী-সাধ্বী এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে উচ্চ মর্যাদার মহিলা। আল্লাহর হুকুম এবং বিশেষ ব্যবস্থাধীনে কুমারী মরিয়মের গর্ভে ঈসা (আঃ)-এর জন্ম হয়।'

এ কথা শ্রবণের পর নাজ্জাশী এক টুকরো খড় উঁচু করে ধরে বললেন, 'আল্লাহর শপথ, যা তোমরা বলেছ, ঈসা (আঃ)-এর চাইতে এ খড় পরিমাণও বেশী কিছু ছিলেন না।' এ প্রেক্ষিতে পুরোহিতগণও 'হুঁ' 'হুঁ' বলে সমর্থন জ্ঞাপন করলেন।

নাজ্জাশী বললেন, 'হ্যাঁ', এখন তো তোমরা হাঁ হুঁ বলে সমর্থন জ্ঞাপন করবেই।'

তারপর নাজ্জাশী মুসলিমদের লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমরা নির্ভয়ে, শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে আমার রাজ্যে বসবাস কর। যে কেউ তোমাদের উপর অন্যায় করবে তার জন্য জরিমানা ও শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করা হবে। তোমাদের প্রতি অন্যায় অত্যাচারের বিনিময়ে আমার হাতে কেউ সোনার পাহাড় এনে দিলেও আমি তা সহ্য করব না।'

এর পর তিনি তাঁর পার্শ্বচরদের লক্ষ্য করে বললেন, 'এই কুরাইশ দূতদের আনীত উপঢৌকন তাদের ফিরিয়ে দাও। উপঢৌকনে আমার কোনই প্রয়োজন নেই। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তা'আলা যখন আমাকে সাম্রাজ্য ফিরিয়ে দেন তখন আমার নিকট থেকে উপঢৌকন কিংবা উৎকোচ গ্রহণ করেন নি। সে ক্ষেত্রে তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে কাজ করতে গিয়ে কিভাবে আমি উৎকোচ গ্রহণ করতে পারি। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা আমার ব্যাপারে অন্য লোকদের কথা গ্রহণ করেন নি, আমি কোন লোকের কোন কথা গ্রহণ করতে পারি না।'

এ ঘটনার বর্ণনাকারিণী উম্মু সালামাহ বলেছেন, এরপর প্রত্যাখ্যাত উপঢৌকন সহ কুরাইশ দূতগণ চরম বেইজ্জতির সঙ্গে নাজ্জাশীর দরবার থেকে বেরিয়ে এলেন এবং আমরা তাঁর ছত্রছায়ায় সম্মানের সঙ্গে তার রাজ্যে অবস্থান করতে থাকলাম।

ইবনে ইসহাক্কের বর্ণনায় এ ঘটনার উল্লে-খ রয়েছে। কোন কোন চরিতকারের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, নাজ্জাশীর দরবারে 'আমর বিন আসের উপস্থিতির ঘটনাটি সংঘটিত হয় বদর যুদ্ধের পর। সামঞ্জস্য বিধানের জন্য বলঅ হয়েছে 'আমর বিন আস দু'দফা নাজ্জাশীর দরবারে গিয়ে ছিলেন। কিন্তু বদর যুদ্ধের পর নাজ্জাশীর দরবারে 'আমর বিন আসের উপস্থিতি সূত্রে সম্রাট নাজ্জাশী এবং জাফরের মধ্যে যে কথোপকথনের উল্লে-খ করা হয়েছে তার সঙ্গে আবিসিনিয়ায় হিজরতের পর নাজ্জাশী এবং জাফরের মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছিল তার হুবহু মিল রয়েছে। অধিকন্তু ইবনে ইসহাক্কের বর্ণনায় আবিসিনিয়ায় হিজরতের পর নাজ্জাশীর দরবারে 'আমর বিন আসের উপস্থিতির কথা বলা হয়েছে এবং ঐ একই প্রশ্নোত্তরের কথা উল্লে-খিত হয়েছে। কাজেই, উপর্যুক্ত বিভিন্ন তথ্য প্রমাণের প্রেক্ষাপটে এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, মুসলিমদের ফেরত আনার জন্য 'আমর বিন আস মাত্র একবার নাজ্জাশীর দরবারে গিয়েছিলেন এবং ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল আবাসিনিয়ায় হিজরতের পর পরই।

অত্যাচারে কঠোরতা অবলম্বন ও নাবী কারীম (সাঃ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র

যা হোক মুশরিকগণের চাতুর্য শেষ পর্যন্ত পর্যবসিত হল অকৃতকার্যতায় এবং তাঁরা এটাও উপলব্ধি করলেন যে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের শত্রুতা কিংবা তাদের শায়েস্তা করার ব্যাপারে স্বদেশভূমির বাইরে সাফল্য লাভের কোনই সম্ভবানা নেই। কাজেই তাদের প্রচার-সংক্রান্ত কাজকর্ম বন্ধ করতে হলে কিংবা শায়েস্তা করতে হলে স্বদেশের সীমানার মধ্যেই তা করতে হবে। তাছাড়া ষ্ট্রাটেজী বা কর্মকৌশল হিসেবে তাঁরা এটাও স্থির করলেন যে, এদের বিরুদ্ধে সাফল্য লাভ করতে হলে হয় বল প্রয়োগ করে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর প্রচারাভিযান সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিতে হবে আর না হয় তাঁর অস্তিত্বকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে একদম নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হবে।

এমন পরিস্থিতিতে খুব অল্পসংখ্যক মুসলিম মক্কায় অবস্থান করছিলেন যারা ছিলেন অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও মযাদার পাত্র অথবা কারো আশ্রিত। এসত্ত্বেও তারা উদ্যত মুশরিকদের থেকে গোপনে ইবাদত বন্দেগী করতেন। তবুও তারা মুশরিকদের অত্যাচার নির্যাতন থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিলেন না। অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রকাশ্যভাবে মুশরিকদের সম্মুখে সালাত ও অন্যান্য ইবাদত করতেন এবং সংগোপনে আল্লাহর নিকট দু'আ করতেন এতে কোন শক্তিই তাঁকে বাধা দিতে পারতো না। অতঃপর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি (ﷺ) এমনভাবে প্রচার কাজ আরম্ভ করলেন যে তাঁকে আর কোন শক্তিই আটকিয়ে রাখতে সক্ষম হলো না। দাওয়াতে রেসালাতের কাজ যখন এরকম এক পরিস্থিতির সম্মুখীন তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর পিয়ারা হাবীবকে নির্দেশ দেন-

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

'কাজেই তোমাকে যে বিষয়ের হুকুম দেয়া হয়েছে তা জোরে শোরে প্রকাশ্যে প্রচার কর, আর মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। (আল-হিজর ১৫ : ৯৪)

উপর্যুক্ত আয়াত অবতীর্ণের পর মুশরিকদের কাজ কেবল এটুকুই ছিল যে, তারা মুহাম্মাদ (ﷺ) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। মুহাম্মাদ (ﷺ) এর মর্যাদা ও প্রভাবের কারণে এ ব্যতিত আর কিছুই করার ছিল না। অধিকন্তু মুহাম্মাদ (আঃ)-এর অভিভাবক ছিলেন আবূ ত্বালিব যিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং মুশরিকগণের মধ্যে বিরাজমান ছিলেন। তার কারণে মুহাম্মাদের উপর যে কোন কিছু করতে ভীত ছিল। তাছাড়া বনু হাশিমের পক্ষ থেকেও তাদের আশংকা ছিল। তাদের উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে কোন সিদ্ধান্তের উপর আস্থা রাখতে পারছিল না। যখনই মুশরিকরা কোন পদক্ষেপ গ্রহণের মনস্থ করতো তারা দেখতো যে, তাদের এ কর্মপন্থা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর দাওয়াতের কাছে খড়কুটোর মতোই তুচ্ছ ও অকার্যকর।

অত্যাচারে অত্যাচারে কিভাবে তারা মুসলিমদের জর্জরিত এবং অতিষ্ট করে তুলেছিল তার অসংখ্য প্রমাণ এ সম্পর্কিত হাদীসসমূহের পৃষ্ঠায় রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ এখানে দুয়েকটা ঘটনার কথা উল্লেখিত হল :

একদা আবূ লাহাবের পুত্র উতায়বা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল ; আমি (وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى) ও (ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى) এ আয়াত দুটোকে অস্বীকার করছি। এর পরই সে নাবী কারীম (ﷺ)-কে কষ্ট দেয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগে গেল। সে জামা ছিঁড়ে নষ্ট করে ফেলল এবং তাঁর পাক মুখে থুথু নিক্ষেপ করল। আল্লাহর রহমতে থুথু সে পর্যন্ত গিয়ে পৌছে নাই। সেই অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ)

আল্লাহর সমীপে দু'আ করলেন,

اللهم سلط عليه كلبا من كلابك

"হে আল্লাহ! তোমার কুকুরগুলোর মধ্য থেকে এর জন্য একটি কুকুর নিযুক্ত করে দাও।"

নাবী কারীম (ﷺ)-এর দু'আ আল্লাহর সমীপে গৃহীত হল এবং এভাবে তা প্রমাণিত হয়ে গেল।

কিছু সংখ্যক কুরাইশ লোকজনের সঙ্গে একদফা উতায়বা বিদেশ গেল। যখন তারা শাম রাজ্যের জারকা নামক স্থানে শিবিরস্থাপন করল তখন রাতের বেলায় একটি বাঘ এসে তাদের চারপাশে ঘোরাফিরা করতে থাকল। ওকে দেখেই ওতায়বা ভীতি বিহ্বল কণ্ঠে বলে উঠল, 'হায়! হায়!, আমার ধ্বংস। আল্লাহর শপথ, সে আমাকে খেয়ে ফেলবে। এ মর্মেই মুহাম্মাদ (ﷺ) আমার ধ্বংসের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করেছিলেন। দেখ আমি শাম রাজ্যে অবস্থান করছি অথচ তিনি মক্কা থেকেই আমাকে হত্যা করছেন'।

উতায়বার এ কথা শ্রবণের পর তার সঙ্গী সাথীরা সাবধানতা অবলম্বনের জন্য তাকে তাদের মধ্যস্থানে শুইয়ে দিল যাতে বাঘ এসে সহজে তার নাগাল না পায়। কিন্তু গভীর রাতে সেখানে বাঘ এসে সকলকে পাশ কাটিয়ে সোজা উতয়বার নিকটে যায় এবং তার মাথাটি শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যায়।

এক দফা উক্ববা বিন আবী মু'আইত্ব রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন সিজদারত ছিলেন তখন তার ঘাড় এত জোরে পদতলে পিষ্ঠ করল যে মনে হল তার অক্ষিগোলক দুটো তখনই অক্ষিপট থেকে বেরিয়ে আসবে।

ইবনে ইসহাক্বের এক দীর্ঘ বর্ণনায় চরমপন্থী কুরাইশগণের এরূপ দুরভিসন্ধির আভাষ পাওয়া যায় যে, তারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে হত্যা করে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।

অন্যান্য কুরাইশ দুর্বৃত্তদের সম্পর্কেও সত্যিকারভাবে বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে হত্যার মাধ্যমে ধরাপৃষ্ঠ থেকে ইসলামের নাম নিশানা মুছে ফেলার এক গভীর চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র তাদের অন্তরে ক্রমেই দানা বেঁধে উঠতে থাকে। যেমনটি আব্দুল্লাহ বিন 'আমর বিন 'আস হতে ইবনে ইসহাক্ব তাঁর বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, এক দফা কুরাইশ মুশরিকগণ কাবাহ'র হাতীমে সম্মিলিতভাবে অবস্থান করছিল। সেখানে আমিও উপস্থিত ছিলাম। মুশরিকগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সম্পর্কে নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ আলোচনা করছিল। আলোচনার এক পর্যায়ে তারা বলল, এ

ব্যক্তির ব্যাপারে আমরা যে ধৈর্য ধারণ করেছি তার কোন তুলনা নাই। প্রকৃতই এর ব্যাপারে আমরা বড়ই ধৈর্য ধারণ করেছি।

এ ধারায় যখন তাদের কথোপকথন চলছিল তখন কিছুটা যেন অপ্রত্যাশিতভাবেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে আগমনের পর সর্ব প্রথম তিনি হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করলেন এবং কা'বাহ ঘর প্রদক্ষিণ করলেন। এ সব করতে গিয়ে তাকে মুশরিকগণের নিকট দিয়ে যাতায়াত করতে হল। এ অবস্থায় কিছু বিদ্রুপাত্মক কথাবার্তা বলে তারা তার প্রতি কটাক্ষ করায় নাবী (ﷺ)-এর মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল তার বহিঃপ্রকাশ তার চেহারা মুবারকে আমি সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করলাম। এর পর দ্বিতীয় দফায় তিনি যখন সেখানে গেলেন তখনো মুশরিকগণ অনুরূপভাবে তাকে বিদ্রপাত্মক কথাবার্তা বলে ভর্ৎসনা করল। আমি এবারও তার মুখমণ্ডলে এর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলাম। তারপর তৃতীয় দফায় তিনি সেখানে গেলে এবারও তারা পূর্বের মতো বিদ্রুপাত্মক কথাবার্তা বলল। এবার নাবী কারীম (ﷺ) সেখানে থেমে গেলেন এবং বললেন,

أتسمعون يا معشر قريش اما والذى نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح

'হে কুরাইশগণ! শুনছ? সেই সত্ত্বার শপথ যার হাতে আমার জীবন, আমি তোমাদের নিকট কুরবাণীর পশু নিয়ে এসেছি।'

তাদের প্রতি নাবী (ﷺ)-এর এ সম্বোধন এবং কথাবার্তা তাদেরকে এতই প্রভাবিত করে ফেলল (তাদের উপর মূর্ছা পাওয়ার মতো অবস্থা এসে পড়ল) এবং এমন এক অনুভূতির সৃষ্টি হয়ে গেল যে তাদের মনে হতে লাগল যেন প্রত্যেকের মাথার উপর চড়ুই বসে রয়েছে। এমনকি ঐ দলের মধ্যে যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর সব চেয়ে প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিল সেও যেন খুব ভাল হয়ে গেল এবং পঞ্চমুখে তাঁর প্রশংসা শুরু করল। অত্যন্ত বিনীতভাবে সে বলতে থাকল, 'আবূল কাশেম! প্রত্যাবর্তন করুন। আল্লাহর কসম! আপনি কখনই জ্ঞানহীন ছিলেন না।'

দ্বিতীয় দিনেও তারা সেখানে একত্রিত হয়ে তার সম্পর্কে আলাপ আলোচনায় রত ছিল এমন সময় তিনি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁকে এভাবে দেখে তারা সকলে সম্মিলিতভাবে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্দেশ্যে তাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরল। আমি লক্ষ্য করলাম তাদের মধ্য থেকে একজন তার গলার চাদর ধরে নিল এবং বল প্রয়োগ শুরু করে দিল। আবূ বকর (রা.) তাকে বাচানোর জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি

ক্রন্দনরত অবস্থায় বলছিলেন,

اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله

অর্থ : 'তোমরা লোকটিকে কি এ জন্য হত্যা করছে যে, তিনি বলেছেন যে, আল্লাহ আমার প্রভু?' এর পর তারা নাবী (ﷺ)-কে ছেড়ে দিয়ে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করল। আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস বলেছেন যে, এটাই ছিল সব চেয়ে কঠিন অত্যাচার ও উৎপীড়ন যা আমি কুরাইশগণকে করতে দেখেছি।

সহীহুল বুখারীতে উরওয়া বিন জুবাইর (রা.) হতে বর্ণিত এক বিবরণ থেকে জানা যায়, তিনি বলেছেন যে, আমি আব্দুল্লাহ বিন ‘আমর বিন আসকে মুশরিকগণ নাবী (ﷺ)-এর উপর সব চেয়ে কঠিন যে নিপীড়ন চালিয়েছিল, তা আমার সামনে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার জন্য প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন যে, একদা নাবী (ﷺ) কাবাহ গৃহের হাতীমে সালাত পড়ছিলেন এমন সময় উক্বা বিন আবী মু’আইত্ব সেখানে আগমন করলেন। তিনি সেখানে উপস্থিত হয়েই নিজ কাপড় দ্বারা তাঁর গ্রীবা ধারণ করে অত্যন্ত জোরে চপেটাঘাত করলেন এবং গলা টিপে ধরলেন। এমন সময় আবূ বকর সেখানে উপস্থিত হলেন এবং উক্বার দু’কাঁধ ধরে জোরে ধাক্কা দিয়ে তাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে বললেন,

اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله

অর্থ : তোমরা লোকটিকে এ জন্যই হত্যা করছ যে, তিনি বলেছেন যে, আমার প্রভু আল্লাহ।[4] আসমার বর্ণনায় অধিক বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আবূ বকরের নিকট যখন এ আওয়াজ পৌছল যে, ‘আপন বন্ধুকে বাঁচাও’ তিনি তখন অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আমাদের মধ্য থেকে বের হলেন। তার মাথার উপর চারটি ঝুঁটি ছিল। যাবার সময় আবূ বকর বলতে বলতে গেলেন,

اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله

অর্থ : তোমরা লোকটিকে শুধু এ কারণে হত্যা করছ যে, তিনি বলেন যে, আমার প্রভু আল্লাহ। এরপর মুশরিকগণ নাবী কারীম (ﷺ)-কে ছেড়ে দিয়ে আবূ বকরের উপর ঝাপিয়ে পড়েন। তিনি যখন ফেরৎ আসলেন তখন তার অবস্থা ছিল এরূপ যে, আমরা তাঁর চুলের মধ্য থেকে যে ঝুঁটিটাই ধরছিলাম সেটাই আমাদের টানের সঙ্গে সঙ্গে উঠে আসছিল

হামজা রাদি.-এর ইসলাম গ্রহণ

জাহিলি যুগে মক্কার বিস্তৃত অঞ্চল অন্যায় ও অত্যাচারের ঘনকৃষ্ণ মেঘমালায় আচ্ছাদিত ছিল। সেই মেঘমালার মধ্য থেকে হঠাৎ একঝলক বিদ্যুৎ চমকিত হওয়ায় নির্যাতিত- নিপীড়িত মানুষের পথ আলোকিত হলো এবং সে আলোয় আলোকিত হয়ে একপর্যায়ে হামজা রাদি. মুসলিম হয়ে গেলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সংঘটিত হয় রাসুলুল্লাহ সা.-এর নবুওয়াতপ্রাপ্তির ষষ্ঠ বর্ষের শেষভাগে। সম্ভবত তিনি জিলহজ মাসে মুসলিম হয়েছিলেন।

আল্লাহ তাআলা যার ওপর রহম করেন, তাঁর পক্ষেই ইসলামের অমিয় সুধা থেকে এক আঁজলা পান করা সম্ভব হয়। যদিও হামজার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটিও আল্লাহ তাআলার বিশেষ রহমতেরই ফলশ্রুতি, তবু তাঁর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে একটি বিশেষ ঘটনার কথা উল্লেখ না করে পারা যায় না। ঘটনাটি নিম্নরূপ-

একদিন আবু জাহাল সাফা পর্বতের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। রাসুলুল্লাহ সা. সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সে রাসুলুল্লাহ সা.-কে দেখে অনেক কটুকাব্য করল এবং অপমানসূচক কথা বলল। রাসুলুল্লাহ সা. আবু জাহালের কথার কোনো উত্তর না করে সম্পূর্ণ নীরব থেকে গেলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আবু জাহাল একটি পাথর তুলে নিয়ে রাসুলুল্লাহ সা.- এর মাথায় আঘাত করল। ফলে আঘাতপ্রাপ্ত স্থান থেকে রক্তধারা প্রবাহিত হলো।

এরপর আবু জাহাল কাবাঘরের নিকট কুরাইশদের বৈঠকে মিলিত হলো। আবদুল্লাহ ইবনু জুদআনের এক দাসী নিজগৃহ থেকে সাফা পর্বতের ওপর সংঘটিত ঘটনাটি আদ্যোপান্ত প্রত্যক্ষ করছিল। হামজা শিকার থেকে তির-ধনুক হাতে ফিরে আসতেই উক্ত দাসী তাঁকে আবু জাহালের অন্যায়-অত্যাচার এবং রাসুলুল্লাহ সা.-এর ধৈর্যধারণের ব্যাপারটি বর্ণনা করে শোনাল।

ঘটনা শোনামাত্রই হামজা রাদি. ক্রোধে ফেটে পড়লেন। কুরাইশের মধ্যে তিনি ছিলেন মহাবীর এবং শক্তিশালী এক যুবক। একমুহূর্ত বিলম্ব না করে তিনি এ প্রতিজ্ঞা নিয়ে ছুটে গেলেন, যেখানেই আবু জাহালের দেখা পাবেন সেখানেই তাকে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়বেন।

হামজা রাদি. আবু জাহালের খোঁজ করতে গিয়ে তাকে পেলেন মাসজিদুল হারামে। সেখানে তিনি তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললেন, ও হে গুহ্যদ্বার দিয়ে বায়ু নিঃসারণকারী, আমার ভাতিজা মুহাম্মদ সা.-কে তুমি গালি দিয়েছ এবং পাথর দিয়ে আঘাত করেছ? অথচ আমি তাঁর দ্বীনেই আছি!

এরপর তিনি নিজের হাতে থাকা ধনুক দ্বারা তার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করলেন, যাতে সে আহত হয়ে গেল। এর ফলে আবু জাহালের বনু মাখজুম ও হামজা রাদি.-এর বনু হাশিম গোত্রদ্বয় একে অন্যের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।

কিন্তু আবু জাহাল এ বলে সকলকে নিরস্ত করল, আবু উমারাকে যেতে দাও। আমি সত্যিই তাঁর ভাতিজাকে গালমন্দ করেছি এবং আঘাত দিয়েছি।

প্রাথমিক পর্যায়ে হামজা রাদি.-এর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটি ছিল কতকটা ভাতিজার প্রতি আবেগের উৎস থেকে উৎসারিত। মুশরিকরা ভাতিজাকে কষ্ট দিত, এটা বরদাস্ত করা তাঁর পক্ষে খুবই কঠিন ছিল। সুতরাং তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে হয়তো তাঁর দুঃখ-কষ্ট কিছুটা লাঘব হতে পারে-এ ধারণার বশবর্তী হয়েই তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন।

পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলা তাঁর অন্তরে ইসলামপ্রীতি জোরদার করে দিলে তিনি দ্বীনের রশি মজবুত করে ধরলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলিমদের শক্তি এবং সম্মান দুই-ই বৃদ্ধি পেল।

উমার (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ

অন্যায় অত্যাচারের বিস্তৃতি পরিমন্ডলে ঘনকৃষ্ণ মেঘমালার বুক চিরে আরও একটি জ্যোতিষ্মান বিদ্যুতের চমকে আরব গগণ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আরব জাহানের অন্যতম তেজস্বী পুরুষ উমার বিন খাত্তাব ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সংঘটিত হয় নবুওয়ত ৬ষ্ঠ বর্ষে[1] হামযাহ (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের মাত্র ৩ দিন পর। নাবী কারীম (ﷺ) উমার (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের জন্য আল্লাহর সমীপে প্রার্থনা করেছিলেন।

ইমাম তিরমিযী আব্দুল্লাহ বিন উমার হতে এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন এবং একে বিশুদ্ধ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। অনুরূপভাবে তাবারাণী ইবনে মাসউদ (রাঃ) এবং আনাসের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (ﷺ) বলতেন :

اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَوْ بِأَبِيْ جَهْلٍ بن هشام

‘হে আল্লাহ! উমার বিন খাত্তাব অথবা আবূ জাহল বিন হিশাম এর মধ্য হতে যে তোমার নিকট অধিক প্রিয় তার দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করে দাও।’

(আল্লাহ এ প্রার্থনা গ্রহণ করলেন এবং উমার মুসলিম হয়ে গেলেন)। এ দু’জনের মধ্যে আল্লাহর নিকট উমার (রাঃ) অধিক প্রিয় ছিলেন।[2]

উমার (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত সমস্ত বর্ণনা একত্রিত করে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তাঁর অন্তরে ইসলাম ধীরে ধীরে স্থান লাভ করতে থাকে। ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত বিষয়াদির সার সংক্ষেপ তুলে ধরার পূর্বে তাঁর মেজাজ এবং আবেগ ও অনুভূতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা সঙ্গত বলে মনে করি।

উমার (রাঃ) তাঁর উগ্র মেজায, রূঢ় প্রকৃতি এবং বীরত্বের জন্য আরব সমাজে বিশেষভাবে বিখ্যাত ছিলেন। মুসলিমগণকে বেশ কিছুকাল যাবৎ তাঁর হাতে উৎপীড়িত ও নিগৃহীত হতে হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্যের আভাষ যেন প্রথম থেকেই তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হতো। তাঁর হাবভাব দেখে মনে হতো যে, ভাবাবেগের দু’বিপরীতমুখী শক্তি যেন তাঁর অন্তর রাজ্যে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে। একদিকে তিনি তাঁর পূর্ব পুরুষগণের অনুসৃত রীতিনীতি ও আচার অনুষ্ঠানের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং মদ্যপান ও আমোদ প্রমোদের প্রতি তাঁর যথেষ্ট আসক্তি ছিল। অন্যদিকে মুসলিমদের ঈমান ও আকীদা এবং বিপদ আপদে তাঁদের ধৈর্য ধারণের অসাধারণ ক্ষমতা দেখে তিনি হতবাক হয়ে যেতেন এবং সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাঁদের দিকে চেয়ে থাকতেন। অধিকন্তু কোন কোন সময় জ্ঞানী ব্যক্তিগণের মতো তাঁর মনে তত্ত্ব-চিন্তার উদ্রেকও হতো। তিনি আপন খেয়ালে চিন্তা করতে থাকতেন নানা বিষয়, নানা কথা। কোন কোন সময় এটাও তাঁর মনে হতো যে, ইসলাম যে পথের সন্ধান দিচ্ছে, যে পথের চলার জন্য উদাত্ত আহবান জানাচ্ছে সম্ভবতঃ সেটাই উত্তম ও পবিত্রতম পথ। এ জন্য প্রায়শঃই

তিনি দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভুগতেন, কোন কোন সময় বিচলিত বোধ করতেন, কখনো বা নিরুৎসাহিত বোধ করতেন।[3]

উমার (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত বিবরণাদির সমন্বিত সার সংক্ষেপ হচ্ছে এক রাত্রি তাঁকে বাড়ির বাইরে অবস্থানের মধ্য দিয়ে রাত্রি যাপন করতে হয়। তিনি হারামে আগমন করেন এবং ক্বাবা'হ গৃহেরপর্দার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। নাবী কারীম (ﷺ) সেই সময় নামাযে লিপ্ত ছিলেন। নামাযে তিনি সূরাহ 'আলহাক্কা'' তিলাওয়াত করছিলেন। উমার (রাঃ) নীরবে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তিলাওয়াত শ্রবণ করলেন এবং এর ঝংকার, বাক্য বিন্যাস ও সুর-মাধূর্যে মুগ্ধ, চমৎকৃত ও হতবাক হয়ে গেলেন।

উমারের বর্ণনা সূত্রে এটা বলা হয়েছে যে, তিনি বলেছেনঃ আমি মনে মনে করলাম, আল্লাহর কসম, কুরাইশরা যেমনটি বলে থাকেন তিনি হচ্ছেন একজন কবি। কিন্তু এ সময় নাবী (ﷺ) এ আয়াত পাঠ করেনঃ

(إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيْلاً مَا تُؤْمِنُوْنَ) [الحاقة:40، 41]

"যে, অবশ্যই এ কুরআন এক মহা সম্মানিত রসূল [জিবরীল ('আ.)]-এর (বহন করে আনা) বাণী। ৪১. তা কোন কবির কথা নয়, (কবির কথা তো) তোমরা বিশ্বাস করো না।' (আল-হাক্কাহ ৬৯ : ৪০-৪১)

উমার (রাঃ) বললেন, 'আমি মনে মনে বললাম, আর এ তো হচ্ছে আমারই মনের কথা, সে কী করে তা জানল। নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (ﷺ) হচ্ছেন একজন মন্ত্রতন্ত্রধারী গনৎকার। আমার মনে এ ভাবের উদয় হওয়ার পর-পরই মুহাম্মাদ (ﷺ) তিলাওয়াত করলেনঃ

(وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيْلًا مَا تَذَكَّرُوْنَ تَنزِيْلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ) إلى آخر السورة [الحاقة:42، 43]

" এটা কোন গণকের কথাও নয়, (গণকের কথায় তো) তোমরা নাসীহাত লাভ করো না। ৪৩. এটা বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ।' (আল-হাক্কাহ ৬৯ : ৪২-৪৩)

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সালাতে সূরাহর শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন এবং উমার (রাঃ) তা শ্রবণ করলেন। এ প্রসঙ্গে উমার (রাঃ) বলেছেন যে, 'সেই সময় ইসলাম আমার অন্তর রাজ্যে স্থান অধিকার করে বসল।[4]

প্রকৃতপক্ষে, উমার (রাঃ)-এর অন্তর রাজ্যে এটাই ছিল ইসলামের বীজ বপনের প্রথম সময়। কিন্তু তখনো তাঁর চেতানায় অজ্ঞতাপ্রসূত আবেগ, আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রতি প্রবল আকর্ষণ এবং পূর্ব-পুরুষগণের ধর্মীয় অনুভূতি ও বিশ্বাসের ঐতিহ্যগত প্রভাব জগদ্দল প্রস্তরের মতো তাঁর মন-মস্তিষ্ককে এতই প্রভাবিত করে রেখেছিল যে ইসলামের প্রাথমিক অনুভূতির কার্যকারিতা তেমন একটা ছিল না বললেই চলে। কাজেই, বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আসা সংস্কারকে জিইয়ে রাখার ব্যাপারেই তাঁর আগ্রহ ছিল ঐকান্তিক।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির লোক। তাঁর স্বভাবগত কঠোরতার কারণেই তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং মুসলিমদের অন্যতম বিপজ্জনক শত্রু। তিনি এতই বিপজ্জনক ছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে এক দিবসে তিনি উলঙ্গ তরবারি হাতে বহির্গত হন। রুদ্র মেজাজে তাঁর পথচলার এক পর্যায়ে আকস্মিকভাবে নঈম বিন আব্দুল্লাহ নাহহাম আদভী[5] কিংবা বনু যুহরা[6] কিংবা বনু মাখযুমের[7] কোন এক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তাঁর ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত অবস্থায় দেখে সেই ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, 'হে উমার! কী উদ্দেশ্যে কোথায় চলেছ? তিনি বললেন, 'মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে চলেছি।'

লোকটি বলল, 'মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে হত্যা করে বনু হাশিম ও বনু যুহরা থেকে কিভাবে রক্ষা পাবে? উমার বললেন, 'মনে হচ্ছে তোমরাও পূর্ব পুরুষগণের ধর্ম পরিত্যাগ করে বেদ্বীন হয়ে গিয়েছ। লোকটি বলল, 'উমার! একটি আজব কথা তোমাকে শোনাব না কি? তোমার বোন ও ভগ্নিপতিও তোমাদের ধর্ম পরিত্যাগ করে বেদ্বীন হয়ে গিয়েছে।'

এ কথা শুনে উমার প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুন্ডে ঘৃতাহুতি দেয়ার মতো ক্রোধাগ্নিতে দপ করে জ্বলে উঠলেন এবং সোজা ভগ্নীপতির গৃহাভিমুখে যাত্রা করলেন। সেখানে খাব্বাব বিন আরাত্ত একটি সহীফার সাহায্যে সূরাহ ত্ব-হা'র অংশ বিশেষ স্বামী-স্ত্রীকে তালীম দিচ্ছিলেন। খাব্বাব তাঁদের তালীম দেয়ার জন্য নিয়মিত সেখানে যাতায়াত করতেন। খাব্বাব (রাঃ) যখন উমার (রাঃ)-এর সেখানে গমনের শব্দ শ্রবণ করলেন তখন তিনি ঘরের মধ্যে গিয়ে আত্মগোপন করলেন এবং উমারের বোন ফাত্বিমাহ সহীফা খানা লুকিয়ে রাখলেন। কিন্তু উমার বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে খাববাবের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলেন। তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কার কণ্ঠে মৃদু মৃদু আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম যেন।'

তাঁর বোন উত্তর করলেন, 'না তেমন কিছুই না। আমরাই পরস্পর কথাবার্তা বলছিলাম।

উমার (রাঃ) বললেন, 'সম্ভবতঃ তোমরা উভয়েই বেদ্বীন হয়ে গিয়েছ?

ভগ্নিপতি সাঈদ বললেন, আচ্ছা উমার! বলত, তোমাদের ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে যদি সত্য থাকে তবে করণীয় কী হবে?

এ কথা শোনা মাত্র উমার তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে ভগ্নীপতিকে নির্মমভাবে প্রহার করতে শুরু করলেন। নিরুপায় ভগ্নী জোর করে ভ্রাতাকে স্বামী থেকে পৃথক করে দিলেন। এতে আরও ক্রুদ্ধ হয়ে উমার (রাঃ) তাঁর বোনের গন্ডদেশে এমন এক চপেটাঘাত করলেন যে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখমণ্ডল রক্তাক্ত হয়ে গেল। ইবনে ইসহাক্বের বর্ণনায় আছে যে, তিনি মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ভগ্নী ক্রোধ ও আবেগ জড়িত কণ্ঠে বললেন,

يَا عُمَرُ، إِنْ كَانَ الْحَقُّ فِيْ غَيْرِ دِيْنِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ

“উমার! তোমার ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্ম যদি সত্য হয়, এ কথা বলে তিনি কালেমা শাহাদত পাঠ করলেন, ‘আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর বান্দা ও রাসূল।’

শাহাদতের এ বাণী শ্রবণ করা মাত্র উমার (রাঃ)-এর ভাবান্তর শুরু হয়ে গেল। তিনি তাঁর বোনের রক্তাক্ত মুখমণ্ডল দেখে লজ্জিত হলেন। তারপর তিনি বোনকে সম্বোধন করে দয়ার্দ্র কণ্ঠে বললেন, ‘তোমাদের নিকট যে বইখানা আছে তা আমাকে একবার পড়তে দাওনা দেখি।

বোন বললেন, ‘তুমি অপবিত্র রয়েছ। অপবিত্র লোকের এটা স্পর্শ করা চলে না। শুধু মাত্র পবিত্র লোকেরাই এ বই স্পর্শ করতে পারবে। তুমি গোসল করে এসো তবেই বই স্পর্শ করতে পারবে। উমার গোসল করে পাক-সাফ হলেন তার পর সহীফা খানা হাতে নিলেন এবং বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম পড়লেন। বলতে লাগলেন এ তো বড়ই পবিত্র নাম! তারপর সূরাহ ত্ব-হা হতে পাঠ করলেন :

طه (1) مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقٰى (2) إِلاَّ تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشٰى (3) تَنْزِيْلاً مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلٰى (4) الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى (5) لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى (6) وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفٰى (7) اللّٰهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى (8) وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى (9) إِذْ رَأٰى نَاراً فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوْا إِنِّي آنَسْتُ نَاراً لَعَلِّي آتِيْكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدىً (10) فَلَمَّا أَتَاهَا نُوْدِيَ يَا مُوْسٰى (11) إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً (12) وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى (13) إِنَّنِيْ أَنَا اللهُ لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِيْ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِيْ (14) (سورة طه 1-14)

“১. ত্ব-হা-। ২. তোমাকে ক্লেশ দেয়ার জন্য আমি তোমার প্রতি কুরআন নাযিল করিনি। ৩. বরং তা (নাযিল করেছি) কেবল সতর্কবাণী হিসেবে যে ভয় করে (আল্লাহকে)। ৪. যিনি পৃথিবী ও সুউচ্চ আকাশ সৃষ্টি করেছেন তাঁর নিকট হতে তা নাযিল হয়েছে। ৫. ‘আরশে দয়াময় সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন। ৬. যা আকাশে আছে, যা যমীনে আছে, যা এ দু’য়ের মাঝে আছে আর যা ভূগর্ভে আছে সব তাঁরই। ৭. যদি তুমি উচ্চকণ্ঠে কথা বল (তাহলে জেনে রেখ) তিনি গুপ্ত ও তদপেক্ষাও গুপ্ত বিষয় জানেন। ৮. আল্লাহ, তিনি ব্যতীত সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, সুন্দর নামসমূহ তাঁরই। ৯. মূসার কাহিনী তোমার কাছে পৌঁছেছে কি? ১০. যখন সে আগুন দেখল (মাদ্‌ইয়ান থেকে মিসর যাওয়ার পথে), তখন সে তার পরিবারবর্গকে বলল, ‘তোমরা এখানে অবস্থান কর, আমি আগুন দেখেছি, সম্ভবতঃ আমি তাথেকে তোমাদের জন্য কিছু জ্বলন্ত আগুন আনতে পারব কিংবা আগুনের নিকট পথের সন্ধান পাব। ১১. তারপর যখন যে আগুনের কাছে আসল, তাকে ডাক দেয়া হল, ‘হে মূসা! ১২. বাস্তবিকই আমি তোমার প্রতিপালক, কাজেই তোমার জুতা খুলে ফেল, তুমি পবিত্র তুওয়া উপত্যকায় আছ। ১৩. আমি তোমাকে বেছে নিয়েছি, কাজেই তুমি মনোযোগ দিয়ে শুন যা তোমার প্রতি ওয়াহী করা হচ্ছে। ১৪. প্রকৃতই আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া সত্যিকারের

কোন ইলাহ নেই, কাজেই আমার ‘ইবাদাত কর, আর আমাকে স্মরণ করার উদ্দেশে সলাত কায়িম কর’।’ (ত্ব-হা ২০ : ১-১৪)

বললেন, ‘এটা তো বড়ই উত্তম এবং বড়ই সম্মানিত কথা। আমাকে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সন্ধান বল।’

উমারের এ কথা শুনে খাব্বাব (রাঃ) তাঁর গোপনীয় অবস্থান থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, ‘উমার! সন্তুষ্ট হয়ে যাও। আমার আশা যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিগত বৃহস্পতিবার রাত্রে তোমার সম্পর্কে যে প্রার্থনা করেছিলেন (হে আল্লাহ! উমার বিন খাত্তাব অথবা আবূ জাহল বিন হিশাম এর দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করে দিন) তা কবুল হয়েছে। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাফা পর্বতের নিকটস্থ গৃহে অবস্থান করছিলেন।’

খাব্বাব (রাঃ)-এর মুখ থেকে এ কথা শ্রবণের পর উমার (রাঃ) তাঁর তরবারিখানা কোষে প্রবেশ করিয়ে নিয়ে সেই বাড়ির বহিরাঙ্গনে উপস্থিত হয়ে দরজায় করাঘাত করলেন। দরজার ফাঁক দিয়ে এক ব্যক্তি উঁকি দিয়ে দেখতে পেলেন যে, কোষবদ্ধ তলোয়ারসহ উমার দন্ডায়মান রয়েছেন। ঝটপট রাসূলুল্লাহ (রাঃ)-কে তা অবগত করানো হল। উপস্থিত লোকজন যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন সকলেই সঙ্গে সঙ্গে কাছাকাছি অবস্থায় সংঘবদ্ধ হয়ে গেলেন। সকলের মধ্যে এ সন্ত্রস্ত ভাব লক্ষ করে হামযাহ (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী ব্যাপার, কী এমন হয়েছে?’

লোকজনেরা উত্তর দিলেন, ‘উমার বহিরাঙ্গনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।’

হামযাহ বললেন, ‘ঠিক আছে। উমার এসেছে, দরজা খুলে দাও। যদি সে সদিচ্ছা নিয়ে আগমন করে থাকে তাহলে আমাদের তরফ থেকেও ইন-শা-আল্লাহ সদিচ্ছার কোনই অভাব হবে না। আর যদি সে কোন খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে আগমন করে থাকে তাহলে আমরা তাকে তার তলোয়ার দ্বারাই খতম করব। এ দিকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করছিলেন এবং তাঁর উপর ওহী নাযিল হচ্ছিল। ওহী নাযিল সমাপ্ত হলে তিনি উমারের নিকট আগমন করলেন বৈঠক ঘরে। তিনি তাঁর কাপড় এবং তরবারির কোষ ধরে শক্তভাবে টান দিয়ে বললেন,

(أَمَا أَنْتَ مُنْتَهِيًا يَا عُمَرُ حَتَّى يَنْزِلَ اللهُ بِكَ مِنْ الْخَزِى وَالنِّكَالِ مَا نَزَلَ بِالْوَلِيْدِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ؟)

“উমার! যেমনটি ওয়ালীদ বিন মুগীরার উপর অবতীর্ণ হয়েছিল সেইরূপ আল্লাহর তরফ থেকে যতক্ষণ না তোমার উপর লাঞ্ছনা, অবমাননা এবং শিক্ষামূলক শাস্তি অবতীর্ণ না হচ্ছে ততক্ষণ কি তুমি পাপাচার থেকে বিরত হবে না?’

তারপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আল্লাহর সমীপে দু‘আ করলেন,

اللهم هٰذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، اللهم أَعِزِّ الْإِسْلاَمَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

“হে সর্বশক্তিমান প্রভূ! তোমার ইচ্ছা কিংবা অনিচ্ছাই হচ্ছে চূড়ান্ত। এ উমার বিন খাত্তাবের দ্বারা ইসলামের শক্তি এবং সম্মান বৃদ্ধি করুন।’ নাবী (ﷺ)-এর প্রার্থনা শ্রবণের পর উমার (রাঃ)-এর অন্তরে এমন এক স্পন্দনের সৃষ্টি হতে থাকল যে, তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন এবং পাঠ করলেন,

أَشْهَدُ أَن لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ

অর্থঃ ‘আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই এবং সত্যই আপনি আল্লাহর রাসূল।’

উমার (রাঃ)-এর মুখ থেকে তাওহীদের এ বাণী শ্রবণ মাত্র গৃহাভ্যন্তরস্থিত লোকজনেরা এত জোরে ‘আল্লাহ আকবর’ ধ্বনি উচ্চারণ করলেন যে, মসজিদুলু হারামে অবস্থানকারী লোকেরাও তা স্পষ্টভাবে শুনতে পেলেন।আরব মুলুকে এটা সর্বজন বিদিত বিষয় ছিল যে, উমার বিন খাত্তাব ছিলেন অত্যন্ত প্রতাপশালী এবং প্রভাবশালী। তিনি এতই প্রতাপশালী ছিলেন যে, তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো সাহস সেই সমাজে কারোই ছিল না। এ কারণে তাঁর মুসলিম হয়ে যাওয়ার কথা প্রচার হওয়া মাত্র মুশরিক মহলে ক্রন্দন এবং বিলাপ সৃষ্টি হয়ে গেল এবং তারা বড়ই লাঞ্ছিত ও অপমানিত বোধ করতে থাকল। পক্ষান্তরে তাঁর ইসলাম গ্রহণ করার ফলে মুসলিমদের শক্তি সাহস ও মান মর্যাদা উল্লে-খযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়ে গেল এবং তাঁদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার প্রবাহিত হতে থাকল। ইবনে ইসহাক্ব নিজ সূত্রের বরাতে উমারের বর্ণনায় উদ্ধৃত করেছেন যে, ‘যখন আমি মুসলিম হয়ে গেলাম তখন চিন্তা-ভাবনা করতে থাকলাম যে, মক্কায়, কোন কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সব চাইতে প্রভাবশালী শত্রু হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। তারপর মনে মনে বললাম এ আবূ জাহলই হচ্ছে তাঁর সব চাইতে বড় শত্রু। ততক্ষণাৎ তার গৃহে গমন করে দরজায় করাঘাত করলাম। সে বাহির হয়ে এসে (খুশি আমদেদ, খুশ আমদেদ) বলে আমাকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে স্বাগত জানাল এবং বলল, ‘কিভাবে এ অভাগার কথাটা আজ মনে পড়ে গেল?’ প্রত্যুত্তরে কোন ভূমিকা না করেই আমি সরাসরি বললাম, ‘তোমাকে আমি এ কথা বলতে এলাম যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর দ্বীনে আমি বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং যা কিছু আল্লাহর তরফ থেকে তাঁর উপর অবতীর্ণ হয়েছে তার উপরও বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমার কথা শ্রবণ করা মাত্র সে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলল, ‘আল্লাহ তোমার মন্দ করুন এবং যা কিছু আমার নিকট নিয়ে এসেছ সে সবেরও মন্দ করুন।

ইমাম ইবনে জাওযী উমার (রাঃ)-এর বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, যখনই কোন ব্যক্তি মুসলিম হয়ে যেত তখনই লোক তার পিছু ধাওয়া করত এবং তাকে মারধর করত। সেও তাদের পাল্টা মারধর করত। এ জন্য যখন আমি মুসলিম হয়ে গেলাম তখন আমার মামা আসী বিন হাশিমের নিকটে গেলাম এবং তাঁকে আমার মুসলিম হয়ে যাওয়ার খবর জানালাম। আমার কথা শোনামাত্রই সে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করল। তারপর কুরাইশের একজন বড় প্রধানের বাড়িতে গেলাম (সম্ভবতঃ আবূ জাহলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে) এবং তাকেও বিষয়টি সম্পর্কে অবগত করলাম কিন্তু সেও গিয়ে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করল।

ইবনে ইসহাক্ব বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে উমার বলেন, যখন ‘উমার (রাঃ) মুসলমান হলেন তখন তিনি বললেন কে এমন আছে যে কোন কথাকে খুব প্রচার কিংবা ঢোল শোহরত করতে পারে? লোকেরা বলল, জামীল বিন মা’মার জুমাহী। একথা শোনার পর তিনিস জামীল বিন মা’মার

জুমাহীর নিকট গেলেন, আমি তার সাথেই ছিলাম। ‘উমার তাকে বললেন যে, তিনি মুসলিম হয়ে গিয়েছেন। আল্লাহর শপথ এ কথা শোনামাত্র অত্যন্ত উচ্চ কণ্ঠে সে ঘোষণা করতে থাকল যে, খাত্তাবের পুত্র উমার বেদ্বীন হয়ে গিয়েছে। উমার তাঁর পিছনেই ছিলেন, তৎক্ষণাৎ তিনি এ বলে উত্তর দিলেন যে, ‘এ মিথ্যা বলছে। আমি বেদ্বীন হই নি বরং মুসলিম হয়েছি।’

যাহোক, লোকজনেরা তাঁর উপর চড়াও হল এবং মারপিট শুরু হয়ে গেল। এক পক্ষে জনতা এবং অন্য পক্ষে উমার; মারপিট চলতে থাকল। এত সময় ধরে মারপিট চলতে থাকল যে, সেই অবস্থায় সূর্য প্রায় মাথার উপর এসে পড়ল। উমার ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লেন। লোকজন তাঁকে ঘিরেই দাঁড়িয়ে ছিল। উমার বললেন, ‘যা খুশী করো। আল্লাহর শপথ! আমরা যদি সংখ্যায় তিন শত হতাম তাহলে মক্কায় তোমরা অবস্থান করতে, না আমরা করতাম তা দেখাদেখি হয়ে যেত। এ ঘটনার পর মুশরিকগণ আরও ক্রোধান্বিত এবং সংঘবদ্ধ হয়ে উঠল এবং উমার (রাঃ)-এর বাড়ি আক্রমণ করে তাঁকে হত্যা করার এক গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। যেমনটি সহীহুল বুখারীর মধ্যে ইবনে উমার হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, উমার ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ঘরের মধ্যেই অবস্থান করছিলেন এমন সময় আবূ ‘আমর আস বিন ওয়ায়েল সাহমী সেখানে আগমন করল। সে ইয়ামান দেশের তৈরী নকশাদার জোড়া চাদর এবং রেশম দ্বারা সুসজ্জিত চমকদার জামা পরিহিত অবস্থায় ছিল। তার সম্পর্ক ছিল সাহম গোত্রের সাথে এবং জাহেলিয়াত যুগে এ গোত্র বিপদ-আপদে আমাদের সাহায্য করবে বরে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল।

সে জিজ্ঞেস করল, ‘কী ব্যাপার’?

উমার (রাঃ) বললেন, ‘আমি মুসলিম হয়ে গিয়েছি এবং এ জন্যই আপনার জাতি আমাকে হত্যা করতে ইচ্ছুক।

আস বলল, ‘তা সম্ভব নয়।’

আসের এ কথা শুনে আমি মনে কিছুটা শান্তি পেলাম, কিছুটা তৃপ্তি অনুভব করলাম।

তারপর আস সেখান থেকে ফিরে গিয়ে লোকজনদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করার উদ্যোগ গ্রহণ করল। তখন জনতার ভিড়ে সমগ্র উপত্যকা গিজ গিজ করছিল।

আমজনতার অগ্রভাগে অবস্থিত লোকজনকে জিজ্ঞেস করল, ‘তোমরা কোথায় চলেছ?’

উত্তরে তারা বলল, ‘আমরা চলেছি খাত্তাবের ছেলের একটা কিছু হেস্তনেস্ত করতে। কারণ, সে বেদ্বীন (বিধর্মী) হয়ে গিয়েছে।’

আস বলল, ‘না সে দিকে যাবার কোন পথ নেই।’

এ কথা শুনা মাত্রই জনতা আর অগ্রসর না হয়ে তাদের পূর্বের স্থান অভিমুখে ফিরে গেল।

উমারের ইসলাম গ্রহণের কারণে মুশরিকগণের এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যা ইতোপূর্বে আলোচিত হল। অপর পক্ষে মুসলিমদের অবস্থা সম্পর্কে অাঁচ-অনুমান কিংবা কিছুটা ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে এর পাশাপাশি আলোচিত পরের ঘটনাটি থেকে। মুজাহিদ ইবনে আব্বাস

হতে বর্ণনা করেছেন, আমি উমার বিন খাত্তাব (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, কী কারণে লকব বা উপাধি 'ফারূক' হয়েছে। তখন তিনি আমাকে বললেন, 'আমার তিনদিন পূর্বে হামযাহ (রাঃ) মুসলিম হয়েছিলেন, তারপর তিনি তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করে শেষে বললেন যে, 'আমি যখন মুসলিম হলাম তখন আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমরা কি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নই, যদি জীবিত থাকি কিংবা মরে যাই?

নাবী (ﷺ) ইরশাদ করলেন, 'অবশ্যই! সেই সত্ত্বার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন, তোমরা যদি জীবিত থাক কিংবা মৃত্যুমুখে পতিত হও হক বা সত্যের উপরেই তোমরা রয়েছ।'

উমারের বর্ণনা : 'তখন আমি সকলকে লক্ষ্য করে বললাম যে, গোপনীয়তার আর কী প্রয়োজন? সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, আমরা অবশ্যই গোপনীয়তা পরিহার করে বাইরে যাব।

তারপর আমরা দু'টি সারি বেঁধে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে দু'সারির মধ্যে নিয়ে বাইরে এলাম। এক সারির শিরোভাগে ছিলেন হামযাহ (রাঃ) আর অন্য সারির শিরোভাগে ছিলাম আমি। আমাদের চলার কারণে রাস্তায় যাঁতার আটার মতো হালকা ধূলি কণা উড়ে যাচ্ছিল। এভাবে যেতে যেতে আমরা মসজিদুল হারামে গিয়ে প্রবেশ করলাম। উমার (রাঃ) বলেছেন, 'কুরাইশগণ যখন আমাকে এবং হামযাহকে মুসলিমদের সঙ্গে দেখল তখন মনে মনে তারা এত আঘাতপ্রাপ্ত হল যে, এমন আঘাত ইতোপূর্বে আর কখনো পায়নি। সেই দিনই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমার উপাধি দিয়েছিলেন 'ফারূক''

ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন যে, যতদিন পর্যন্ত উমার (রাঃ) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি ততদিন পর্যন্ত আমরা ক্কাবা'হগৃহের নিকট নামায আদায় করতে সাহস করিনি।

সুহাইব বিন সিনান রুমী বর্ণনা করেছেন যে, উমার (রাঃ) যে দিন ইসলাম গ্রহণ করলেন সে দিন থেকে ইসলাম তার গোপন প্রকোষ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল বাইরের জগতে। সে দিন থেকে প্রকাশ্যে প্রচার এবং মানুষকে প্রকাশ্যে দ্বীনের আহবান জানানো সম্ভব হল।

পূর্বের সূত্র ধরেই বলা হয়েছে, 'আমরা গোলাকার হয়ে আল্লাহর ঘরের পাশে বৈঠক করলাম এবং আল্লাহর ঘর প্রদক্ষিণ করলাম। যারা আমাদের উপর অন্যায় অত্যাচার করত আমরা তার প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম এবং তাদের কোন কোন অন্যায়ের প্রতিবাদও করলামট।

ইবনে মাসউদের বর্ণনাঃ 'যখন হতে উমার (রাঃ) মুসলিম হয়েছিলেন তখন থেকে আমরা সমানভাবে শক্তিশালী হয়েছিলাম এবং মান-সম্মানের সঙ্গে বসবাস করতে পেরেছিলাম।'

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সমীপে কুরাইশ প্রতিনিধি

দু'জন সম্মানিত এবং প্রতাপশালী বীর অর্থাৎ হামযাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব এবং উমার বিন খাত্তাব (রাঃ)-এর মুসলিম হওয়ার পর থেকে মুশরিকগণের অন্যায় অত্যাচার ও উৎপীড়নের মাত্রা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে এবং মুসলিমদের সঙ্গে আচরণের ব্যাপারে পাশবিকতা ও মাতলামির স্থলে বিচার বুদ্ধির প্রয়োগ দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। এ প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে তাঁর প্রচার এবং তাবলীগের কর্ম থেকে নিবৃত্ত করার জন্য কঠোরতা এবং নিষ্ঠুরতা অবলম্বনের পরিবর্তে তাঁর সঙ্গে সদাচার করা এবং অর্থ, ক্ষমতা, নেতৃত্ব, নারী ইত্যাদি যোগান দেয়ার প্রস্তাবের মাধ্যমে তাঁকে প্রচার কাজ থেকে নিবৃত্ত করার এক নয়া কৌশল প্রয়োগের মনস্থ করে। কিন্তু সেই হতভাগ্যদের জানা ছিল না যে, সমগ্র পৃথিবী যার উপর সূর্য উদিত হয় দাওয়াত ও তাবলীগের তুলনায় খড় কুটারও মর্যাদা বহন করে না। এ কারণে এ পরিকল্পনায়ও তাদের অকৃতকার্য ও বিফল হতে হয়।

ইবনে ইসহাক্ব ইয়াযিদ বিন যিয়াদের মাধ্যমে মুহাম্মাদ বিন ক্বা'ব কুরাযীর এ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন যে, আমাকে বলা হয় যে, উতবাহ বিন রাবী'আহ যিনি গোত্রীয় প্রধান ছিলেন, একদিন কুরাইশগণের বৈঠকে বললেন- 'ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মাসজিদুল হারামের এক জায়গায় একাকী অবস্থান করছিলেন, 'হে কুরাইশগণ! আমি মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নিকট গিয়ে কেনই বা কথোপকথন করব না এবং তাঁর সামনে কিছু উপস্থাপন করব না। হতে পারে যে, তিনি আমাদের কোন কিছু গ্রহণ করে নিবেন। তবে যা কিছু তিনি গ্রহণ করবেন তাঁকে তা প্রদান করে আমরা তাঁকে তাঁর প্রচারাভিযান থেকে নিবৃত্ত করে দেব।' এটা হচ্ছে সে সময়ের কথা যখন হামযাহ মুসলিম হয়ে গিয়েছিলেন এবং মুশরিকগণ দেখছিল যে, মুসলিমদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মুশরিকগণ বলল, 'আবুল ওয়ালীদ! আপনি যান এবং তাঁর সাথে কথাবার্তা বলুন। এরপর উতবাহ সেখান থেকে উঠে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট বসল এবং বলল, 'ভ্রাতুষ্পুত্র! আমাদের গোত্রে তোমার মর্যাদা ও স্থান যা আছে এবং বংশীয় যে সম্মান আছে তা তোমার জানা আছে। এখন তুমি নিজ গোত্রের নিকট এক বড় ধরণের ব্যাপার নিয়ে এসেছ যার ফলে গোত্রভুক্ত বিভিন্ন লোকজনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়ে গেছে। ওদের বিবেক-বুদ্ধিকে নির্বুদ্ধিতার সম্মুখীন করে ফেলেছ। তাদের উপাস্য প্রতিমাদের এবং তাদের ধর্মের দোষত্রুটি প্রকাশ করে মৃত পূর্ব পুরুষদের 'কাফের' সাব্যস্ত করছ। এ সব নানা সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে আমি তোমার নিকট কয়েকটি কথা পেশ করছি। তার প্রতি মনোযোগী হও। এমনটি হয়তো বা হতেও পারে যে, কোন কথা তোমার ভাল লাগবে এবং তুমি তা গ্রহণ করবে।'

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, 'আবুল ওয়ালীদ বল আমি তোমার কথায় মনোযোগী হব।'

আবুল ওয়ালীদ বলল, 'ভ্রাতুষ্পুত্র! এ ব্যাপারে তুমি যা নিয়ে আগমন করেছ এবং মানুষকে যে সব কথা বলে বেড়াচ্ছ তার উদ্দেশ্য যদি এটা হয় যে, এর মাধ্যমে তুমি কিছু ধন-সম্পদ অর্জন করতে চাও তাহলে আমরা তোমাকে এত বেশী ধন-সম্পদ একত্রিত করে দেব যে, তুমি আমাদের সব চাইতে অধিক ধন-সম্পদের মালিক হয়ে যাবে, কিংবা যদি তুমি এটা চাও যে, মান-মর্যাদা, প্রভাব-প্রতিপত্তি তোমার কাম্য তাহলে আমাদের নেতৃত্ব তোমার হাতে সমর্পন করে দিব এবং তোমাকে ছাড়া কোন সমস্যার সমাধান কিংবা মীমাংসা আমরা করব না, কিংবা যদি এমনও হয় যে, তুমি রাজা-বাদশাহ হতে চাও তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের সম্রাটের পদে অধিষ্ঠিত করে দিচ্ছি। তাছাড়া তোমার নিকট যে আগমন করে সে যদি জিন কিংবা ভূত-প্রেত হয় যাকে তুমি দেখছ অথচ নিজে নিজে তার কুপ্রভাব প্রতিহত করতে পারছ না, তাহলে আমার তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি এবং তোমার পূর্ণ সুস্থতা লাভ না হওয়া পর্যন্ত যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা প্রয়োজন আমরাই তা করতে প্রস্তুত আছি, কেননা কখনো কখনো এমনও হয় যে, জিন-ভূতেরা মানুষের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে ফেলে এবং এ জন্য চিকিৎসার প্রয়োজনও হয়ে দাঁড়ায়।

উতবাহ এক নাগাড়ে এ সব কথা বলতে থাকল এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) গভীর মনোযোগের সঙ্গে তা শুনতে থাকলেন। যখন সে তার কথা বলা শেষ করল তখন নাবী কারীম (ﷺ) বললেন, 'আবুল ওয়ালীদ! তোমার বলা কি শেষ হয়েছে? সে বলল, 'হ্যাঁ'

নাবী (ﷺ) বললেন, 'বেশ ভাল, এখন আমার কথা শোন।'সে বলল, 'ঠিক আছে শুনব।'নাবী (ﷺ) বললেন,

(بسم الله الرحمن الرحيم حٰم تَنزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْ أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَا إِلَيْهِ) [فصلت:1: 5].

অর্থঃ হা'মীম, এ বাণী করুণাময় দয়ালু (আল্লাহ) এর তরফ থেকে নাজিলকৃত এটা এমন একটি কিতাব, যার আয়াতগুলো বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ কুরআন যা আরবী ভাষায় (অবতারিত), জ্ঞানী লোকদের জন্য (উপকারী)। (এটা) সুসংবাদ দাতা ও ভয় প্রদর্শক কিন্তু অধিকাংশ লোকই মুখ ফিরিয়ে নিল। সুতরাং তারা শুনেই না। এবং তারা বলে, যে কথার প্রতি আপনি আমাদের ডাকেন সে ব্যাপারে আমাদের অন্তর পর্দাবৃত। (ফুসসিলাত ৪১ : ১-৫)

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পাঠ করতে থাকেন এবং উতবাহ নিজ দু'হাত পশ্চাতে মাটির উপর রাখা অবস্থায় তাতে ভর দিয়ে শ্রবণ করতে থাকে। যখন নাবী (ﷺ) সিজদার আয়াতের নিকট পৌঁছে গেলেন। তখন সিজদা করলেন এবং বললেন, আবুল ওয়ালীদ তোমাকে যা শ্রবণ করানোর প্রয়োজন ছিল তা শ্রবণ করেছ, এখন তুমি জান এবং তোমার কর্ম জানে।

উতবাহ সেখান থেকে উঠে সোজা তার বন্ধুদের নিকট চলে গেল। তাকে আসতে দেখে মুশরিকগণ পরস্পর বলাবলি করতে থাকল, আল্লাহর শপথ! আবুল ওয়ালীদ তোমাদের নিকট সেই মুখ দিয়ে

আসছে না যে মুখ নিয়ে সে গিয়েছিল, তারপর আবুল ওয়ালিদ যখন তাদের নিকট এসে বসল তখন তারা জিজ্ঞেস করল, 'আবুল ওয়ালীদ! পিছনের খবর কি?'

সে বলল, 'পিছনের খবর হচ্ছে আমি এমন এক কথা শুনেছি যা কোনদিনই শুনি নি। আল্লাহর শপথ! সে কথা কবিতা নয়, যাদুও নয়। হে কুরাইশগণ! আমরা কথা মেনে নিয়ে ব্যাপারটি আমার উপর ছেড়ে দাও। (আমার মত হচ্ছে) ঐ ব্যক্তিকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও। সে পৃথক হয়ে থেকে যাক। আল্লাহর কসম! আমি তার মুখ থেকে যে বাণী শ্রবণ করলাম তা দ্বারা অতিশয় কোন গুরুতর ব্যাপার সংঘটিত হয়ে যাবে। আর যদি তাকে কোন আরবী হত্যা করে ফেলে তবে তো তোমাদের কর্মটা অন্যের দ্বারাই সম্পন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু এ ব্যক্তি যদি আরবীদের উপর বিজয়ী হয়ে প্রাধান্য বিস্তারে সক্ষম হয় তাহলে এর রাজত্ব পরিচালনা প্রকৃতপক্ষে তোমাদেরই রাজত্ব হিসেবে গণ্য হবে! এর অস্তিত্ব বা টিকে থাকা সব চাইতে বেশী তোমাদের জন্যই মঙ্গলজনক হবে।

লোকেরা বলল, 'আবুল ওয়ালীদ! আল্লাহর কসম, তোমার উপরও তার যাদুর প্রভাব কাজ করেছে।'

উতবাহ বলল, 'তোমরা যাই মনে করনা কেন, তাঁর সম্পর্কে আমার যা অভিমত আমি তোমাদের জানিয়ে দিলাম। এখন তোমরা যা ভাল মনে করবে, তাই করবে।

অন্য এক বর্ণনায় এটা উল্লে-খিত হয়েছে যে, নাবী কারীম (ﷺ) যখন তিলাওয়াত আরম্ভ করেছিলেন তখন উতবাহ নীরবে শুনতে থাকে। তারপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন এ আয়াতে কারীমা পাঠ করেন,

(فَإِنْ أَعْرَضُوْا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُوْدَ) [فصلت:13]

''এরপরও তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে বল- আমি তোমাদেরকে অকস্মাৎ শাস্তির ভয় দেখাচ্ছি- 'আদ ও সামূদের (উপর নেমে আসা) অকস্মাৎ-শাস্তির মত।' (ফুসসিলাত ৪১ : ১৩)

এ কথা শোন মাত্রই উতবাহ ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল এবং এটা বলে তার হাত রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মুখের উপর রাখল যে, আমি আল্লাহর মাধ্যম দিয়ে এবং আত্মীয়তার প্রসঙ্গটি স্মরণ করিয়ে কথা বলছি যে, এমনটি যেন না করা হয়। সে এ ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছিল যে প্রদর্শিত ভয় যদি এসেই যায়। এরপর সে সমবেত মুশরিকগণের নিকট চলে যায় এবং তাদের সঙ্গে উল্লে-খিত আলাপ আলোচনা করে।

বয়কট

আবিসিনিয়া থেকে লাঞ্চিত ও অপমানিত হয়ে ফিরে আসার পর কুরাইশগণ রাসুল (সঃ) কে হত্যার পরিকল্পনাসহ সাহাবীদেরকে চিরতরে ধ্বংস করার কৌশল হিসেবে মক্কার সমুদয় গোত্রের সমন্বয়ে বনি হাশেম ও বনু মুত্তালিব গোত্রের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্রমূলক চুক্তি সম্পাদন করলো। এই চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল নবুওয়াতের ৭ম বছরের মুহাররাম মাসের প্রারম্ভে চাঁদ রাত্রিতে। মুহাসসাব উপত্যকায় খাইফে বনু কিনানাহ-র ভেতরে সম্পাদিত এই চুক্তির শর্তগুলো হল-

১. মক্কার কোন ব্যক্তি বনু হাশেম ও বনু মুত্তালিব গোত্রের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করবে না।

২. উক্ত গোত্রদ্বয়ের কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কাছে কোন প্রকার পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করবে না।

৩. উক্ত গোত্রদ্বয়ের সাথে সকল ধরণের সামাজিক কার্যকলাপ ও কুশলাদি বিনিময় বন্ধ রাখা হবে।

৪. উক্ত গোত্রদ্বয়ের নিকটে কোন প্রকার খাদ্য দ্রব্যও পাঠাবে না। সেই সাথে যতদিন পর্যন্ত তারা মুহাম্মদ
(সঃ)কে হত্যা করার জন্য কুরাইশদের হাতে সমর্পণ না করবে ততদিন পর্যন্ত এ চুক্তি বলবৎ থাকবে।

লিখিত চুক্তিপত্রটি কাবার দেয়ালে ঝুলিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আবু তালিব অপারগ হয়ে রাসূল (সঃ)কে তাদের হাতে তুলে দিবেন না মর্মে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন এবং রাসূল (সঃ) সহ বনু হাশেম ও বনু মুত্তালিব গোত্রের মুসলিম-অমুসলিম নারী-পুরুষ ও শিশুসহ সবাইকে সঙ্গে নিয়ে বাধ্য হয়ে গিরি-দূর্গ শি'বে আবু তালিবের شعب أبي طالب / Valleys of Abu Talib) মধ্যে আশ্রয় নেন।

বন্দী জীবনের ৩টি বছর এত কঠিন ছিল যে, ক্ষুধা নিবারণের জন্য সাহাবীদেরকে গাছের পাতা পর্যন্ত খেতে হয়েছে। সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) ক্ষুধার জ্বালায় শি'বে আবু তালিবে বন্দী বেশে এক রাতে একটি শুকনো চামড়া আগুনে ঝলসিয়ে চূর্ণ করে পানিতে গুলে পান করেছিলেন। বিলাল রাঃ বলেন, পানি ও খাদ্যদ্রব্যের অভাবে গাছের পাতা খাওয়ার ফলে তাদের মল ছাগলের মলের ন্যায় হয়ে পড়েছিল। এই ৩ বছরের মধ্যে তাদের মধ্যকার শিশু পুত্র-কন্যাসহ বন্দী অবস্থায় অনেকেই মৃত্যু বরণ করে। এর পরেও ছোট্ট ছোট্ট শিশুরা যখন ক্ষুদ-পিপাসায় অস্থির হয়ে গগণ বিদারী চিৎকার করত; তখন পাষন্ড হৃদয় কুরাইশরা সে ক্রন্দন শুনে অট্টহাসিতে ফেটে পড়তো। হারাম মাসগুলো ছাড়া অন্য কোনো সময়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাঁরা বাহিরে যেতে পারতেন না। অবশ্য যে সকল কাফেলা মক্কার বাহির থেকে আগমন করতো, তাদের নিকট থেকে তাঁরা জিনিসপত্র ক্রয় করতে পারতেন। কিন্তু মক্কার ব্যবসায়ীগণ এবং লোকজনেরা সেসব

জিনিসের দাম এতই বৃদ্ধি করে দিতো যে, গিরিসংকটবাসীগণের ধরা-ছোঁয়ার বাইরেই তা থেকে যেতো। এতে কাফেলাগুলির বাণিজ্যিক ক্ষতি হলে আবু লাহাব তা নিজ খরচে পুষিয়ে দিত।

আবার তাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি ও নেতৃবর্গ দুঃখিতও হতো। খাদীজা (রাঃ) এর ভাতিজা হাকিম ইবনে হিযাম রাঃ (তিনি মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। ১২০ বছর বয়সে ৫০/৫৪ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন) স্বীয় দাসের মাধ্যমে হযরত খাদীজা (রাঃ) এর নিকট বন্দীদের জন্য সামান্য গম পাঠাচ্ছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে আবু জাহল দেখতে পেয়ে তা জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করে শেষে ব্যর্থ হয়। আবুল বোখতারী সেখানে উপস্থিত হয়ে বলেন- "এক ব্যক্তি তার ফুফু খাদীজার (রাঃ) নিকট সামান্য খাবার পাঠাচ্ছে তাতে তুমি বাধা দিচ্ছ কেন? তুমি এত নিচ!"

বনু আমির বিন লুঈ গোত্রের হিশাম বিন আমর রাতের অন্ধকারে শি'বে আবু তালিবের উপত্যকায় গোপনে উটভর্তি খাবার ও কাপড়-চোপড় সরবরাহ করতেন।

সু-দীর্ঘ ৩টি বছর শি'বে আবু তালিবে অবরুদ্ধ থাকার পর শেষ পর্যন্ত কুরাইশদের কয়েক ব্যক্তির পক্ষ থেকে

বিন উমাইয়ার কাছে। যুহাইর আবু তালিবের ভাগ্নি। হাশিম যুহাইরকে তিরস্কার করে বললেন, 'যুহাইর, ভালো

রাসুল (সঃ) ও তার সঙ্গী-সাথীদের মুক্তির আন্দোলন শুরু হলো। একদিন হিশাম বিন আমর গেলেন যুহাইর খাবার কীভাবে তোমার উদরস্থ হয়? অথচ তোমার মামা-বংশ না খেয়ে মরণাপন্ন!' শুনে যুহাইরের যেন সুপ্ত দুঃখ জেগে উঠলো; সে বললো, 'দুঃখ কি আমারও হয় না, হাশিম! কিন্তু একা আমি কী করতে পারি, বলো?' হাশিম বললেন, 'তুমি একা নও, আমি তোমার সাথে আছি।' যুহাইর বললেন, 'বাহ। তবে চলো, তৃতীয় ব্যক্তির অনুসন্ধান করি।' এভাবে মুতঈম ইবনে আদি, আবুল বুখতারি ইবনে হিশাম এবং যামআ ইবনে আসওয়াদ নামের সমমনা পাঁচজন রহমদিল মানুষ ঐক্যবদ্ধ হলেন; এবং স্থির করলেন, কাল কাবা-চত্বরে গিয়ে ওই অন্যায় অঙ্গীকারনামা তারা ছিঁড়ে ফেলবেন। যুহাইর বললেন, "আমিই সর্বপ্রথম মুখ খুলব"। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তারা সুন্দর একটি বুদ্ধিও করলেন।

পরদিন উল্লেখিত সবাই মিলে কাবা শরীফে উপস্থিত হয়ে প্রথমে সাতবার কাবা তাওয়াফ করলেন। এরপর সেখানে যুহাইর সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে সম্বোধন করে বলেনঃ "হে মক্কাবাসীগণ! এটা কেমন কথা যে, আমরা সুখে-শান্তিতে বসবাস করবো। ভালো ভালো খাবার খাব। আর বন্দী বনু হাশেমের ভাগ্যে সামান্য খাবারও জুটবে না? বন্দী বেশে তারা মানবেতর জীবন যাপন করবে; তা হয় না। আল্লাহর কসম! ঐ অন্যায় চুক্তিপত্র ছিড়ে না ফেলা পর্যন্ত আমি শান্ত হব না।" এ কথা শুনার পর আবু জাহল সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করলো- "সাবধান! এ চুক্তিপত্রের বিরুদ্ধে আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদের পক্ষে কাউকে কিছু করতে দেয়া হবে না।" অন্যদিকে

আরেকজনও এমন বলে ওঠে। এভাবে প্রত্যেকে তাদের মতো করে বয়কটের অন্যায় ও অসারতার দিক তুলে ধরে এর শেষ হওয়া উচিত বলে ঘোষণা করে। তাতে কাবা-চত্বরে বসে থাকা অন্য কাফেরকুল ক্ষেপে উঠে ও তাদের সাথে বিতণ্ডায় লিপ্ত হয় এবং আবু জাহল বলতে থাকে, "এরা চুক্তি করে এসব বলছে; এসব এদের পূর্ব-পরিকল্পনা"। তখনই আবু তালিব সেখানে উপস্থিত হয়ে বলেন, 'আমার ভাতিজা আমাকে এক পয়গাম নিয়ে পাঠিয়েছে। তিনি বলেছেন, আপনাদের ওই অন্যায় চুক্তিনামা পোকা-মাকড়ে খেয়ে ফেলেছে; চুক্তির কোনো দফাই আর সেখানে উল্লেখ নেই, একমাত্র আল্লাহ নামটি ছাড়া। আপনারা খবর নিয়ে দেখুন।

যদি আমার ভাতিজার কথা সত্যি হয়, তাহলে এ অন্যায় বয়কটের এখানেই শেষ হবে। আর এর অন্যথা দেখা গেলে আমাদের কোনো কথা নেই। ইত্যবসরে মুতঈম বিন আদী নিজেই সেটি ছিঁড়ে ফেলার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছিলো; আবু তালিবের এই কথা শোনার পর সকলেই কাবার দেয়ালের কাছে দৌড়ে গেলো। গিয়ে দেখলো, অঙ্গীকারনামায় শুধু 'বিসমিকা আল্লাহুম্মা' কথাটি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

অতঃপর জনতা ও কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সামনে আবু জাহলকে পদদলিত করে মুতঈম বিন আদী, যামআ ইবনে আসওয়াদ ও আবুল বোখতারী প্রমুখ মিলে সশস্ত্র হয়ে যুহাইরের নেতৃত্বে উন্মুক্ত তরবারী নিয়ে তৎক্ষণাৎ শি'বে আবু তালিব দূর্গে গমন করে বন্দীদের মুক্ত করে নিয়ে আসলেন। ফলশ্রুতিতে দীর্ঘ ৩ বছর শি'বে আবু তালিব কারান্তরালে বন্দী জীবন থেকে সবাই মুক্তি লাভ করল।

শি'বে আবু তালিব থেকে মুক্তির পর আবু তালিব ও তাঁর সঙ্গীরা কাবা ঘরের সামনে এলেন এবং কাবা ঘরের পর্দা জড়িয়ে ধরে আল্লাহর কাছে কাতর কণ্ঠে দূয়া করলেন- "হে আল্লাহ! যারা আমাদের সাথে যুলুম করেছে, আমাদের নৈকট্যের সম্পর্ক কর্তন করেছেন এবং আমাদের বেইজ্জতি করেছে তুমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নাও"। (তাবাকাত ইবনে সাদ, ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত)

বয়কটের ঘটনা থেকে আমাদের জন্য শিক্ষাঃ

১। অমুসলিমরা প্রত্যেকেই এক রকম নয়। তাদের মধ্যে অনেকেই আছে মুসলিমদের প্রতি সহানুভূতিশীল। আমাদের উচিৎ সেসব অমুসলিমদের সাথে সহানুভূতির আচরণ করা এবং তাদের প্রাপ্য সম্মান তাদেরকে দাওয়া। রাসূল সাঃ মুতিঈম বিন আদীকে তার প্রাপ্য সম্মান দিয়ে বলেছিলেন সে যদি বদরের বন্দীদের জন্য সুপারিশ করত তাহলে তিনি সব বন্দীদেরকে মুত'ঈমের সম্মানে ছেড়ে দিতেন।

২। মুসলিমদের প্রতি সহানুভূতিশীল কোন অমুসলিম ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ যদি এমন কিছু দিয়ে সহায়তা করতে চায় যাতে মুসলিমদের সার্বিক কল্যাণ নিহিত আছে এবং শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক নয় তবে সেই সহায়তা গ্রহণে মুসলিমদের কোন আপত্তি নেই।

আবু তালিবের কাছে শেষবারের মত (৪র্থ দফা) কুরাইশদের আগমনঃ

গিরি সংকট থেকে বেরিয়ে আসার পর আবু তালিব খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। এমনিতেই তিনি ছিলেন

অশীতিপর বৃদ্ধ। তার উপরে গিরি সংকটের অবর্ণনীয় কষ্টের মধ্যে তার কোমর বেঁকে গিয়েছিল। এ সময় তিনি প্রচন্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন। মুশরিকরা চিন্তা করতে থাকে যদি কোনো ফায়সালা না করেই আবু তালিব মারা যায় এবং এরপর তারা মুহাম্মাদ সাঃ কে হত্যা করে তাহলে লোকজন বলাবলি করবে যে আবু তালিবের অনুপস্থিতির সুযোগে তারা মুহাম্মাদ সাঃ কে হত্যা করেছে। তাই তারা ভাবল আবু তালিব বেঁচে থাকতেই এর একটা ফায়সালা হওয়া দরকার। এজন্য কুরাইশদের প্রায় ২৫ জন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল আবু তালিবের কাছে গেল। এই দলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন উতবা বিন রাবিয়া, শায়বা বিন রাবিয়া, আবু জাহল, উমাইয়া বিন খালাফ এবং আবু সুফিয়ান বিন হারব। কুরাইশগণ আবু তালিবকে বলল, 'হে আবূ তালিব! আমাদের মধ্যে মান-মর্যাদার যে আসনে আপনি রয়েছেন তা আপনি জানেন এবং বর্তমানে যে অবস্থার মধ্যে দিয়ে দিন যাপন করছেন তাও আপনার জানা। আমাদের ভয় হচ্ছে আপনি আপনার জীবনের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছেন। এদিকে আপনার ভাতিজা এবং আমাদের মধ্যে যে সংঘাত চলে আসছে তাও আপনার জানা। আমরা চাচ্ছি যে আপনি তাকে ডেকে আমাদের নিকট এবং আমাদের সম্পর্কে তার নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করবেন- যেন আমরা তার থেকে এবং সে আমাদের থেকে পৃথক থাকে অর্থাৎ সে আমাদের ধর্মের উপর কোন হস্তক্ষেপ করবে না এবং আমরাও তার ধর্মে হস্তক্ষেপ করবো না।' আবু তালিব মুহাম্মাদ সাঃ কে ডেকে কুরাইশদের প্রস্তাবটি জানালেন। জবাবে রাসূল সাঃ বললেন, 'আমি যদি এমন একটি প্রস্তাব পেশ করি যা মেনে নিলে গোটা আরবের সম্রাট হওয়া যাবে এবং আজম অধীনস্থ হয়ে যাবে। তাহলে

আপনাদের মতামত কি?'

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল বলেছিলেন, 'চাচাজান! আমি তাদের নিকট থেকে এমন এক প্রস্তাবের প্রতি

স্বীকৃতি ও সমর্থন চাই, যা মেনে নিলেন আরব জাহান তাদের অধীনস্থ হয়ে যাবে এবং আজম তাদের নিকট কর দিয়ে দিয়ে বসবাস করতে বাধ্য হবে।'

ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল তাদেরকে বললেন, 'আপনারা শুধুমাত্র একটি কথা মেনে নিন। যার বদৌলতে আপনারা হয়ে যাবেন আরবের সম্রাট এবং আজম হয়ে যাবে আপনাদের অধীনস্থ।'

রাসূলের মুখ থেকে এ কথা শুনে তারা নিস্তব্ধ নির্বাক হয়ে গেল। রাসূলের কথা যেন তাদের মন বিগলিত করে ফেলল। কারণ যে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির জন্যই তারা এত শত্রুতা করেছে, এখন মুহাম্মাদই তাদেরকে সেই ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির উপায়-উপকরণ বলে দিচ্ছে। রাসূল সাঃ বললেন, 'আপনারা বলুন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহ ছাড়া কারও উপাসনা পরিহার করুন।' রাসূলের কথা শুনে তারা বলল, 'মুহাম্মদ তুমি এটাই চাচ্ছ যে সকল দেবদেবীর স্থানে আমরা কেবল এক আল্লাহকে মানি! বাস্তবিকই তোমার ব্যাপার বড়ই আশ্চর্যজনক!'

এরপর তারা পরস্পরকে বলল, 'আল্লাহর শপথ! এই ব্যক্তি তোমাদের একটি কথাও মেনে নেবে না। তোমরা পূর্ব পুরুষদের নিকট থেকে প্রাপ্ত দ্বীনের উপর অটল থাকো, যতক্ষণ আল্লাহ আমাদের এবং তার মধ্যে মীমাংসা করে দেন।' এ কথা বলে তারা হাতে তালি দিতে দিতে এবং হাসি-ঠাট্টা ও বিদ্রুপ করতে করতে নিজ নিজ রাস্তায় চলে গেল। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ সূরা আস স্বদ এর ১-৭ নং আয়াত নাযিল করলেন।

আমুল হুজনঃ বেদনার বছর

আবূ ত্বালীবের ইন্তিকাল

বার্ধক্য, দুশ্চিন্তা, অনিয়ম ইত্যাদি নানাবিধ কারণে আবূ ত্বালীবের অসুস্থতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যু গিরি সংকটে অন্তরীণাবস্থা শেষ হওয়ার ৬ মাস পর নবুওয়ত ১০ম বর্ষের রজব মাসে।

এ ব্যাপারে অন্য একটি মত হচ্ছে তিনি খাদীজাহ (রাঃ)-এর মৃত্যুর মাত্র তিন দিন পূর্বে রমাযান মাসে মৃত্যু বরণ করেন।

সহীর বুখারীতে মুসাইইব (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, আবূ ত্বালীবের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে নাবী কারীম (ﷺ) তাঁর নিকটে আগমন করেন। সেখানে আবূ জাহলও উপস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন,

(أَيْ عَمِّ، قُلْ: لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، كَلِمَةً أُحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ)

‘চাচাজান! আপনি শুধু একবার লা ইলাহা ইল-াল-াহ কালেমাটি পাঠ করুন, যাতে আমি বিচার দিবসে প্রমাণ হিসেবে তা আল্লাহর সমীপে পেশ করতে পারি।’’

আবূ জাহল এবং আব্দুল্লাহ বিন উমাইয়া বলল, আবূ ত্বালিব আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম হতে কি তাহলে শেষ পর্যন্ত বিমুখ হয়েই যাবেন? তারপর এরা উভয়েই অবিরাম তাঁর সঙ্গে কথা বলতে থাকে। সব শেষে আবূ ত্বালিব যে কথাটি বলেছিলেন তা হচ্ছে, ‘আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মের উপর।’ নাবী কারীম (ﷺ) বললেন,

(لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْـهُ)

‘‘আমি যতক্ষণ বাধা প্রাপ্ত না হব ততক্ষণ আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব।’ এ প্রেক্ষিতে এ আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হয়,

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا أَن يَسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا أُوْلِي قُرْبٰى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيْمِ) [التوبة:113]

‘‘নাবী ও মু’মিনদের জন্য শোভনীয় নয় মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, তারা আত্মীয়-স্বজন হলেও, যখন এটা তাদের কাছে সুস্পষ্ট যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী।’ (আত্-তাওবাহ ৯ : ১১৩)

আরো অবতীর্ণ হয়:

(إِنَّكَ لاَ تَهْدِيْ مَنْ أَحْبَبْتَ) [القصص: 56]

‘‘তুমি যাকে ভালবাস তাকে সৎপথ দেখাতে পারবে না।’ (আল-ক্বাসাস ২৮ : ৫৬)

এখানে এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, আবূ ত্বালিব রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে কী পরিমাণ সাহায্য সহযোগিতা ও রক্ষণাবেক্ষণ করেছিলেন। মক্কার অনাচারী মুশরিকগণের আক্রমণ থেকে ইসলামী আন্দোলনের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে প্রকৃতই তিনি ছিলেন দূর্গ স্বরূপ। কিন্তু আল্লাহর নাবী (ﷺ) এবং ইসলামের জন্য এত করেও যেহেতু তিনি বংশপম্পরা সূত্রে প্রাপ্ত বহুত্ববাদের প্রভাব কাটিয়ে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারলেন না, সেহেতু দোরগোড়ায় আগত কামিয়াবি থেকে বঞ্চিতই রয়ে গেলেন। যেমন সহীহুল বুখারী শরীফে আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তুমি তোমার চাচার কি উপকারে আসবে? ‘কারণ নাবী কারীম (ﷺ)-এর রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরাপত্তা বিধানের ব্যাপারে তাঁর শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ বললেন,

(هُوَ فِيْ ضَحْضَاحٍ مِن نَّارٍ، وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِيْ الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ)

‘‘তিনি এখন জাহান্নামের অগভীর স্থানে অবস্থান করেছেন। যদি আমি তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত না হতাম তা হলে তিনি জাহান্নামের অতল ডুবে যেতেন।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, এক দফা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট তাঁর চাচা আবূ ত্বালীবের আলোচনা উপস্থিত হয়। আলোচনা সূত্রে তিনি বলেন, ‘সম্ভবত কেয়ামতের দিন আমার সুপারিশ তাঁর উপকারে আসবে এবং তাঁকে জাহান্নামের এক অগভীর স্থানে রাখা হবে যা শুধু তাঁর দু’পায়ের গিঁট পৌঁছবে।

খাদীজাহ (রাঃ) - এর ইন্তিকাল

আবূ ত্বালীবের মৃত্যুর দু'মাস পর (মতান্তরে মাত্র তিনদিন পর) উম্মুল মো'মেনীন খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ) মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যু নবুওয়ত দশমবর্ষের রমাযান মাসে। মৃত্যুকালে তাঁর

বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। রাসূলুল্লাহ তখন অতিবাহিত করেছিলেন তাঁর জীবনের ৫০তম বছর।[1]

রসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর জীবনে খাদীজাহ (রাঃ) ছিলেন আল্লাহ তা‘আলার এক বিশেষ নেয়ামত স্বরূপ। দীর্ঘ পঁচিশ বছর যাবৎ আল্লাহর নাবী (ﷺ)-কে সাহচর্য দিয়ে, সেবা-যত্ন দিয়ে, বিপদাপদে সাহস ও শক্তি দিয়ে, অভাব অনটনে অর্থ সম্পদ দিয়ে, ধ্যান ও জ্ঞানের প্রয়োজনে প্রেরণা ও পরামর্শ দিয়ে ইসলাম বীজের অংকুরোদগম এবং শিশু ইসলামের লালন-পালনের ক্ষেত্রে তিনি যে অসামান্য অবদান রেখেছেন ইসলামের ইতিহাসে তার কোন তুলনা মিলেনা। খাদীজাহ (রাঃ) সম্পর্কে বলতে গিয়ে নাবী কারীম (ﷺ) বলেছেন,

(آمَنَتْ بِيْ حِيْنَ كَفَرَ بِيْ النَّاسُ، وَصَدَّقَتْنِيْ حِيْنَ كَذَّبَنِيْ النَّاسُ، وَأَشْرَكَتْنِيْ فِيْ مَالِهَا حِيْنَ حَرَّمَنِيْ النَّاسُ، وَرَزَقَنِيْ اللهُ وَلَدَهَا وَحَرَّمَ وَلَدَ غَيْرِهَا)

যে সময় লোকেরা আমার সঙ্গে কুফরী করল সেই সময়ে তিনি আমার প্রতি নিটোল বিশ্বাস স্থাপন করলেন, যে সময় লোকেরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল সে সময় তিনি আমাকে দান করলেন, আর লোকেরা যখন আমাকে বঞ্চিত করল, তখন তিনি আমাকে তাঁর সম্পদে অংশীদার করলেন। আল্লাহ আমাকে তাঁর গর্ভে সন্তানাদি প্রদান করলেন, অন্য কোন স্ত্রীর গর্ভে সন্তান দেন নাই।[2]

সহীহুল বুখারীতে আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জিবরাঈল (আঃ) নাবী কারীম (ﷺ)-এর নিকট আগমন করে বললেন যে, ‘হে আল্লাহর রাসূল! ইনি খাদীজাহ (রাঃ) আগমন করছেন। তাঁর নিকট একটি পাত্র আছে। যার মধ্যে তরকারী, খাদ্যবস্তু অথবা পানীয় বস্তু আছে। যখন সে আপনার নিকট এসে পৌঁছবে তখন আপনি তাঁকে তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সালাম বলবেন এবং জান্নাতে মতির তৈরি একটি মহলের সুসংবাদ প্রদান করবেন। যার মধ্যে কোন হট্টগোল বা হৈচৈ হবে না, কোন প্রকার ক্লান্তি ও শ্রান্তি আসবে না।

দুঃখের উপর দুঃখ

প্রাণপ্রিয় চাচা আবূ ত্বালীবের মৃত্যু এবং প্রাণাধিকা প্রিয়া ও সহধর্মিনী উম্মুল মো'মিনীন খাদীজাহ (রাঃ)-এর মুত্যু এ দুটি মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক ঘটনা সংঘটিত হয়ে গেল অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে। এ দুটি মৃত্যুর সুদূর প্রসারী ফল প্রতিফলিত হতে থাকল নাবী (ﷺ)-এর জীবনে। একদিকে যেমন তাঁর জীবনে বিস্তার লাভ করল নিদারুণ শোকের ছায়া, অন্যদিকে তিনি বঞ্চিত হলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী অভিভাবকের অভিভাবকত্ব এবং সহধর্মিনীর অনাবিল প্রেম ভালবাসা ও সাহচর্য থেকে। পিতৃব্যের মৃত্যুর ফলে মুশরিকগণের সাহস বৃদ্ধি পেয়ে গেল বহুগুণে। নাবী (ﷺ) ও মুসলিমগণের উপর নতুন উদ্যমে তারা শুরু করল নানামুখী নির্যাতন। একেত প্রিয় পরিজনদের বিয়োগ ব্যথা, অন্যদিকে দুঃখ, যন্ত্রণা নির্যাতন পর্বতসম ধৈর্য্যের অধিকারী হয়েও নাবী (ﷺ)-এর জীবন হয়ে উঠে বিষাদময় ও বিপর্যস্ত, হয়ে উঠে নৈরাশ্যে ভরপুর। নৈরাশ্যের মাঝে কিছুটা আশায় বুক বেঁধে অগ্রসর হন তিনি ত্বায়িফের পথে যদি সেখানকার লোকজন দাওয়াত গ্রহণ করেন, কিংবা দাওয়াত ও তাবলীগের ব্যাপারে তাঁকে কিছুটা সাহায্য করেন, কিংবা তাঁকে একটু আশ্রয় প্রদান করে তাঁর জাতির বিরুদ্ধে সাহায্য করেন। কিন্তু সেখানে দাওয়াত কবুল, আশ্রয় কিংবা, সাহায্য প্রদান কোন কিছু তো নয়ই, বরং তাঁর সঙ্গে এতই নির্মম আচরণ করা হল এবং এতই দৈহিক নির্যাতন চালানো হল যে, তা অতীত নির্যাতনের সকল রেকর্ড অতিক্রম করে গেল (এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা করা হবে আরও পরে)।

এ দিকে মক্কার মুশরিকগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং তাঁর অনুগামী ও অনুসারীদের উপর ইতোপূর্বে যেভাবে জুলুম-নির্যাতন ও অত্যাচার উৎপীড়ন চালিয়ে আসছিল এখনো অব্যাহতভাবে তা চালিয়ে যেতে থাকল। শুধু তাই নয়, বরং নির্যাতনের মাত্রা এত বেশী বৃদ্ধি পেতে থাকল যে, আবূ বাকর (রাঃ) -এর মতো অত্যন্ত ধৈর্যশীল এবং কষ্ট সহিষ্ণু ব্যক্তিও অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে উঠলেন এবং উপায়ান্তর না দেখে মক্কা ছেড়ে হাবশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিন্তু পথিমধ্যে 'বারকে গিমাদ' নামক স্থানে পৌঁছলে ইবনে দাগানার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। সে তাঁকে নিরাপত্তা বিধানের আশ্বাস দিয়ে নিজ আশ্রয়ে মক্কায় ফিরে নিয়ে আসে।[1]

ইবনে ইসহাক্ব বর্ণনা করেছেন যে, যখন আবূ ত্বালিব মৃত্যুমুখে পতিত হন তখন কুরাইশগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে এত কষ্ট দেন যা আবূ ত্বালীবের জীবদ্দশায় কেউ কল্পনাই করতে পারেনি। এখানে একটি ঘটনার উল্লে-খ করা হল। একদিন এক নির্বোধ ও গোঁয়ার প্রকৃতির কুরাইশ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সামনে এগিয়ে এসে মাথার উপর মাটি নিক্ষেপ করে দেয়। সেই অবস্থাতেই তিনি প্রত্যাবর্তন করেন। গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর এক কন্যা সেই মাটি ধুইয়ে পরিস্কার করে দেন। ধোয়ানোর সময় তিনি ক্রন্দন করছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে সান্ত্বনা দানের জন্য বললেন,

(لَا تَبْكِيْ يَابُنَيَّةُ، فَإِنَّ اللهَ مَانِعٌ أَبَاكَ)

“পুত্রী ক্রন্দন কোরো না। আল্লাহই তোমার পিতার হিফাজতকারী।”
ঐ সময় তিনি এ কথাও বলেন যে,

(مَا نَالَتْ مِنِّيْ قُرَيْشٌ شَيْئًا أَكْرَهُهُ حَتّٰى مَاتَ أَبُوْ طَالِبٍ)

“যতদিন আমার চাচা আবূ ত্বালিব জীবিত ছিলেন কুরাইশগণ আমার সঙ্গে এত খারাপ ব্যবহার করে নি যা আমার সহ্যের বাহিরে ছিল।”
এমনিভাবে অবিরাম একের পর এক বিপদাপদের সম্মুখীন হওয়ার কারণে নাবী কারীম (ﷺ) সেই বছরটির নাম রাখেন ‘আমুল হুযন’ অর্থাৎ দুঃখ কষ্টের বছর। ইতিহাসে সে বছরটি এ নামেই প্রসিদ্ধ।

হজরত সাওদা রাদি.-এর সঙ্গে বিবাহ

এ বছরই তথা নবুওয়াতের দশম বছরের শাওয়াল মাসে রাসুলে কারিম সা. হজরত সাওদা বিনতু জামআ রাদি.-কে বিবাহ করেছিলেন। তিনি আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং দ্বিতীয়বার হাবশায় হিজরতকারী মুহাজিরদের একজন ছিলেন। তার স্বামী ছিলেন সুকরান ইবনু আমর। তিনিও ইসলাম গ্রহণ করে তার সঙ্গে হাবশায় হিজরত করেছিলেন এবং সেখানেই ইনতিকাল করেন। কোনো কোনো বর্ণনায় মক্কায় ফিরে আসার পর ইনতিকাল করেন। যখন ইদ্দত শেষ করলেন তখন রাসুলে কারিম সা. নিজের জন্য তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন এবং বিবাহ করে নিলেন। হজরত খাদিজা রাদি.-এর ইনতিকালের পর তাকেই রাসুলে কারিম সা. সর্বপ্রথম বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন। জীবনের শেষদিকে এসে রাসুলে কারিম সা.-এর সঙ্গে তার রাতযাপনের পালা হজরত আয়িশা রাদি.-কে দান করেছিলেন।

মক্কার বাইরে ইসলামের দাওয়াত

ত্বায়িফে রাসূল (সাঃ)

নবুওয়তের দশম বছর শাওয়াল মাসে (৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসের শেষের দিকে কিংবা জুন মাসের প্রথম দিকে) নাবী কারীম (ﷺ) ত্বায়িফ গমন করেছিলেন। ত্বায়িফ মক্কা থেকে আনুমানিক ষাট মাইল দূরত্বে অবস্থিত। যাতায়াতের এ দূরত্ব তিনি অতিক্রম করেছিলেন পদব্রজে। সঙ্গে ছিলেন তাঁর মুক্ত করা ক্রীতদাস যায়দ বিন হারিসাহ (রাঃ)। পথ চলাকালে পথিমধ্যে যে কাবিলাহ বা গোত্রের নিকট তিনি উপস্থিত হতেন তাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করতেন। কিন্তু তাঁর এ আহবানে তাদের পক্ষ থেকে কেউ সাড়া দেয় নি।

ত্বায়িফ গমন করে সাক্বীফ গোত্রের তিন নেতার সঙ্গে, যারা সকলেই সহোদর ছিলেন, তিনি সাক্ষাৎ করেন। তাঁর নাম ছিল যথাক্রমে আবদে ইয়ালাইল, মাসউদ ও হাবীব। ভ্রাতৃত্রয়ের পিতার নাম ছিল 'আমর বিন ওমাইর সাক্বাফী। তাঁদের সঙ্গে (সাক্ষাতের পর মহানাবী (ﷺ) আল্লাহ তা'আলার অনুগত হয়ে চলা এবং ইসলামকে সাহায্য করার জন্য তাঁদের নিকট দাওয়াত পেশ করেন। তদুত্তরে একজন বলেন যে, সে কাবার পর্দা (আবরণ) ফেড়ে দেখাক যদি আল্লাহ তাকে রাসূল করেছেন।] দ্বিতীয়জন বললেন, 'নাবী করার জন্য আল্লাহ কি তোমাকে ছাড়া আর কাউকেও পান নি? তৃতীয়জন বললেন, 'তোমার সঙ্গে আমি কোন ক্রমেই কথা বলবনা। প্রকৃতই যদি তুমি নাবী হও তবে তোমার কথা প্রত্যাখ্যান করা আমার জন্য বিপজ্জনক। আর যদি তুমি আল্লাহর নামে মিথ্যা প্রচারে লিপ্ত হও তবে তোমার সঙ্গে আমার কথা বলা সমীচীন নয়।' তাঁদের এহেন আচরণ ও কথাবার্তায় তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হলেন এবং সেখান থেকে যাবার প্রাক্কালে শুধু বললেন, 'তোমরা যা করলে এবং বললে তা গোপনেই রাখ।'

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ত্বায়িফে দশদিন অবস্থান করেন। এ সময়ের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। কিন্তু সকলের উত্তর একই 'তুমি আমাদের শহর থেকে বের হয়ে যাও।' ফলে ভগ্ন হৃদয়ে তিনি সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। প্রত্যাবর্তনের পথে যখন তিনি পা বাড়ালেন তখন তাঁকে উত্যক্ত অপমানিত ও কষ্ট প্রদানের জন্য শিশু কিশোর ও যুবকদেরকে তাঁর পিছনে লেলিয়ে দেয়া হল। ইত্যবসরে পথের দু'পাশ ভিড় জমে গেল। তারা হাত তালি, অশ্রাব্য অশ্লীল কথাবার্তা বলে তাঁকে গাল মন্দ দিতে ও পাথর ছুঁড়ে আঘাত করতে থাকল। আঘাতের ফলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পায়ের গোড়ালিতে ক্ষতের সৃষ্টি হয়ে পাদুকাদ্বয় রক্তাক্ত হয়ে গেল।

ত্বায়িফের হতভাগ্য কিশোর ও যুবকেরা যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করছিল তখন যায়দ বিন হারিসাহই তাঁকে (ﷺ) রক্ষার জন্য ঢালের মতো কাজ করছিলেন। ফলে তাঁর মাথার কয়েকটি স্থানে তিনি আঘাত প্রাপ্ত হন। এভাবে অমানবিক যুলম নির্যাতনের মধ্য দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পথ চলতে থাকেন এবং দুরাচার ত্বায়িফবাসীগণ তাদের এ অত্যাচার অব্যাহত

রাখে। আঘাতে আঘাতে জর্জ্জরিত রুধিরাক্ত কলেবরে পথ চলতে গিয়ে নাবী কারীম (ﷺ) খুবই ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত এক আঙ্গুর উদ্যানে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হন। বাগানটি ছিল রাবী'আহর পুত্র উতবাহ ও শায়বাহর। তিনি বাগানে প্রবেশ করলে দূরাচার ত্বায়িফবাসীগণ গৃহাভিমুখে ফিরে যায়।

এ বাগানটি ত্বায়িফ থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। বাগানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নাবী কারীম (ﷺ) আঙ্গুর গাছের ছায়ায় এক দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়লেন।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার ফলে কিছুটা সুস্থতা লাভের পর নাবী কারীম (ﷺ) আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাত তুলে দু'আ করলেন। তাঁর এ দু'আ 'দুর্বলদের দু'আ' নামে সুপ্রসিদ্ধ। তাঁর দু'আর এক একটি কথা থেকে এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে, ত্বায়িফবাসীগণের দুর্ব্যবহারে তিনি কতটা ক্ষুব্ধ এবং তারা ঈমান না আনার কারণে তিনি কতটা ব্যথিত হয়েছিলেন। তিনি দু'আ করলেন,

(اللهم إِلَيْكَ أَشْكُوْ ضَعْفَ قُوَّتِيْ، وَقِلَّةَ حِيْلَتِيْ، وَهَوَانِيْ عَلَى النَّاسِ، يَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ، أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ، وَأَنْتَ رَبِّيْ، إِلٰى مَنْ تَكِلُنِيْ؟ إِلٰى بَعِيْدٍ يَتَجَهَّمُنِيْ؟ أَمْ إِلٰى عَدُوٍّ مَلَّكْتَهُ أَمْرِيْ؟ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِيْ، وَلٰكِنْ عَافِيَتُكَ هِيْ أَوْسَعُ لِيْ، أَعُوْذُ بِنُوْرِ وَجْهِكَ الَّذِيْ أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ، وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنْ أَنْ تُنَزِّلَ بِيْ غَضَبَكَ، أَوْ يَحِلَّ عَلَيَّ سَخَطُكَ، لَكَ الْعُتْبٰى حَتّٰى تَرْضٰى، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ).

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার শক্তির দুর্বলতা, অসহায়ত্ব আর মানুষের নিকট স্বীয় মূল্যহীনতার অভিযোগ প্রকাশ করছি। ওহে দয়াময় দয়ালু,তুমি দুর্বলদের প্রতিপালক, তুমি আমারও প্রতিপালক, তুমি আমাকে কার নিকট অর্পণ করছো, যে আমার সঙ্গে রূঢ় আচরণ করবে, নাকি তুমি আমাকে এমন শত্রুর নিকট ন্যস্ত করছো যাকে তুমি আমার যাবতীয় বিষয়ের মালিক করেছ। যদি তুমি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হও তবে আমার কোন আফসোস নেই, তবে তোমার ক্ষমা আমার জন্য সম্প্রসারিত করো। আমি তোমার সেই নূরের আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যদ্দ্বারা অন্ধকার দূরীভূত হয়ে চতুর্দিক আলোয় উদ্ভাষিত হয়। দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় বিষয়াদি তোমার উপর ন্যস্ত। তুমি আমাকে অভিসম্পাত করবে কিংবা ধমক দিবে, তার থেকে তোমার সন্তুষ্টি আমার কাম্য। তোমার শক্তি ব্যতিরেকে অন্য কোন শক্তি নেই"।

এ দিকে রাবী'আহর পুত্রগণ যখন মহানাবী (ﷺ)-কে এমন এক দুরবস্থার মধ্যে নিপতিত অবস্থায় দেখতে পেল তখন তাদের মধ্যে গোত্রীয় চেতনা জাগ্রত হয়ে উঠল। আদাস নামক তাদের এক খ্রীষ্টান ক্রীতদাসের হাতে এক গোছা আঙ্গুর তারা নাবী কারীম (ﷺ)-এর নিকট পাঠিয়ে দিল। সেই ক্রীতদাসটি যখন আঙ্গুলের গোছাটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাতে তুলে দিতে চাইল তিনি তখন 'বিসমিল্লাহ' বলে হাত বাড়িয়ে তা গ্রহণ করলেন এবং খেতে আরম্ভ করলেন।

আদাস বলল, 'এমন কথা তো এ অঞ্চলের লোকদের মুখে কখনো শুনিনি? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, 'তুমি কোথায় থাক? তোমার ধর্ম কী?

সে বলল, ‘আমি খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী এবং নিনওয়ার বাসিন্দা।’
নাবী কারীম (ﷺ) বললেন, ‘ভাল, তাহলে সৎ ব্যক্তি ইউনুস বিন মাত্তার গ্রামে তুমি বাস কর, তাই না?
সে বলল, ‘আপনি ইউনুস বিন মাত্তাকে কিভাবে চিনলেন?’
রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, ‘তিনি আমার ভাই। তিনি নাবী ছিলেন এবং আমিও নাবী’’। এ কথা শুনে আদাস নাবী কারীম (ﷺ)-এর দিকে ঝুঁকে পড়ল এবং তাঁর মাথা ও হাত-পায়ে চুমু দিল।
এ ব্যাপারে দেখে রাবী’আহ পুত্রদ্বয় নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, ‘দেখ, দেখ, ঐ ব্যক্তি দেখছি শেষ পর্যন্ত আমাদের ক্রীতদাসকেও বিগড়িয়ে দিল।’
এর পর আদাস যখন তাদের নিকট ফিরে গেল তখন ভ্রাতৃদ্বয় তাকে বলল, ‘বলত দেখি ব্যাপারটি কী? ঐ ভদ্রলোক দেখছি তোমাকেও বিগড়িয়ে দিল।’
সে বলল, ‘হে আমার মনিব! এ ধরাধামে তাঁর চেয়ে উত্তম মানুষ আর কেউই নেই। তিনি আমাকে এমন এক কথা বলেছেন যা নাবী রাসূল ছাড়া অন্য কেউই জানে না।’
তারা দুজন বলল, ‘দেখ আদ্দাস, ঐ ব্যক্তি যেন তোমাকে তোমার ধর্ম থেকে ফিরিয়ে না দেয়। কারণ তোমার ধর্ম তার ধর্ম থেকে উত্তম।’
কিছুক্ষণ অবস্থানের পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বাগান থেকে বের হয়ে মক্কার পথে যাত্রা করেন। তার মিশনের বিফলতাজনিত চিন্তা ও দৈহিক যন্ত্রনার দাপটে হৃদয় মন ছিল অত্যন্ত ভারাক্রান্ত ও বিশ্রান্ত। এমন অবস্থার মধ্য দিয়ে তিনি যখন ‘কারনে মানাযেল’ নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন আল্লাহ রাববুল আলামীনের আদেশে জিবরাঈল (আঃ) সেখানে আগমন করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পর্বত নিয়ন্ত্রণকারী ফেরেশতামন্ডলী। আল্লাহর তরফ থেকে তাঁরা এ অভিপ্রায় নিয়ে এসেছিলেন যে, নাবী (ﷺ) যদি ইচ্ছা করেন তা হলে তারা দু’পাহাড়কে একত্রিত করে দূরাচার মক্কাবাসীকে পিশে মারবেন।
এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বুখারী শরীফে আয়িশাহ সিদ্দীকাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে তিনি একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আপনার জীবনে কি এমন কোনদিন এসেছে যা উহুদের দিন চাইতেও কঠিন ছিল?
তিনি উত্তরে বললেন, ‘হ্যাঁ’’, তোমার সম্প্রদায়ের নিকট থেকে আমাকে যে যে দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছে তার মধ্যে সব চাইতে কঠিন ছিল ঐ দিনটি যে দিন আমি ঘাঁটিতে বিচলিত ছিলাম, যখন আমি নিজেকে আবদে ইয়ালাইল বিন আবদে কুলালের পুত্রদের নিকট পেশ করেছিলাম। কিন্তু তারা আমার কথায় কর্ণপাত না করায় দুশ্চিন্তা ও ব্যথায় পরিশ্রান্ত হয়ে আমি নিজ পথে গমন করি। এভাবে চলতে চলতে ‘কারনে সায়ালেবে’ যখন এসে পৌঁছি তখন আমার চেতনা ফিরে আসে।

এ সময় আমার মনে কিছুটা স্বস্তিবোধের সৃষ্টি হয়। সেখানে আমি আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকাতেই দেখি যে, একখন্ড মেঘ আমাকে ছায়া দান করছে; ব্যাপারটি আরও ভালভাবে নিরীক্ষণ করলে বুঝতে পারি যে, এতে জিবরাঈল (আঃ) রয়েছেন। তিনি আমাকে আহবান জানিয়ে বলেন, 'আপনার সম্প্রদায় আপনাকে যা বলেছে এবং আপনার প্রতি যে আচরণ করেছে আল্লাহ তা'আলা সব কিছুই শুনেছেন এবং দেখেছেন। এখন তিনি পর্বত নিয়ন্ত্রণকারী ফিরিশতাগণকে আপনার খেদমতে প্রেরণ করেছেন। আপনি তাঁদের কে যা ইচ্ছা নির্দেশ প্রদান করুন। এরপর পর্বতের ফিরিশতা আমাকে সালাম জানিয়ে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ (ﷺ)! কথা এটাই, আপনি যদি চান যে এদেরকে আমি দু'পাহাড় একত্রিত করে পিষে মারি তাহলে তাই হবে।[3] নাবী কারীম (ﷺ) বললেন, 'না, বরং আমার আশা, মহান আল্লাহ এদের পৃষ্ঠদেশ হতে এমন বংশধর সৃষ্টি করবেন যারা একমাত্র তাঁর ইবাদত করবে এবং অন্য কাউকেও তাঁর অংশীদার ভাববে না।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ উত্তরে তাঁর অসাধারণ মানবত্ব প্রেমে সমুজ্জ্বল এক ব্যক্তিত্ব এবং ক্ষমাশীল অনুপম চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। সাত আসমানের উপর হতে আগত এই গায়েবী মদদের প্রস্তাব ও প্রতিশ্রুতি নিয়ে ফিরিশতাগণ যখন তাঁর খেদমতে উপস্থিত হন তখন তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্র যেন আরও মহিমান্বিত হয়ে ওঠে। নিজের দুঃখ কষ্ট ভুলে গিয়ে তিনি সুস্থির চিত্তে আল্লাহ তা'আলার দরবারে শুকরিয়া আদায় করতে থাকেন। এভাবে তাঁর মানসাকাশ থেকে চিন্তা ভাবনার মেঘ দূরীভূত হয়ে যায়।

তারপর তিনি মক্কা অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার পথে ওয়াদীয়ে নাখলায় অবস্থান করেন। এখানে দুটো জায়গা বসবাসের উপযোগী ছিল। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে আসসাইলুল কবীর এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে যায়মা। কেননা, সেখানে পানি ছিল কিছুটা সহজলভ্য এবং জায়গা দুটো ছিল শস্য শ্যামল। কিন্তু তিনি (ﷺ) এ দুটো জায়গার মধ্যে কোথায় অবস্থান করেছিলেন কোন সূত্র থেকেই তার সন্ধান পাওয়া যায় নি।

ওয়াদী নাখলায় তিনি যখন কয়েক দিনের জন্য অবস্থান করেছিলেন সে সময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকট জিনদের একটি দলকে প্রেরণ করেন যার উল্লে-খ কুরআন মাজীদের দুটো জায়গায় এসেছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে সূরাহ আল-আহক্বাফে এবং অন্যটি সূরাহ জিনে। সূরাহ আহক্বাফের আয়াতগুলো হচ্ছে,

(وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْا أَنصِتُوْا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلٰى قَوْمِهِم مُّنذِرِيْنَ قَالُوْا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْ إِلَى الْحَقِّ وَإِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللهِ وَآمِنُوْا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ)

[الأحقاف:29: 31]

"স্মরণ কর, যখন জিন্নদের একটি দলকে তোমার প্রতি ফিরিয়ে দিয়েছিলাম যারা কুরআন শুনছিল। তারা যখন সে স্থানে উপস্থিত হল, তখন তারা পরস্পরে বলল- চুপ করে শুন। পড়া

যখন শেষ হল তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল সতর্ককারীরূপে। ৩০. (ফিরে গিয়ে) তারা বলল- হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা একটি কিতাব (এর পাঠ) শুনেছি যা মূসার পরে অবতীর্ণ হয়েছে, তা পূর্বেকার কিতাবগুলোর সত্যতা প্রতিপন্ন করে, সত্যের দিকে আর সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করে। ৩১. হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহর দিকে আহবানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তার প্রতি ঈমান আন, আল্লাহ তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন আর তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক 'আযাব থেকে রক্ষা করবেন।' (আল-আহক্বাফ ৪৬ : ২৯-৩১)

قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوْا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً (1) يَهْدِيْ إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَداً (2) وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَداً (3) وَأَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطاً (4) وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُوْلَ الْأِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللهِ كَذِباً (5) وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْأِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقاً (6) وَأَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَداً (7) وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيْداً وَشُهُباً (8) وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَاباً رَصَداً (9) وَأَنَّا لا نَدْرِيْ أَشَرٌّ أُرِيْدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً (10) وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُوْنَ وَمِنَّا دُوْنَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَداً (11) وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَباً (12) وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلا يَخَافُ بَخْساً وَلا رَهَقاً (13) وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقَاسِطُوْنَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً (14) وَأَمَّا الْقَاسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَباً (15) [الجن: 1: 15].

'১. বল, 'আমার কাছে ওয়াহী করা হয়েছে যে, জিন্নদের একটি দল মনোযোগ দিয়ে (কুরআন) শুনেছে তারপর তারা বলেছে 'আমরা এক অতি আশ্চর্যজনক কুরআন শুনেছি ২. যা সত্য-সঠিক পথ প্রদর্শন করে, যার কারণে আমরা তাতে ঈমান এনেছি, আমরা কক্ষনো কাউকে আমাদের প্রতিপালকের অংশীদার গণ্য করব না। ৩. আর আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা অতি উচ্চ, তিনি গ্রহণ করেননি কোন স্ত্রী আর কোন সন্তান। ৪. আর আমাদের মধ্যেকার নির্বোধেরা তাঁর সম্পর্কে সীমাতিরিক্ত কথাবার্তা বলত। ৫. আর আমরা ধারণা করতাম যে, মানুষ ও জ্বিন আল্লাহ সম্পর্কে কক্ষনো মিথ্যে কথা বলবে না। ৬. কতিপয় মানুষ কিছু জ্বিনের আশ্রয় নিত, এর দ্বারা তারা জ্বিনদের গর্ব অহঙ্কার বাড়িয়ে দিয়েছে। ৭. (জ্বিনেরা বলেছিল) তোমরা (জ্বিনেরা) যেমন ধারণা করতে তেমনি মানুষেরা ধারণা করত যে, (মৃত্যুর পর) আল্লাহ কাউকে পুনরুত্থিত করবেন না। ৮. আর আমরা আকাশের খবর নিতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমরা সেটাকে পেলাম কঠোর প্রহরী বেষ্টিত ও জ্বলন্ত উল্কাপিন্ডে পরিপূর্ণ। ৯. আমরা (আগে) সংবাদ শুনার জন্য আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে বসতাম, কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে তার উপর নিক্ষেপের জন্য সে জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডকে লুকিয়ে থাকতে দেখে। ১০. আমরা জানি না (এই পরিবর্তিত অবস্থার মাধ্যমে)

পৃথিবীবাসীর অকল্যাণই চাওয়া হচ্ছে, না তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখাতে চান।

১১. আর আমাদের কিছু সংখ্যক সৎকর্মশীল, আর কতিপয় এমন নয়, আমরা ছিলাম বিভিন্ন মত ও পথে বিভক্ত। ১২. আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহকে পরাস্ত করতে পারব না, আর পালিয়েও তাঁকে অপারগ করতে পারব না। ১৩. আমরা যখন হিদায়াতের বাণী শুনতে পেলাম, তখন তার উপর ঈমান আনলাম। যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের উপর ঈমান আনে তার কোন ক্ষতি বা যুল্মের ভয় থাকবে না। ১৪. আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক (আল্লাহর প্রতি) আত্মসমর্পণকারী আর কিছু সংখ্যক অন্যায়কারী। যারা আত্মসমর্পণ করে তারা সঠিক পথ বেছে নিয়েছে। ১৫. আর যারা অন্যায়কারী তারা জাহান্নামের ইন্ধন।' (আল-জিন ৭২ : ১-১৫)

এ ঘটনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ এ আয়াতসমূহের প্রাসঙ্গিক আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে মহানাবী (ﷺ) জিনদের আগমনের কথা জানতেন না। আল্লাহ রাববুল আলামীন এ আয়াতের মাধ্যমে তাঁকে জিনদের আগমনের কথা অবহিত করেন এবং তখন তিনি তা জানতে পারেন। এ থেকে এও বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এটাই ছিল জিনদের প্রথম আগমন। বিভিন্ন হাদীস সূত্রে জানা যায় যে, এর পর থেকে নাবী কারীম (ﷺ)-এর দরবারে তাদের গমনাগমন চলতে থাকে।

জিনদের আগমন ও ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটি ছিল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে দ্বিতীয় সাহায্যমূলক ঘটনা যে সাহায্য তিনি করেছিলেন তাঁর অদৃশ্য ভান্ডার থেকে অদৃশ্য বাহিনী দ্বারা। এ ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া আর কারোরই অবগতি ছিল না। এ ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত যে সকল আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তাতে নাবী কারীম (ﷺ)-এর দাওয়াতের কামিয়াবির সুসংবাদ রয়েছে। অধিকন্তু, এটাও পরিস্কার হয়ে গিয়েছে যে, বিশ্বের কোন শক্তি তাঁর দাওয়াতের কার্যকারিতার পথে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে না। অতএব ইরশাদ হয়েছে,

(وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُوْنِهِ أَولِيَاء أُوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ) [الأحقاف:32]،

"আর যে আল্লাহর দিকে আহবানকারীর প্রতি সাড়া দিবে না, দুনিয়াতে সে আল্লাহকে ব্যর্থ করতে পারবে না, আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে নেই তার কোন সাহায্যকারী, পৃষ্ঠপোষক। তারা আছে সুস্পষ্ট গুমরাহীতে।' (আল-আহক্বাফ ৪৬ : ৩২)

(وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعجِزَ اللهَ فِي الأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا) [الجن:12].

"আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহকে পরাস্ত করতে পারব না, আর পালিয়েও তাঁকে অপারগ করতে পারব না।' (আল-জিন ৭২: ১২)

এ সাহায্য ও সুসংবাদের মাধ্যমে তাঁকে তাঁর যত প্রকারের চিন্তা-ভাবনা, দুঃখ-কষ্ট এবং নৈরাশ্য, ত্বায়িফবাসীদের গালি-গালাজ, চাটিমারা ও প্রস্তর নিক্ষেপের কালো মেঘ সব কিছুই মন থেকে মুছে গেল। তিনি সংকল্পবদ্ধ হলেন তাঁকে মক্কায় ফিরে যেতেই হবে এবং নতুনভাবে ইসলামের দাওয়াত ও নবুওয়াতের তাবলীগ পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ করতে হবে। এটা ছিল ঐ সময়ের কথা যখন যায়দ বিন হারিসাহ (রাঃ) তাঁকে বলেছিলেন, 'মক্কাবাসীগণ অর্থাৎ কুরাইশগণ যে অবস্থায় আপনাকে মক্কা থেকে বিতাড়িত করেছে সে অবস্থায় কিভাবে আপনি মক্কা প্রত্যাবর্তন করবেন?' উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'হে যায়দ! তুমি যে অবস্থা দেখছ এর একটা সুরাহা অবশ্যই হবে এবং আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই এ থেকে পরিত্রাণের একটি পথ বের করে দেবেন। তাঁর মনোনীত দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে তিনি অবশ্যই সাহায্য করবেন এবং নিজ নাবী (ﷺ)-কে জয়ী করবেন।

নাবী কারীম (ﷺ) শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে যাত্রা করলেন এবং মক্কার নিকটবর্তী হেরা পর্বতের পাদদেশে অবস্থান করলেন। তারপর খুযা'আহ গোত্রের একজন লোক মারফত আখনাস বিন শারীক্বের নিকট সংবাদ পাঠালেন যে তিনি যেন নাবী কারীম (ﷺ)-কে আশ্রয় প্রদান করেন। কিন্তু আখনাস এই বলে আপত্তি করলেন যে, কুরাইশরা হচ্ছেন তাঁর মিত্র। কাজেই তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে আশ্রয় প্রদান তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

এরপর তিনি সুহায়েল বিন 'আমর এর নিকট ঐ একই অনুরোধ বার্তা প্রেরণ করলেন। কিন্তু তিনিও এ কথা বলে আপত্তি জানালেন যে, বণী আমেরের আশ্রয় দেয়া বনু কা'বের জন্য (সঙ্গত) হয় না। অতঃপর নাবী সাঃ মুত্ব'ঈম বিন আদির নিকট বার্তা প্রেরণ করলেন। মুত্ব'ঈম বললেন, হাঁ, অতঃপর অস্ত্র সজ্জিত হয়ে নিজ পুত্রগণ এবং সম্প্রদায়কে ডাকলেন এবং বললেন, তোমরা অস্ত্রসজ্জিত হয়ে ক্বাবা'হ ঘরের নিকটে একত্রিত হয়ে যাও, কেননা আমি মুহাম্মাদ সাঃ-কে আশ্রয় দিয়ে দিয়েছি। অতঃপর মুত্বঈম নাবী কারীম (ﷺ)-এর নিকট খবর পাঠালেন মক্কায় আগমনের জন্য। তিনি খবর পেয়ে যায়িদ বিন হারিসাহকে সঙ্গে নিয়ে মক্কায় আগমন করে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করেন। এরপর মুত্ব'ঈম বিন আদী আগমন করে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করেন। এরপর মুত্ব'ঈম বিন আদী আপন বাহনের উপর দৌড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে, 'হে কুরাইশগণ, আমি মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে আশ্রয় প্রদান করেছি, কেউ যেন তাঁকে আর অনর্থক হয়রান না করে।'

এ দিকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সোজা হাজরে আসওয়াদের নিকট গিয়ে তা চুম্বন করেন। তারপর দু'রাকায়াত সালাত আদায় করেন এবং অস্ত্রসজ্জিত মুত্ব'ঈম বিন আদী ও তাঁর লোকজন পরিবেষ্টিত হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। বলা হয়, এ সময় আবূ জাহল মুত্ব'ঈমকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তুমি মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে আশ্রয় দিয়েছ না মুসলিমগণের অনুসারী হয়ে গিয়েছ?' উত্তরে মুত্ব'ঈম বলেছিলেন, 'আমি তাঁকে আশ্রয় দিয়েছি।' এর উত্তরে আবূ জাহল বলেছিল, 'তুমি যাঁকে আশ্রয় দিয়েছ, আমিও তাঁকে আশ্রয় দিলাম''।

মুত্ব’ঈম বিন আদির সৌজন্য ও সহৃদয়তার কথা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কখনও ভুলেন নি। যখন বদরের যুদ্ধে মক্কার কাফেরদের একটি দল বন্দী হয়ে আসে এবং কোন বন্দীর মুক্তির জন্য জুবায়ের বিন মুত্ব’ঈম নাবীজী (ﷺ)-এর দরবারে আগমন করেন তখন তিনি বললেন,

(لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِيْ فِيْ هٰؤُلَاءِ النَّتْنٰى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ)

অর্থঃ যদি মুত্ব’ঈম বিন আদী জীবিত থাকত এবং এই দুর্গন্ধময় মানুষগুলোর জন্য সুপারিশ করত তাহলে তাঁর খাতিরে ওদেরকে ছেড়ে দিতাম।

ব্যক্তি এবং গোষ্ঠিকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান

নবুওয়াতের দশম বর্ষের যুল ক্বা’দাহ মাসে (৬১৯ খ্রীষ্টাব্দের জুনের শেষ কিংবা জুলাইয়ের প্রথম ভাগে) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ত্বায়িফ থেকে মক্কা প্রত্যাবর্তন করেন এবং পুনরায় নতুনভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠি এবং ব্যক্তিদের দাওয়াত দেয়া আরম্ভ করেন। যেহেতু তখন সময়টা ছিল হজ্জ্ব মৌসুমের কাছাকাছি সেহেতু নিকটবর্তী এবং দূরবর্তী বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজনেরা পদব্রজে ও যানবাহনে হজ্জ্ব পালনের জন্য মক্কা শরীফে আসতে আরম্ভ করেছিলেন। নাবী কারীম (ﷺ) এই সময়টাকে দাওয়াত দানের জন্য বেশ উপযোগী মনে করে এক এক গোত্রের নিকট গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন যা তিনি নবুওয়াতের ৪র্থ বছর থেকে করে আসছিলেন। অধিকন্তু তিনি (ﷺ) এই দশম বছর থেকে লোকেদেরকে তাঁকে সাহায্য-সহযোগীতা করা, আশ্রয় কামনার সাথে সাথে আল্লাহ তা’আলা প্রদত্ত রিসালাতের বাণী প্রচার করতে থাকেন।

ইমাম যুহরী (রঃ) বলেছেন, নাবী কারীম (ﷺ) যে যে গোত্রের নিকট গিয়ে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন তাদের মধ্যে নিম্নের গোত্রগুলোর কথা আমাকে বলা হয়েছে। গোত্রগুলো হচ্ছে যথাক্রমেঃ

বনু ‘আমির বিন সা’সাআহ, মহারেব বিন খাসফাহ, ফাযারাহ, গাসসান, মুররাহ, হানিফাহ, সালীম, আবস, বনু নাসর, বনু বকা, কালব, হারিস বিন কা‘ব, আযরাহ ও হাযারেমা। কিন্তু এদের কেউই ইসলাম গ্রহণ করেন নি।

প্রকাশ থাকে যে, ইমাম যুহরী যে সকল গোত্রের কথা উল্লে-খ করেছেন তাদের সকলের নিকট একই বছর অথবা একই হজ্জের মৌসুমে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়নি। বরং নবুওয়াতের ৪র্থ বছর থেকে আরম্ভ করে হিজরতের পূর্বের শেষ হজ্জ্ব মৌসুম পর্যন্ত দশ বৎসর সময়ের মধ্যে এ দাওয়াত পেশ করেছিলেন কোন নির্দিষ্ট গোত্রের দাওয়াত পৌছানোর ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন সময় নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে এর অধিকাংশ ছিল দশম সনে।

ইবনে ইসহাক্ব কোন কোন গোত্রের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করা এবং তাদের উত্তরের অবস্থা, রকম, ধরণ ইত্যাদি সম্পর্কে যে বর্ণনা প্রদান করেছেন নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত সার প্রদান করা হলঃ

১. বনু কালবঃ নাবী কারীম (ﷺ) বনু কালব এর একটি শাখা বনু আব্দুল্লাহর নিকটে ইসলামের দাওয়াত গ্রহণের আহবান জানিয়ে নিজেকে তাদের সম্মুখে পেশ করেন। আলাপ আলোচনা সূত্রে তিনি তাদের বলেন, 'হে বনু আব্দুল্লাহ, আল্লাহ তোমাদের পূর্ব পুরুষদের যথেষ্ট অনুগ্রহ করেছেন এবং মর্যাদা দিয়েছেন। তোমাদের উচিত আল্লাহর এ আহবানে সাড়া দেয়া। কিন্তু এ গোত্র তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করেন নি।

২. বনু হানীফাঃ নাবী কারীম (ﷺ) তাদের তাঁবুতে গিয়ে তাদেরকে আল্লাহর আহবান জানিয়ে নিজেকে তাদের সামনে পেশ করেন। কিন্তু তারা এমন অশ্রাব্য উত্তর প্রদান করে যা আরবের অন্য কেউই প্রদান করেনি।

৩. আমির বিন সা'সা'আহঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ গোত্রের লোকজনদেরও আল্লাহর পথে আহবান জানিয়ে নিজেকে তাদের সামনে পেশ করেন। উত্তরে এ গোত্রের বাইহারাহ বিন ফিরাস নামক একটি লোক বলে যে, 'আল্লাহর কসম! যদি আমি কুরাইশদের এ যুবককে গ্রহণ করি তবে তাঁর দ্বারা সমগ্র আরবকে খেয়ে ফেলব।' আবার সে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা বলুন, যদি আমরা আপনার নিকট আপনার এ ধর্মের উপর অনুগত্য স্বীকার করি এবং আল্লাহ আপনাকে বিপক্ষবাদীদের উপর জয়ী করেন তবে আপনার পরে নেতৃত্বের দায়িত্ব কি আমাদের উপর অর্পিত হবে?'

উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, 'নেতৃত্বের চাবি কাঠিতো আল্লাহর হাতে। যেখানে ইচ্ছা সেখানে তিনি নেতৃত্বের স্তম্ভ স্থাপিত করবেন।'

লোকটি বলল, 'ভাল, আপনার রক্ষণাবেক্ষণে আমাদের বক্ষ আপনার প্রতিপক্ষ আরবদের নিশানায় থাকবে, কিন্তু আল্লাহ যখন আপনাকে জয়ী করবেন তখন কর্তৃত্বের চাবিকাঠি অন্য কারও হাতে থাকবে এটা কখনই হতে পারে না। কাজেই আপনার ধর্মের আমাদের কোন প্রয়োজনই নেই।' মোট কথা তারা তাঁকে অস্বীকার করল।

এর পর যখন বনু 'আমির গোত্রের লোকজনেরা নিজ অঞ্চলে ফিরে গিয়ে এক বৃদ্ধকে যিনি বার্ধক্যের কারণে হজ্জ্ব গমনে সক্ষম হন নি সমস্ত ঘটনা শুনালো এবং বলল যে, 'আমাদের নিকট কুরাইশ খানদানের বনু আব্দুল মুত্তালিবের এক যুবক এসেছিল। তার ধারণা যে, সে আল্লাহর নাবী। সে দাওয়াত দিল যে, আমরা ইসলাম গ্রহণ করে যেন তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করি এবং আমাদের অঞ্চলে তাঁকে নিয়ে আসি।'

এ কথা শ্রবণে বৃদ্ধ লোকটি দু'হাত দিয়ে মাথা ধরে ফেলল এবং বলল, 'হে বন্ধু 'আমির! এখন কি এ ভুল সংশোধনের কোন পথ আছে? আর যা হস্তচ্যুত হয়েছে তার কি অনুসন্ধান করা যেতে পারে? সে সত্ত্বার শপথ! যাঁর হাতে উমুকের প্রাণ আছে ইসমাঈল (আঃ)-এর গোত্রের কারও পক্ষে এ (নবুওয়াতের) মিথ্যা দাবী করা সম্ভব নয়। তিনি অবশ্যই সত্য নাবী। তোমাদের বুদ্ধি-সুদ্ধি কি লোপ পেয়েছিল?

ঈমানের শিখা মক্কার বাইরে

যেভাবে মহানাবী (ﷺ) গোত্র ও দলসমূহকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন তেমনভাবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকেও ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন।

এর মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির নিকট থেকে ভাল সাড়া পাওয়া যায়। অধিকন্তু হজ্বে এ মৌসুমের কিছুদিন পর কয়েক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন। নিম্নে তাঁদের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি লিপিবদ্ধ করা হল:

১. সুওয়াইদ বিন সামিতঃ তিনি কবি, গভীর জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী এবং মদীনার অধিবাসী ছিলেন। তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধির পরিপক্কতা, অভিজ্ঞতা, কাব্যচর্চা, সামাজিক মর্যাদা এবং বংশমর্যাদার কারণে জাতি তাঁকে 'কামিল' উপাধিতে ভূষিত করেন। হজ্ব এবং ওমরা করার উদ্দেশ্যে তিনি মক্কায় আগমন করলে নাবী কারীম (ﷺ) তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দেন। এতে তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে লক্ষ্য করে বলেন, 'আমার নিকট যে জিনিস রয়েছে সম্ভবতঃ আপনার নিকটও সে জিনিস রয়েছে। উত্তরে নাবী কারীম (ﷺ) বললেন 'আপনার নিকট কী কী জিনিস রয়েছে।' সুওয়াইদ বললেন, 'হিকমতে লোকমান।' রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, 'তা নিয়ে এসো' এবং তিনি তা নিয়ে এলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, 'অবশ্যই একথা ভাল। কিন্তু আমার কাছে যা আছে তা এ থেকেও উত্তম এবং তা হচ্ছে আসমানী গ্রন্থ আলকুরআন যা আল্লাহ আমার উপর অবতীর্ণ করেছেন। তা হেদায়েত ও জ্যোতি।' এর পর নাবী কারীম (ﷺ) তাকে কুরআন পাঠ করে শোনালেন এবং ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং বললেন, 'এতো খুব ভালো কথা। তারপর তাঁর মদীনা প্রত্যাবর্তনের পর পরই বু'আসের যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায় এবং সে যুদ্ধে তাঁকে হত্যা করা হয়।নবুওয়াতের একাদশ বর্ষের প্রথম ভাগে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।মু'আয

২. ইয়াস বিন মু'আয : তিনিও মদীনার অধিবাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন নব্য যুবক। নবুওয়াতের একাদশ বর্ষে বুআ-সের যুদ্ধের কিছু পূর্বে আউস গোত্রের একটি দল খাযরাজ গোত্রের বিরুদ্ধে কুরাইশদের মিত্রতা ও সহায়তা লাভের সন্ধানে মক্কা আগমন করেন। ইয়াস বিন মু'আযও সে দলের সঙ্গে এসেছিলেন। সে সময় ইয়াসরাবে আউস ও খাযরাজ এ উভয় গোত্রের মধ্যে যুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে। যুদ্ধে আউসদের তুলনায় খাযরাজদের সংখ্যাধিক্য ছিল। আউসদের মক্কা আগমনের কথা অবগত হয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁদের নিকট গেলেন এবং যুদ্ধের বিভীষিকা ও ক্ষয় ক্ষতির কথা ভেবে তাদের লক্ষ্য করে তিনি বললেন, 'আপনারা যে উদ্দেশ্যে আগমন করেছেন তার চাইতেও কি উত্তম বস্তু গ্রহণ করতে পারেন?''

তাঁরা বললেন, 'তা কী জিনিস?'

উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ রাববুল আলামীন আমাকে নিজ বান্দার নিকট এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন যে, আমি যেন তাঁদের এ কথার দাওয়াত দেই যে, তোমরা

আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কাউকেও শরীক করবে না। আল্লাহ আমার উপর কিতাবও অবতীর্ণ করেছেন। ইসলাম সম্পর্কে তিনি আরও কিছু আলাপ আলোচনা করলেন এবং কুরআন মাজীদের কিয়দংশ পাঠ করে শোনালেন।

ইয়াস বললেন, 'হে আমার গোত্রীয় ভাইয়েরা, আল্লাহর শপথ তোমরা যে জন্য আগমন করেছ, এ হচ্ছে তার তাইতে অনেক বেশী উত্তম।' কিন্তু দলের একজন সদস্য আবুল হায়সার আনাস বিন রাফি' এক মুষ্টি কঙ্কর উঠিয়ে ইয়াসের মুখে মারল এবং বলল, 'এ কথা ছাড়। আমার বয়সের শপথ! আমরা এ স্থানে অন্য উদ্দেশ্যে আগমন করেছি।' এ কথা শোনার পর ইয়াস নীরবতা অলম্বন করল। নাবী কারীম (ﷺ)-ও সেখান থেকে উঠে চলে গেলেন। দলটি কুরাইশদের সঙ্গে মিত্রতা ও সহায়তা চুক্তি সম্পাদনে সক্ষম হয় নি, তারপর এক রাশ নৈরাশ্য নিয়ে তারা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে।

মদিনায় প্রত্যাবর্তনের অল্প দিন পরেই ইয়াস মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর সময় তিনি তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ), তাকবীর (আল্লাহ আকবর), হামদ ও তাসবীহ জপতে ছিলেন। এ কারণে অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁর মৃত্যু ইসলামের ঈমানের উপর হয়েছিল।

৩. আবূ যার গিফারী : তিনি ইয়াসরিবে বসবাস করতেন। যখন সুওয়াইদ বিন সামিত ও ইয়াস বিন মু'আয মারফরত রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আবির্ভাবের কথা তিনি শ্রবণ করলেন তখন তাঁর কর্ণকুহরে তিনি প্রচন্ড একটি ধাক্কার মতো অবস্থা অনুভব করলেন এবং সেটাই তাঁর ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়ে দাঁড়াল।

তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনা মতে আবূ যার (রাঃ) বলেছেন, 'আমি ছিলাম গেফার গোত্রের একজন লোক। আমি জানতে পারলাম যে, মক্কায় এমন একজন লোকের আবির্ভাব হয়েছে যিনি নিজেকে নাবী বলে দাবী করছেন। আমি আপন ভাইকে বললাম তুমি লোকটির নিকট গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বল এবং খবর নিয়ে এসো। সে সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর ফিরে এলো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কী খবর এনেছ? সে বলল, 'আল্লাহর কসম! আমি এমন মানুষ দেখেছি যিনি ভালোর জন্য আদেশ এবং মন্দের জন্য নিষেধ করছেন। আমি বললাম, তুমি সন্তোষজনক উত্তর দিলে না। শেষ পর্যন্ত আমি নিজেই কাঁধে খাদ্যের ঝুলি এবং হাতে লাঠি নিয়ে মক্কার পথে যাত্রা করলাম। সেখানে পৌঁছে গেলাম, কিন্তু তাঁকে (ﷺ) চিনতাম না এবং তাঁর (ﷺ) সম্পর্কে কাউকেও জিজ্ঞেস করব তাও সাহস পাচ্ছিলাম না।

ফলে আমি যমযমের পানি পান করতাম এবং মসজিদুল হারামে পড়ে থাকতাম। শেষ পর্যন্ত আমার নিকট দিয়ে আলী (রাঃ) পথ অতিক্রম করছিলেন। তিনি বললেন, 'লোকটিকে অপরিচিত মনে হচ্ছে।' আমি বললাম, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'ভালো কথা, আমার বাসায় চলুন।' আমি তাঁর সঙ্গে চললাম। তাঁর সঙ্গে নেহাৎই মামুলি গোছের কিছু কথাবার্তা হল। তিনি আমাকে কিছু

জিজ্ঞাসা করলেন না। যে উদ্দেশ্যে আমার আগমন সে সম্পর্কে আমিও তাঁকে তেমন কিছু বললাম না। এভাবে রাত্রি অতিবাহিত হল।

সকাল হতে না হতেই আমি এ উদ্দেশ্যে মসজিদুল হারামে গেলাম যে, সেখানে নাবী (ﷺ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করব। কিন্তু সেখানে এমন কেউ ছিল না যিনি তাঁর সম্পর্কে কিছু বলবেন। শেষ পর্যন্ত দেখলাম আবারও আলী (রাঃ) সেখান দিয়ে যাচ্ছেন। আমাকে দেখে তিনি কিছুটা যেন নিজে নিজেই বললেন, 'এ লোক তো দেখছি এখনো তাঁর ঠিকানা জানতে পারেন নি।'

আমি বললাম, 'জী না''। তিনি বললেন, 'ভালো, আপনি আমার সঙ্গে চলুন।' এক পর্যায়ে তিনি আমাকে বললেন, 'আচ্ছা বলুন তো আপনার ব্যাপারটি কী? কি উদ্দেশ্যে আপনি এ শহরে এসেছেন?'

আমি বললাম, 'আমার আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমি যা বলব আপনি যতি তা গোপন রাখেন তাহলে আমি বলব?'

তিনি বললেন, 'ঠিক আছে আমি তাই করব।'

এ প্রেক্ষিতে আমি বললাম, 'আমি জানতে পেরেছি যে, এখানে এক ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে যিনি নিজেকে আল্লাহর নাবী বলে দাবী করছেন। আমি আমার ভাইকে পাঠিয়েছিলাম এ ব্যাপারে খোঁজ খবর নিয়ে কথাবার্তা বলার জন্য, কিন্তু সে ফিরে গিয়ে সন্তোষজনক কোন কিছুই বলতে সক্ষম হয় নি। এ জন্য আমি ভাবলাম যে, নিজে গিয়েই সাক্ষাৎ করে কথাবার্তা বলে আসি।

আলী (রাঃ) বললেন, 'ভাই তুমি সঠিক জায়গাতেই পৌঁছেছ। দেখ আমার যাত্রা তাঁর দিকেই। আমি যেখানে প্রবেশ করব তুমিও সেখানে প্রবেশ করবে। আর যদি এমন কোন লোক দেখি যে, তোমার জন্য বিপজ্জনক হতে পারে তাহলে আমি তখন কোন প্রাচীরের গায়ে এমনভাবে থাকব যাতে মনে হবে যেন আমি আমার জুতো ঠিক করছি। তুমি কিন্তু তখন পথ চলতেই থাকবে।'

এরপর আলী (রাঃ) যাত্রা শুরু করলেন। আমিও তাঁকে অনুসরণ করলাম। তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার নিকট ইসলাম পেশ করুন।' হৃদয়স্পর্শী ভাব ও ভাষার মাধ্যমে তিনি আমার নিকট ইসলামের মূল বক্তব্য পেশ করলেন। বিষয় ও বক্তব্যে অভিভূত হয়ে আমি তখনই ইসলাম গ্রহণ করলাম। তারপর তিনি আমাকে বললেন, 'হে আবূ যার, এ ব্যাপারটি গোপন রাখো এবং নিজ এলাকায় চলে যাও। যখন আমার বিজয়ের সংবাদ অবগত হবে তখন চলে আসবে। আমি বললাম, 'ঐ মহান সত্ত্বার শপথ! যিনি আপনাকে সত্যের বাণী বাহক হিসেবে প্রেরণ করেছেন, আমি তাদের মধ্যে উচ্চ কণ্ঠে এ সত্য প্রচার করব।'

এরপর আমি মসজিদুল হারামে এলাম। কুরাইশ গোত্রের কিছু সংখ্যক লোকজন সেখানে উপস্থিত ছিল। আমি তাদের লক্ষ্য করে বললাম,

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

অর্থঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল।

আমার মুখ থেকে তাওহীদের বাণী শ্রবণ করা মাত্র কুরাইশগণ বললো, এ লোককে শায়েস্তা করো। ফলে তারা এমনভাবে আমাকে মারপিট শুরু করল যেন, আমি মরে যাই। এমন এক বিপর্যয়ের মধ্যে নিপতিত অবস্থা থেকে আমাকে উদ্ধার করলেন আব্বাস (রাঃ)। জনতার ভিড়ের মধ্যখানে উঁকি দিয়ে তিনি আমাকে দেখতে পেলেন এবং কুরাইশদের লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমরা ধ্বংস হও! তোমরা গেফার গোত্রের একজন লোককে মারপিট করছ অথচ তোমাদের সফর ও ব্যবসার জন্য যাতায়াতের পথই হচ্ছে গেফার গোত্রের মধ্য দিয়ে। এ কথা শ্রবণের পর তারা আমাকে ছেড়ে দিয়ে সেখান থেকে সরে পড়ল।

দ্বিতীয় দিন সকাল হলে আমি আবারও সেখানে গেলাম এবং গতকাল যা বলেছিলাম আজও তা বললাম। অর্থাৎ উচ্চ কণ্ঠে উচ্চারণ করলাম তাওহিদ বাণী 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ও আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ও রাসূলুহু।' আমার উচ্চারিত কালেমা শাহাদাত শ্রবণের পর গতকালের মতই তারা আমাকে মারপিট শুরু করল। আজও আব্বাস (রাঃ) ওদের হাত থেকে উদ্ধার করলেন। তিনি আমার প্রতি ঝুঁকে পড়ে কুরাইশদের লক্ষ্য করে আবারও সেই কথাগুলো বললেন যা বলেছিলেন গতকাল।[5]

৪. তুফাইল বিন 'আমর দাওসীঃ তিনি দাওস গোত্রের নেতা ছিলেন। তিনি ছিলেন কবি এবং একজন শরীফ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিত্ব। তাঁর গোত্রের কোন কোন সদস্য ইয়ামেনের কোন কোন অঞ্চলে রাজত্ব করত। তিনি নবুওয়াতের একাদশ বর্ষে মক্কা গমন করেন। সেখানে উপনীত হলে পূর্বাহ্নে মক্কাবাসী কাফেরগণ তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায় এবং সম্মান প্রদর্শন করে। এরপর তাঁর নিকট এ বলে আরয করে যে, 'হে সম্মানিত মেহমান তুফাইল! আমাদের শহরে আগমনে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। কিন্তু একটি লোকের কারণে আমাদের সব আনন্দ নিরানন্দে পর্যবসিত হচ্ছে। সে নানা ধরণের নতুন নতুন কথাবার্তা বলে আমাদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে, আমাদের একতা বিনষ্ট করেছে এবং শৃঙ্খলা ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে। তাঁর কথাবার্তা অনেকের উপর যাদুর মতো প্রভাব বিস্তার করছে, সে পিতা-পুত্র, ভাই-ভাই এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও ভাঙ্গন ধরিয়ে দিচ্ছে। আমাদের ভয় হচ্ছে, আমরা যে বিপদে পড়েছি আপনি এবং আপনার সম্প্রদায় যেন অনুরূপ বিপদে না পড়েন। অতএব আপনি অবশ্যই তাঁর সঙ্গে কোন কথাবার্তা বললেন না, কিংবা তাঁর কোন কথাও শুনবেন না।'

তুফাইল যেভাবে বিষয়টি বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছে, 'তাঁরা আমাকে বরাবর বুঝতে থাকল। এবং এ প্রেক্ষিতে আমি সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, আমি তাঁর কোন কথা শ্রবণ করব না, তাঁর সঙ্গে কোনরূপ কথাবার্তাও বলব না। এমন কি আমি যখন মসজিদুল হারামে গেলাম তখন কানের ভিতরে খানিকটা তুলো প্রবেশ করিয়ে নিলাম যাতে তাঁর কোন কথা আমাদের কর্ণগোচর না হয়।

কিন্তু খুব সম্ভব আল্লাহর ইচ্ছা হয়তো তা ছিল না। হয়তো এটাই আল্লাহর ইচ্ছা ছিল যে, তাঁর কথা আমাকে শুনতে হবে। ফলে খুব ভালভাবেই আমি তাঁর কথাবার্তা শুনতে পেলাম। তারপর আমি মনে মনে বললাম হায়! আমার সর্বনাশ হোক! আমি তো খোদার কৃপায় একজন বুদ্ধিমান মানুষ এবং কবি। আমার নিকট ভালোমন্দ গোপন থাকবে না, তবে কেন আমি সে ব্যক্তির কথা শুনব না? যদি তাঁর কথাবার্তা ভালো হয় তা গ্রহণ করে নিব, যদি মন্দ হয় ছেড়ে দিব। এ সব কিছু চিন্তা ভাবনা করে আমি থেমে গেলাম এবং যখন তিনি বাসায় ফেরার জন্য পথ ধরলেন তখন আমিও তাঁর পিছনে চললাম।

পথ চলতে চলতে গিয়ে তিনি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। তাঁকে অনুসরণ করে আমিও প্রবেশ করলাম এবং আমার আগমনের উদ্দেশ্য, কুরাইশগণের আমাকে ভয় দেখানো, তাঁর কথাবার্তা না শোনার জন্য শ্রবণ পথে তুলা দিয়ে রাখা, তা সত্ত্বেও তাঁর কথাবার্তা শ্রবণ করা ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে তাঁর কাছে বর্ণনা করলাম। তারপর বললাম, 'আপনার বক্তব্য এখন পেশ করুন।' তিনি আমার নিকট ইসলামের কথা পেশ করলেন এবং কুরআন মাজীদ থেকে কিছু অংশ পাঠ করে শোনালেন। আল্লাহ তা'আলা সাক্ষী আছেন। এর চাইতে উত্তম কথা এবং ইনসাফের বাণী ইতোপূর্বে আমি আর কখনো শ্রবণ করিনি। কুরআনুল মাজীদের বাণী এবং তাঁর বক্তব্যের স্নিগ্ধতায় মুগ্ধ হয়ে আমি তখনই ইসলাম গ্রহণ করলাম এবং কালেমা শাহাদাত উচ্চারণ করে সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করলাম। তারপর এ কথা বলে তাঁর নিকট আরয করলাম যে, 'আমার সম্প্রদায় আমার কথা মান্য করে। আমি তাদের নিকট ফিরে গিয়ে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করব। অতএব, আপনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করবেন যেন তিনি অনুগ্রহ করে আমাকে কোন নিদর্শন প্রদান করেন।' এ কথা শ্রবণের পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আল্লাহর সমীপে দু'আ করলেন।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দু'আর বরকতে তুফাইলকে যে নিদর্শন দেয়া হয়েছিল তা ছিল, যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হলেন তখন তাঁর মুখমণ্ডল ছিল প্রদীপের আলোর মতো আলোকোজ্জ্বল। কিন্তু তাঁর মানসিক কিংবা অন্য কোন অসুবিধার প্রেক্ষিতে তিনি আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলেন, 'হে আল্লাহ মুখমণ্ডলের পরিবর্তে অন্য কোন স্থানে এ নিদর্শন প্রকাশিত হোক। আমার ভয় হয় মানুষ তাকে বিকৃত বলবে। ফলে এ জ্যোতি তাঁর লাঠিতে প্রত্যাবর্তিত হয়েছিল। এরপর তিনি তাঁর পিতা এবং স্ত্রীকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন এবং উভয়েই তা গ্রহণ করে মুসলিম হয়ে যান। কিন্তু তাঁর সম্প্রদায়ের অন্যান্য লোকেরা ইসলাম গ্রহণে যথেষ্ট বিলম্ব করেন। অবশ্য এ ব্যাপারে তিনি অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। এর ফলে দেখা যায় যখন তিনি খন্দকের যুদ্ধের পর[6] হিযরত করেন তখন তাঁর সঙ্গে তাঁর সম্প্রদায়ের ৭০টি থেকে ৮০টি গোত্রের লোক ছিল। তুফাইল (রাঃ) ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী সাধন করে ইয়ামামার যদ্ধে শহীদ হন।

৫. যিমাদ আযদীঃ তিনি ছিলেন ইয়ামানের অধিবাসী এবং আযদে শানুওয়াহ গোত্রের এক ব্যক্তি। তাঁর কাজ ছিল মানুষের অসুখ বিসুখের ক্ষেত্রে ঝাড় ফুঁক করা এবং প্রেতাত্মা দূরীভূত করা। মক্কায় আগমনের পর ইসলামের শত্রুদের পক্ষ থেকে পরস্পর অবগত হলেন যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) একজন পাগল। তারা তাঁকে তাঁর নিকট যাওয়ার জন্য পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তিনি এ ভেবে চিন্তে তাঁর নিকট যাওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আল্লাহ যদি চান তাহলে তিনি তাঁর হাতে সুস্থ হতেও পারেন। কাজেই তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, 'আমি প্রেতাত্মা ভালো করার জন্য ঝাড়ফুঁক করে থাকি। আপনার কি সেরূপ কোন প্রয়োজন আছে।' উত্তরে তিনি বললেন,

(إِنَّ الْحَمْدَ للهِ، نَحْمَدُهُ" وَنَسْتَعِيْنُه"، مَن يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه"، وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلاَ هَادِيَ لَه"، وأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَه" لاَ شَرِيْكَ لَه"، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه" وَرَسُوْلُه". أَمَّا بَعْدُ)

অর্থঃ অবশ্যই সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি এবং তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি। যাকে আল্লাহ সৎপথ দেখান তিনি পথভ্রষ্ট হন না এবং যাকে তিনি বিপথে চালিত করেন তাকে কেউই সৎপথে চালিত করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনই ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনই অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল এবং বান্দা।

তারপর যেমাদ বললেন, আপনার কথাগুলো পুনরায় বলুন, আমি শুনি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পুনরায় একাদিক্রমে তিন বার অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন। এ কথা শ্রবণে ভাবগদগদ কণ্ঠে যিমাদ বললেন, 'আমি জ্যোতিষ, যাদুকর এবং কবিদের কথাবার্তা শুনেছি কিন্তু আপনার কথার মতো এত চিত্তোদ্দীপক ও হৃদয়স্পর্শী কথাবার্তা কখনই শুনিনি। গভীরতম সমুদ্রের তলদেশে আলোড়ন সৃষ্টিকারী মহা প্রবাহের মতো এ আমার অন্তরের গভীরতম প্রদেশকে ভাব ও আবেগ আন্দোলিত এবং উচ্ছ্বসিত করে তুলছে।'

তারপর তিনি নাবী কারীম (ﷺ)-এর দিকে অত্যন্ত ভক্তিভরে হাত বাড়িয়ে কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'হে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)! আপনি এ হাত গ্রহণ করে ইসলামের প্রতি আমার আনুগত্যের অঙ্গীকার গ্রহণ করুন। যেয়াদ এভাবে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করলেন

ইয়াসরিবের (মদীনার) ছয়টি পূণ্যবান আত্মা

একাদশ নবুওয়াত বর্ষে (জুলাই ৬২৩ খৃষ্টাব্দে) হজ্জের মৌসুম ফিরে এলো। ইসলামী দাওয়াতের কয়েকটি কার্যকরী বীজ হস্তগত হল যা দেখতে দেখতে বিরাট বৃক্ষে পরিণত হল। এর ঘন শাখা-প্রশাখা ও পত্র পল্ল-বের সুশীতল ছায়ায় বসে মুসলিমগণ বহু বছরের অন্যায় অত্যাচার ও উৎপীড়নের উত্তাপ থেকে কিছুটা আরামও শান্তি পেলেন।

মক্কাবাসী মুশরিকগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার এবং লোকজনকে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে রাখার জন্য প্রতিবন্ধকতার যে দেয়াল সৃষ্টি করে রেখেছিল তা এড়িয়ে চলার জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর স্ট্রাটেজী বা কর্ম কৌশল পরিবর্তন করে নিলেন। মুশরিকরা যাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে না পারে তদুদ্দেশ্যে দিবা ভাগের পরিবর্তে তিনি রাতের অন্ধকারে বিভিন্ন গোত্রের নিকট যাতায়াতের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে থাকেন।

এ কর্ম কৌশল বা পদ্ধতির অনুসরণে একরাত্রি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আবূ বাকর (রাঃ) ও আলী (রাঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে বের হলেন। বানু যুহল ও বানী শায়বান বিন সা'লাবাহগণের বাসস্থানের নিকট দিয়ে যাবার সময় ইসলাম সম্পর্কে তাঁদের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বললেন। আলাপ আলোচনার সময় তাদের সাড়া খুব অনুকূল বলে মনে হলেও ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে সিদ্ধান্তমূলক কোন কিছুই তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া গেল না। এ সময় আবূ বাকর (রাঃ) ও বনু যুহলের এক ব্যক্তির সঙ্গে বংশ পরম্পরা সম্পর্কে খুব হৃদ্যতাপূর্ণ কথাবার্তা হল। উভয়েই বংশধারা সম্পর্কে অত্যন্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সঙ্গীদের নিয়ে মিনার চৌক দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এমন সময় অদূরে কিছু সংখ্যক লোকের কথোপকথন তাঁর শ্রুতিগোচর হল।[2] কাজেই, তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তিনি সে দিকে অগ্রসর হতে থাকলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁদের নিকট গিয়ে পৌঁছলেন। এ দলে ছিলেন ইয়াসরাবের খাযরাজ গোত্রের ছয় জন যুবক। তাঁদের নাম হল যথাক্রমে :

(১) আস'আদ বিন যুরারাহ, (বনু নাজ্জার গোত্রের)

(২) 'আওফ বিন হারিস বিন রিফা'আহ (ইবনে আফরা-), (বনু নাজ্জার গোত্রের)

(৩) রাফি' বিন মালিক বিন আজলান, (বনু যুরাইক্ব গোত্রের)

(৪) কুত্ববা বিন 'আমির বিন হাদীদাহ, (বনু সালামাহ গোত্রের)

(৫) উক্ববাহ বিন 'আমির বিন নাবী, (বনু হারাম বিন কা'ব গোত্রের)

(৬) হারিস বিন আব্দুল্লাহ বিন রিআব। (বনু উবাইদ বিন গানম গোত্রের)

এটা ইয়াসরিববাসীগণের সৌভাগ্য যে, তাঁরা তাঁদের মিত্র ইহুদীদের নিকট থেকে অবগত হয়েছিলেন যে, এ যুগে একজন নাবী প্রেরিত হবেন এবং শীঘ্রই তা প্রকাশ পেয়ে যাবে। ইহুদীরা বলতেন যে, 'আমরা তাঁর অনুসারী হয়ে তাঁর সঙ্গে তোমাদেরকে ইরম ও 'আদদের মতো হত্যা করব।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) চলতে চলতে গিয়ে তাঁদের নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাঁদের পরিচয় জানতে চাইলেন। তাঁরা বললেন, 'আমরা খাযরাজ গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত।' তিনি বললেন, 'অর্থাৎ ইহুদীদের মিত্র?'

তাঁরা বললেন, 'জী হ্যাঁ'।

তিনি বললেন, ‘আপনারা বসুন না, কিছু কথাবার্তা হোক।’

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)’এর এ কথা শ্রবণের পর তাঁরা বসে পড়লেন। তিনি তাঁদের সম্মুখে ইসলামের হাকীকত বর্ণনা করার পর কুরআন মাজীদ থেকে তিলাওয়াত করে শোনালেন এবং ইসলাম গ্রহণের জন্য দাওয়াত পেশ করলেন।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর থেকে দাওয়াত লাভের পর তাঁরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, ‘ইনিতো সেই নাবী বলে মনে হচ্ছে যাঁর উল্লে-খ করে ইহুদীগণ তোমাদেরকে ধমকাচ্ছে। কাজেই ইহুদীগণ যেন তোমাদেরকে পিছনে ফেলতে না পারে।’ এ কথা বলে তাঁরা তৎক্ষণাৎ ইসলামের দাওয়াত কবুল করে মুসলিম হয়ে গেলেন।

এঁরা ইয়াসরিবের জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। সাম্প্রতিককালে ইয়াসরিবে যে যুদ্ধ হয়ে গেল এবং যার ধোঁয়া এখনো ইয়াসরিবের আকাশকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, যুদ্ধে তাঁদেরকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলেছে। এ জন্য তাঁরা আশা করেছিলেন যে, ইসলামের এ দাওয়াতই এ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটানোর একটা সূত্র হতে পারে। এ জন্য তাঁরা বললেন, আমরা আমাদের সম্প্রদায়কে এমন এক অবস্থায় রেখে এসেছি যে, তাদের পরস্পরের মধ্যে এমন শত্রুতা ও দুশমনীর সৃষ্টি হয়েছে, যার কোন নজির নেই। আশা করি আপনার দাওয়াতই তাদেরকে একত্রিত করে দিবে। আমরা সেখানে ফিরে গিয়ে লোকদের আপনার কাজের প্রতি আহবান জানাব এবং আপনার দাওয়াতের কারণে আল্লাহ যদি তাঁদের একত্রিত করে দেন তবে আপনার চাইতে অধিক আর কেউই সম্মানিত হবে না।

এরপর তাঁরা যখন মদীনা প্রত্যাবর্তন করলেন তখন সেই সঙ্গে ইসলামের সংবাদ ও পয়গাম সঙ্গে নিয়ে গেলেন। যার ফলে সেখানে ঘরে ঘরে রাসূল (ﷺ)-এর দাওয়াত প্রসার লাভ করল।

‘আয়িশাহ (রাঃ)-এর সঙ্গে বিবাহ

এ বছরই অর্থাৎ একাদশ নবুওয়াত বর্ষের শাওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ‘আয়িশাহ (রাঃ)-এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ঐ সময় তাঁর বয়স ছিল ছয় বছর। হিজরতের প্রথম বছর শাওয়াল মাসে মনোনীত নয় বছর বয়সে উম্মুল মু’মিনীন ‘আয়িশাহ (রাঃ) স্বামীগৃহে পদার্পণ করেন।[1] (রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রিয়তম সাহাবী আবূ বাকর (রাঃ)-এর ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল আল্লাহর নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে রক্ত সম্পর্ক গড়ে তোলা। এ প্রেক্ষিতেই ব্যবস্থা করা হয়েছিল এ অসম বিবাহের।

ইসরা ও মিরাজ

ইসরা ও মিরাজ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। মুমিনের ভক্তি ও বিশ্বাস এবং আবেগ ও অনুভূতির শেকড় গভীরভাবে মিশে আছে যার সঙ্গে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওহীদ ও ঈমানের দাওয়াতে নিজেকে বিলীন করে দিচ্ছেন। কাফেরদের নির্মম অত্যাচার ও অবর্ণনীয় বাক্যবাণে তিনি বিধ্বস্ত। মুষ্টিমেয় কিছু মুসলিম জুলুম-অত্যাচারে নিষ্পিষ্ট। তবুও হৃদয়ে তারা ঈমানের আলো জ্বেলে রেখেছেন। এভাবেই এগিয়ে চলছে ইসলামের প্রচার-প্রসার। আশ্রয় ও সান্ত¦নার বিরাট দুটি বৃক্ষ একে একে চলে গেছেন। মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে। খাজা আবু তালিব ও উম্মুল মুমিনীন খাদীজাতুল কুবরা রা.। আশা ছিল, তায়েফবাসী যদি কথাগুলো একটু মেনে নেয়! তাওহীদের দাওয়াত কবুল করে! না, তারাও সাড়া দিল না। শুধু কি তাই, নির্দয়ভাবে ক্ষতবিক্ষত করল প্রাণপ্রিয় নবীজীকে। এমন মুহূর্তে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ডেকে নিলেন প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঊর্ধ্বজগতে। রাতের এক খণ্ডে, জিবরাঈলকে পাঠিয়ে, বুরাকে চড়িয়ে। কুরআনের ভাষায়-

سُبْحٰنَ الَّذِیْۤ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَاالَّذِیْ بٰرَکْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِیَهٗ مِنْ اٰیٰتِنَا ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ.

পবিত্র সেই সত্তা, যিনি নিজ বান্দাকে রাতের একটি অংশে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায় নিয়ে যান, যার চারপাশকে আমি বরকতময় করেছি, তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখানোর জন্য। নিশ্চয়ই তিনি সব কিছু শোনেন এবং সব কিছু জানেন। -সূরা ইসরা (১৭) : ১

বস্তুত ইসরা হচ্ছে, মক্কা মুকাররমা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণের সেই পর্বটুকু, যা রাতের একটি অংশে সংঘটিত হয়েছিল। আর মিরাজ হচ্ছে সেখান থেকে ঊর্ধ্বজগৎ পরিভ্রমণের সেই বিস্তৃত অধ্যায়।

আল্লাহ তাআলা সূরা নাজমে আরো বলেন-

وَ لَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰی، عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰی، عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰی، اِذْ یَغْشَیالسِّدْرَةَ مَا یَغْشٰی،مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَ مَا طَغٰی، لَقَدْ رَاٰی مِنْ اٰیٰتِ رَبِّهِالْكُبْرٰی.

বস্তুত সে তাকে (হযরত জিবরাঈল আ.-কে) আরও একবার দেখেছে। সিদরাতুল মুনতাহা (সীমান্তবতীর্ কুলগাছ)-এর কাছে। তারই কাছে অবস্থিত জান্নাতুল মা'ওয়া। তখন সেই কুল গাছটিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সেই জিনিস, যা তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। (রাসূলের) চোখ বিভ্রান্ত হয়নি এবং সীমালংঘনও করেনি। (অর্থাৎ দেখার ব্যাপারে চোখ পড়েনি এবং আল্লাহ তাআলা তার জন্য যে সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন, তিনি তা লংঘনও করেননি যে, তার সামনে কী আছে তা দেখতে যাবে।) বাস্তবিকপক্ষে, সে তার প্রতিপালকের বড়-বড় নিদর্শনের মধ্য হতে বহু কিছু দেখেছে। -সূরা নাজম (৫৩) : ১৩-১৮

ইসরা ও মিরাজের ব্যাপারে কুরআনের বর্ণনায় সংক্ষেপে এতটুকুই বলা হয়েছে। আর বিস্তারিত এসেছে হাদীসের পাঠগুলোতে। সীরাত, সুন্নাহ এবং তারীখের নির্ভরযোগ্য সূত্রে রয়েছে এর বিশদ বিবরণ। পবিত্র কালামুল্লাহর এই আলোচনা থেকে যে বিষয়গুলো সামনে আসে তা হচ্ছে-

ক. আল্লাহ তাআলা পবিত্র সত্তা। মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি বিবেকের সীমাবদ্ধ গণ্ডি পেরিয়ে তাঁর শক্তি ও সক্ষমতা। তিনি তার বান্দাকে রাতে পরিভ্রমণ করিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি সর্ব প্রকার সংশয় ও দুর্বলতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

খ. ইসরা ও মিরাজ রাতে সংঘটিত হয়েছিল।

গ. মক্কা মুকাররমা থেকে নবীজীকে প্রথমে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সেখান থেকে নবীজী ঊর্ধ্বজগতে আরোহিত হন।

ঘ. বাইতুল মুকাদ্দাস ও তার চারপাশের এলাকা বরকতময়।

ঙ. আল্লাহ তাআলা তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিরাজের নিআমত দান করেছেন তিনি তার বড় বড় কুদরত ও নিশানা দেখাবেন বলে।

চ. মিরাজের বিষয়টি এমন, যা সাধারণ বোধগম্য বিষয় নয়। এটা কেবলই মহান রবের কুদরতের কারিশমা। মাখলুকের সীমাবদ্ধ হিসাব-নিকাশ সে পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম নয় ইত্যাদি।

এ তো গেল কুরআন কারীমের বিবরণ প্রসঙ্গ। সেখানে ইসরা ও মেরাজের বিবরণ এসেছে সংক্ষেপে। বিস্তারিত বিবরণ এসেছে হাদীস শরীফে। কিছু দীর্ঘ হাদীসে মেরাজের মোটামুটি বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। আর কিছু হাদীসের বিভিন্ন পাঠ থেকে মিরাজের টুকরো টুকরো বর্ণনা পাওয়া যায়। সে হাদীসগুলো সামনে রেখে মিরাজের ঘটনা নিম্নরূপ-

হিজরতের পূর্বের কথা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একরাতে শুয়ে ছিলেন। তন্দ্রাচ্ছন্ন। চোখদুটো মুদে এসেছে বটে, তবে দিল ছিল জাগ্রত। এরই মাঝে আগমন করলেন হযরত জিবরাঈল আ.। তিনি নবীজীকে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন যমযমের নিকট। একটি স্বর্ণের পেয়ালা আনা হল। তা ছিল ঈমান ও হিকমতে পূর্ণ। তাতে যমযমের পানি। জিবরাঈল আ. নবীজীর বক্ষ মোবারক বিদীর্ণ করলেন। বের করে আনলেন নবীজীর হৃদয়। যমযমের পানি দিয়ে তা ধুয়ে আবার প্রতিস্থাপন করে দিলেন জায়গামত। ঈমান ও হিকমতে পূর্ণ করে দেওয়া হল নবীজীর কলব।

এরপর আনা হল নবীজীকে বহন করার জন্য সওয়ারী। প্রাণীটি গাধার চেয়ে বড়, ঘোড়া থেকে ছোট। নাম বুরাক। রং সাদা। এটা এতটাই ক্ষিপ্রগতির যার এককেটি কদম পড়ে দৃষ্টির শেষ সীমায় গিয়ে।

এভাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহূর্তেই পৌঁছে গেলেন বাইতুল মুকাদ্দাসে। বুরাক বেঁধে রাখা হল পাথর ছিদ্র করে। যে পাথরে অপরাপর নবীগণ নিজেদের বাহন বেঁধে রাখতেন। নবীজী সেখানে দুই রাকাত নামায আদায় করলেন। নামায পড়ে বের হওয়ার সময় জিবরাঈল

আ. নবীজীর সামনে দুটি পেয়ালা পেশ করলেন। একটি দুধের অপরটি শরাবের। নবীজী দুধের পেয়ালা গ্রহণ করলেন। জিবরাঈল আ. বললেন, আপনি (দ্বীনের) স্বভাবসিদ্ধ বিষয়টি নির্বাচন করেছেন।

নবীজী মদের পেয়ালা নেওয়ার পরিবর্তে দুধের পেয়ালা গ্রহণ করায় জিবরীল আ. বলেন, আপনি যদি মদের পেয়ালা নিতেন তাহলে আপনার উম্মত বিভ্রান্ত হয়ে পড়ত। (দ্রষ্টব্য : সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৩৯৪)

এরপর শুরু হল ঊর্ধ্বজগতের সফর। জিবরাঈল নবীজীকে নিয়ে চললেন। প্রথম আসমানে গিয়ে দস্তক দিলেন। জিজ্ঞাসা করা হল, কে? বললেন, জিবরাঈল। জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সাথে কে? বললেন, মুহাম্মাদ। জিজ্ঞাসা করা হল, তার কাছে কি আপনাকে পাঠানো হয়েছে? বললেন, হাঁ। এরপর নবীজীকে সম্ভাষণ জানানো হল- মারহাবা, উত্তম আগমনকারীর আগমন ঘটেছে! খুলে দেওয়া হল নবীজীর জন্য আসমানের দরজা।

নবীজী প্রথম আসমানে গেলেন। সেখানে ছিলেন হযরত আদম আ.। জিবরাঈল পরিচয় করিয়ে দিলেন। নবীজী হযরত আদমকে সালাম বললেন। বাবা আদম জবাব দিলেন। নবীজীকে সাদর অভিবাদন জানালেন- মারহাবা, নেককার পুত্র ও নেককার নবী। হযরত আদম আ. নবীজীর জন্য দুআ করলেন।

এরপর নবীজী উঠতে থাকলেন দ্বিতীয় আসমানের দিকে। সেখানেও দরজা খুলতে প্রথম আসমানের মতো জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। এরপর নবীজীকে ইস্তেকবাল করা হল। নবীজী সেখানে দেখতে পেলেন দুই খালাত ভাই হযরত ঈসা আ. ও হযরত ইয়াহইয়া আ.-কে। তাদের সাথে নবীজীর সালাম বিনিময় হল। তারা নবীজীকে স্বাগত জানালেন- মারহাবা, আমাদের পুণ্যবান ভাই এবং সজ্জন নবী। তারা নবীজীর জন্য দুআ করলেন।

এরপর নবীজীকে তৃতীয় আসমানের দিকে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানেও দুই আসমানের মতো জিজ্ঞাসাবাদ হল এবং নবীজীকে স্বাগত জানানো হল। সেখানে গিয়ে দেখলেন হযরত ইউসুফ আ.। হযরত ইউসুফের সাথে নবীজীর সালাম ও কুশল বিনিময় হল। নবীজী বলেন, হযরত ইউসুফকে যেন দুনিয়ার অর্ধেক সৌন্দর্য ঢেলে দেওয়া হয়েছে!

এরপর চললেন চতুর্থ আসমানের দিকে। সেখানেও পূর্বের মতো জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। স্বাগত-সম্মান জানানো হল। সেখানে হযরত ইদরীস আ.-এর সাথে সাক্ষাৎ হল। সালাম ও কুশল বিনিময় হল। হযরত ইদরীস আ. নবীজীর জন্য দুআ করলেন।

এরপর চললেন পঞ্চম আসমানের দিকে। সেখানে হযরত হারূন আ.-এর সাথে সাক্ষাৎ হল।

এরপর চললেন ষষ্ঠ আসমানের দিকে। সেখানেও পূর্বের পর্বগুলোর মতো জিজ্ঞাসা করা হল। নবীজীকে অভিনন্দন জানানো হল। সেখানে দেখা হল হযরত মূসা আ.-এর সাথে। হযরত মূসা আ. নবীজীকে খুব ইস্তেকবাল করলেন।

এরপর নবীজী সপ্তম আসমানের দিকে উঠতে থাকেন। সেখানে দেখা হল হযরত ইবরাহীম আ.-এর সাথে। জিবরাঈল আ. পরিচয় করিয়ে দিলেন- ইনি আপনার পিতা, সালাম করুন। নবীজী হযরত ইবরাহীম আ.-এর সাথে সালাম বিনিময় করলেন।

নবীজী বলেন, হযরত ইবরাহীম আ. তখন বাইতুল মামুরে হেলান দিয়ে ছিলেন। বাইতুল মামুর, যেখানে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা আসে। এরপর এই সত্তর হাজার আর ফিরে আসে না। এভাবে প্রতিদিন সত্তর হাজার করে ফেরেশতাদের নতুন নতুন কাফেলা আসতে থাকে।

এরপর নবীজীকে নিয়ে যাওয়া হল সিদরাতুল মুনতাহার দিকে। সেই কুল বৃক্ষের একেকটি পাতা হাতির কানের মতো। আর একেকটি ফল মটকার মতো বড় বড়। যখন ওটাকে আল্লাহর বিধান আচ্ছন্ন করে নিল তা পরিবর্তিত হয়ে গেল। সৃষ্টির কারো সাধ্য নেই তার সৌন্দর্যের বিবরণ দেবার। জিবরাঈল বললেন, এটা সিদরাতুল মুনতাহা। এখানে চারটি নহর। দুটি অদৃশ্য আর দুটি দৃশ্যমান। নবীজী জিজ্ঞাসা করলেন, দৃশ্যমান নদীদুটি কোনগুলো? জিবরাঈল বললেন, অদৃশ্যমান দুটি জান্নাতে। আর দৃশ্যমান দুটি হল নীল নদ ও ফুরাত নদী।

এরপর আল্লাহ তাআলা নবীজীর প্রতি যে ওহী পাঠানোর পাঠালেন। দিনরাতে উম্মতের জন্য পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করে দিলেন। নবীজী আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাতের এ হাদিয়া নিয়ে ফেরত আসছিলেন; এর মধ্যে দেখা হযরত মূসা আ.-এর সাথে। হযরত মূসা আ. জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহ আপনার উম্মতের জন্য কী দিয়েছেন? নবীজী বললেন, পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায। হযরত মূসা বললেন, আপনার উম্মত রাত-দিনে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায পড়তে পারবে না। আপনার আগে আমি উম্মত চালিয়ে এসেছি। আপনি আল্লাহর কাছে গিয়ে কমিয়ে আনেন। নবীজী সে মতে আল্লাহর কাছে গিয়ে কম করে দেওয়ার দরখাস্ত করলেন। আল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন। নবীজী তা নিয়ে ফেরত আসছিলেন। আবার হযরত মূসা আ.-এর সাথে দেখা হল। বললেন, আপনার উম্মত তা পারবে না। আপনি আরো কমিয়ে আনুন। নবীজী আবার আল্লাহর কাছে গিয়ে আগের মতো দরখাস্ত করে আরো পাঁচ ওয়াক্ত কমিয়ে আনলেন। নবীজী বলেন, এভাবে আমি আল্লাহ ও মূসার মাঝে আসা-যাওয়া করতে থাকি। শেষবার আল্লাহ বলেন, মুহাম্মদ! এই হল দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায। প্রত্যেক নামাযের বিনিময়ে দশ নামাযের সাওয়াব। এভাবে বান্দা পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের সওয়াব পাবে। কেউ কোনো ভালো কাজের ইচ্ছা করবে কিন্তু করতে পারবে না, তার জন্যও নেকী রয়েছে। এক নেকী। আর যদি ভালো কাজটি করে তাহলে তার জন্য দশ নেকী। আর কেউ কোনো মন্দ কাজের ইচ্ছা করলে কোনো গুনাহ লেখা হবে না। তবে তা করে বসলে একটি গুনাহ লেখা হবে।

নবীজী এ সওগাত নিয়ে ফেরত আসছিলেন। হযরত মূসার সাথে দেখা হল। মূসা আ. এবার শুনে বললেন, আপনি যান, আরো কমিয়ে আনুন। আপনার উম্মত পারবে না। বনী ইসরাঈলের বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা আছে। নবীজী বললেন, আমার আর কিছু বলতে লজ্জা হচ্ছে!

(দ্রষ্টব্য : সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৮৮৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৬২, ১৬৪)
নবীজীকে যখন বুরাকে তোলা হচ্ছিল তখন বুরাক ঔদ্ধত্য দেখাল। তখন জিবরাঈল আ. বললেন, মুহাম্মাদের ক্ষেত্রে এরকম করছিস! তোর উপর তো এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ কোনোদিন চড়েনি। এ শুনে বুরাক ঘর্মাক্ত হয়ে গেল। (দ্রষ্টব্য : জামে তিরমিযী, হাদীস ৩১৩১)
আল্লাহ তাআলা নবীজীর জন্য যে বিশেষ উপহার হাউযে কাউসার রেখেছেন প্রথম আসমানে নবীজীকে তা দেখানো হয়। নবীজী সেই কাউসারের বিবরণও দিয়েছেন। (দ্রষ্টব্য : সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৫১৭)
নবীজী যখন প্রথম আসমানে যান দেখেন এক ব্যক্তি, তার ডান পাশে কিছু রূহ আর বাম পাশে কিছু রূহের কাফেলা। তিনি ডানদিকে তাকালে হাসেন আর বাম দিকে তাকালে কাঁদেন। তিনি নবীজীকে সম্ভাষণ জানালেন। নবীজী জিজ্ঞাসা করলেন, জিবরাঈল! ইনি কে? জিবরাঈল বললেন, ইনি আদম আ.। আর তার দুই পাশে তার সন্তানদের রূহ। ডানদিকেরগুলো জান্নাতী আর বামদিকেরগুলো জাহান্নামী। এজন্য তিনি ডানদিকে তাকিয়ে হাসেন আর বামদিকে তাকিয়ে কাঁদেন। (দ্রষ্টব্য : সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৩৪২)
এ সফরে নবীজীকে জান্নাত-জাহান্নামের ভ্রমণও করানো হয়। নবীজী বলেন, জান্নাতের প্রাসাদগুলো মুক্তার তৈরি আর তার মাটি হল মেশকের। (দ্রষ্টব্য : সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৫১৭)
নবীজী এ সফরে একদল লোককে দেখলেন, তাদের নখগুলো তামার। নিজেদের নখ দিয়ে তারা নিজের গাল ও বুকে আঁচড় কাটছে। জিজ্ঞাসা করলেন, জিবরাঈল, এরা কারা?
বললেন, এরা ওই সমস্ত লোক, যারা মানুষের গোশত খেত এবং তাদের সম্ভ্রমে আঘাত হানত। অর্থাৎ গীবত করত এবং মানুষকে লাঞ্ছিত করত। (দ্রষ্টব্য : মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৩৩৪০; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৮৭৮)
নবীজী এ সফরে হযরত মূসা আ. ও হযরত ঈসা আ.-এর শারীরিক গড়নেরও বিবরণ দেন। নবীজী বলেন, আমি ইবরাহীমের আকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
(দ্রষ্টব্য : সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৩৯৪)
হযরত ইবরাহীম আ.-এর সাথে মুলাকাত হলে তিনি নবীজীকে বলেন, আপনি আপনার উম্মতের কাছে আমার সালাম পৌঁছাবেন। আর তাদেরকে বলবেন, জান্নাতের মাটি পবিত্র ও সুঘ্রাণযুক্ত, এর পানি সুমিষ্ট এবং এর ভূমি উর্বর ও সমতল। আর এর বৃক্ষ হচ্ছে-
سُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ لِلهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَر.
(দ্রষ্টব্য : জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৪৬২)
এ সফরে নবীজীকে তিনটি উপহার দেওয়া হয়। পাঁচ ওয়াক্ত নামায, সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো এবং এই উম্মতের যারা শিরক থেকে বেঁচে থেকে মৃত্যুবরণ করবে তাদের গুনাহগুলো মাফ করে দেওয়ার ঘোষণা। (দ্রষ্টব্য : সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৭৩)

এ সফরে নবীজীর সাথে পূর্ববর্তী নবীগণের সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি নামাযে সকলের ইমামতি করেন।

(দ্রষ্টব্য : সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৭২)

এ সফরে নবীজী দেখলেন, একদল লোকের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলেন, এরা কারা?

জিবরাঈল বললেন, এরা বক্তৃতা করত বটে, কিন্তু নিজেরা আমল করত না। (দ্রষ্টব্য : মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১২২১১, ১২৮৫৬)

মিরাজ থেকে ফিরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতীমে বসা। মুশরিকরা ইসরা ও মেরাজের ঘটনা শুনে উপহাস ও কটাক্ষ করতে লাগল। বিভিন্নভাবে নবীজীর দিকে প্রশ্নের তীর ছুড়তে লাগল। তারা চাইল, বাইতুল মুকাদ্দাসের পূর্ণ বিবরণ শুনবে। নবীজী এমন প্রশ্নে খুবই বিব্রত হয়ে ওঠেন। এত রাতে কি বাইতুল মুকাদ্দাসকে ওরকম নিখুঁতভাবে দেখতে গিয়েছেন নাকি! নবীজী বলেন, এরকম বিব্রতকর পরিস্থিতিতে আমি আগে পড়িনি। আল্লাহ তাআলা প্রিয় বন্ধুকে সাহায্য করলেন। নবীজীর চোখের সামনে মেলে ধরলেন বাইতুল মুকাদ্দাসের দৃশ্য। নবীজী দেখে দেখে তাদের প্রত্যেকটি জিজ্ঞাসার বিস্তারিত জবাব দিলেন

(দ্রষ্টব্য : সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৮৮৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৭২)

মিরাজের ঘটনা এবং আমাদের করণীয়

মিরাজের ঘটনা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সীরাতের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। প্রতিটি মুমিনের ঈমান ও আবেগ জড়িয়ে আছে এর সাথে। তাই এক্ষেত্রে আমাদের কিছু করণীয় আছে।

এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম যে করণীয় তা হচ্ছে, মেরাজের ব্যাপারে সহীহ আকীদা পোষণ করা। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক রাতে সশরীরে মক্কা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস এবং সেখান থেকে সাত আসমান, সিদরাতুল মুনতাহা, জান্নাত, জাহান্নাম ভ্রমণ করিয়েছেন; আল্লাহ তাআলা স্বীয় বড় বড় কিছু কুদরত প্রিয় হাবীবকে দেখাবেন বলে। এটা সীরাতে রাসূলের একটি বড় অধ্যায় এবং নবী জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মুজিযা। এটা মুসলমানের অকাট্য মৌলিক আকীদার অংশ। অবিচ্ছিন্ন সূত্র পরম্পরায় তা স্বীকৃত ও সুসাব্যস্ত। তাই এক্ষেত্রে স্বচ্ছ বিশ্বাস রাখা জরুরি।

মিরাজ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বিশেষ মুজিযা। আর মুজিযা ওই ঘটনাকেই বলা হয়, যা সাধারণ সক্ষমতার বাইরে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিশেষভাবে সংঘটিত হয়। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থায় প্রভাবিত হয়ে অনেকে একে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করতে চান। এটা ইসলামের এবং ইসলামের দাওয়াতের স্বভাবজাত প্রক্রিয়া নয়।

কখনো কখনো এমনসব বৈজ্ঞানিক থিউরি শোনানো হয়, যা অনেকসময় হাস্যকর সাব্যস্ত হয়। তাই ইসলামের বিধিবিধান ও শাআইরগুলোকে ইসলামের স্বভাববোধ থেকে অনুধাবন করা এবং এর মাধ্যমে নিজের ঈমানী যিন্দেগী বিনির্মাণ করাই হচ্ছে প্রকৃত মুমিনের শান।

মিরাজের ঘটনা থেকে সরলদাগে যে শিক্ষাগুলো পাওয়া যায় সংক্ষেপে তা নিম্নরূপ-

ক. আল্লাহর সত্তার উপর পূর্ণ ও সঠিক বিশ্বাস রাখা। শিরক থেকে বিলকুল বেঁচে থাকা।

খ. আল্লাহর সাথে বান্দার আবদিয়াত তথা দাসত্বের সম্পর্ক মজবুত করা।

গ. নামাযের প্রতি যত্নবান হওয়া। কেননা এটা মিরাজে লাভ করা উম্মতের জন্য নবীজীর তোহফা। বস্তুত নামায এমন একটি ইবাদত, যার মাধ্যমে রবের সাথে বান্দার সম্পর্ক সুদৃঢ় ও মধুময় হতে থাকে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, বান্দা যখন নামায পড়ে তখন সে তার রবের সাথে নিভৃতে আলাপ করে। (দ্রষ্টব্য : সহীহ বুখারী, হাদীস ৪০৫)

ঘ. সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলোর শিক্ষা ও মর্মগুলো ধারণ করা। এখানে মুমিনের ঈমানের শিরোনামগুলো সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়েছে।

ঙ. আল্লাহর হক ও বান্দার হকের প্রতি যত্নশীল হওয়া।

চ. গীবত ও পরনিন্দা থেকে বেঁচে থাকা। মানুষের সম্ভ্রমহানি না করা। কাউকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত না করা। এটা অনেক বড় কবীরা গুনাহ।

ছ. শুধু লম্বা লম্বা বক্তৃতা নয়, খেয়াল করা- মানুষকে যে নসীহত করছি, আমার মাঝে তা কতটুকু আছে।

জ. জান্নাতের ব্যাপারে আগ্রহী হওয়া।

ঝ. জাহান্নামের ব্যাপারে ভীত থাকা।

ঞ. হাউযে কাউসারের প্রত্যাশী হওয়া।

ট. হযরত ইবরাহীম আ. যে দুআর কথা বলেছেন-

سُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ لِلهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَر.

এই দুআর প্রতি মনোযোগী হওয়া।

ঠ. সকল প্রকার গুনাহ, বিশেষ করে মদ ও গীবত থেকে বেঁচে থাকা।

সবশেষে বলতে হয়, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেই পবিত্র ও বরকতময় ভূমিতে ইসরা ঘটেছে সেই বাইতুল মুকাদ্দাস আজ তারই উম্মতের জন্য অনিরাপদ এক লীলাভূমি। আজ মুসলমানদের হাত থেকে বেদখল পবিত্র বাইতুল মুকাদ্দাস ও জেরুযালেম। সেখানে ভেসে যায় আমার ভাইয়ের রক্ত। কিন্তু তার জন্যে আমার-আপনার হৃদয়ে কতটুকু রক্তক্ষরণ হয়!

এছাড়া আরো অনেক শিক্ষার উপলক্ষ হচ্ছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইসরা ও মিরাজ। আনুষ্ঠানিকতা পরিহার করে বাস্তবানুগ এই শিক্ষাগুলোর প্রতি মনোযোগী হওয়াই বুদ্ধিমানের পরিচয়। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন- আমীন।

নাবী (সাঃ) এর মদীনায় হিজরতের পটভূমি ও প্রেক্ষাপট

নাবী (ﷺ) এর মদ্বীনায় হিজরত এমন একটি ঘটনা, যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বন্ধু ও শত্রুদের মধ্যে পার্থক্য করেছেন এবং তাঁর একনিষ্ঠ বান্দাদেরকে পরীক্ষা করেছেন। এর মাধ্যমেই তাঁর দ্বীনকে সম্মানিত করেছেন এবং তাঁর রসূলকে সাহায্য করেছেন।

ইমাম যুহরী (রহঃ) বলেন- মুহাম্মাদ বিন সালেহ আসেম বিন উমার ও ইয়াযিদ বিন রুমান এবং অন্যান্য রাবীর মাধ্যমে আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, রসূল (ﷺ) মক্কাতে নবুওয়াতের প্রথম তিন বছর গোপনে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন। চতুর্থ বছর প্রকাশ্যে দাওয়াতের ঘোষণা দিয়েছেন। এরপর থেকে দশ বছর পর্যন্ত মানুষকে ইসলামের দিকে আহবান করেছেন। প্রতি বছর হজ্জের মৌসুমে হাজীদের তাঁবুতে গমণ করতেন। এমনি উকায, মাজিন্নাহ এবং যুল মাজাযের বাজারে ও বিভিন্ন মেলার মৌসুমেও লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন এবং তাঁকে হেফাজত করার আবেদন করতেন। যাতে তিনি আল্লাহর পয়গাম নির্বিঘ্নে পৌঁছাতে পারেন। এর বিনিময়ে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। কিন্তু তিনি কোন সাহায্যকারী ও সাড়াদানকারী পেলেন না। পরিশেষে তিনি প্রত্যেক কবীলার (গোত্রের) কাছে এবং তাদের বাসস্থানে যেতে লাগলেন। তিনি বলতেন- হে লোক সকল! তোমরা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বল। তাহলেই তোমরা সফলতা অর্জন করতে পারবে এবং এর মাধ্যমে তোমরা আরবদের শাসক হতে পারবে। অনারবরা তোমাদের বশ্যতা স্বীকার করবে। আর মৃত্যুর পর তোমরা জান্নাতে রাজকীয় জীবন যাপন করতে পারবে। আবু লাহাব তাঁর পিছনে পিছনে চলত এবং লোকদেরকে বলতঃ তোমরা এর অনুসরণ করোনা। সে বেদ্বীন ও মিথ্যুক। ফলে লোকেরা মুহাম্মাদ (ﷺ) এর কথা কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করত এবং তাঁকে কষ্ট দিত। লোকেরা বলতঃ তোমার গোত্রের লোকেরাই তোমার সম্পর্কে অধিক অবগত। তারা তো তোমার অনুসরণ করেনি। তারপরও তিনি দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যেতেন এবং বলতেন- হে আল্লাহ্! তুমি চাইলে এরূপ হতনা। বর্ণনাকারী বলেন- তিনি যে সমস্ত গোত্রের কাছে নিজেকে পেশ করেছিলেন তার মধ্যে রয়েছে বনী আমের বিন সা'সাআ, বনী মুহারিব বিন খাসফাহ, বনী ফাযারাহ, বনী গাস্সান, বনী মুর্রা, বনী হানীফাহ, বনী সুলাইম, বনী আব্স, বনী নযর, বনী আল-বুকা, বনী কেনদাহ, বনী কালব, বনী হারিছ, বনী উযরাহ এবং বনী হাযারেমাহ অন্যতম। কিন্তু এ সমস্ত গোত্রের কেউ তাঁর আহবানে সাড়া দেয় নি।

তবে খুশীর সংবাদ হল, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নাবীর জন্য যা আগে থেকেই তৈরী করে রেখেছিলেন, তা হচ্ছে মদ্বীনার আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় মদ্বীনার ইহুদী সম্প্রদায়ের নিকট থেকে দীর্ঘ দিন যাবৎ শুনে আসছিল যে, অচিরেই একজন নাবী আসবেন। ইহুদীরা বলতঃ আমরা সেই নাবীর অনুসরণ করব এবং তার সাথে যোগ দিয়ে আমরা আদ ও ইরাম জাতির ন্যায় তোমাদেরকে (আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকদেরকে) অকাতরে হত্যা করব। মদ্বীনার আনসারগণ।আরবের অন্যান্য গোত্রের ন্যায় কা'বা ঘরের হাজ্জ করত। তবে ইহুদীরা তা করতনা। হজ্জের মৌসুমে আনসারগণ যখন দেখলেন আল্লাহর রসূল (ﷺ) মানুষদেরকে আল্লাহর দিকে আহবান করছেন তখন তারা তাঁর ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করল এবং পরস্পর প্রশ্ন করল- আল্লাহর কসম! হে লোক সকল! তোমরা কি জান এই ব্যক্তিই কি তিনি যার মাধ্যমে ইহুদীরা তোমাদেরকে ভয় দেখিয়ে থাকে? এ রকম যেন না হয় যে, তারা তোমাদের পূর্বেই তাঁর অনুসারী হয়ে যায়।

আওস গোত্রের সুয়ায়েদ ইবনুস সামেত নামক একজন লোক মক্কায় আগমণ করেছিল। রসূল (ﷺ) তাঁকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিয়েছিলেন। কিন্তু সে ইসলাম কবুল করেনি এবং সরসূরি তা প্রত্যাখ্যানও করে নি। ইতিমধ্যেই আনাস বিন রাফে আবুল হাইস বিন আব্দুল আশহাল গোত্রের একদল যুবকসহ কোন একটি বিষয়ে চুক্তি করার জন্য আগমণ করল। নাবী (ﷺ) তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান জানালেন। তখন তাদের মধ্যকার ইয়াস বিন মুআয নামক এক যুবক ব্যক্তি বলতে লাগল- হে আমার গোত্রীয় লোক সকল! আল্লাহর শপথ! আমরা যেই উদ্দেশ্যে আগমণ করেছি তার চেয়ে এটিই (ইসলাম কবুলই) আমাদের জন্য অনেক উত্তম। এ কথা শুনে আনাস তাকে প্রহার করল এবং ধমকাল। এতে সে চুপ হয়ে গেল। অতঃপর তারা সন্ধি চুক্তি পরিপূর্ণ না করেই মদ্বীনায় ফেরত গেল।

আকাবার প্রথম বায়আত

অতঃপর নাবী (ﷺ) হজ্জের মৌসুমে মিনার 'আকাবায়' (গিরি পথে) মদ্বীনার আনসার গোত্রের ছয় জন লোকের সাথে মিলিত হলেন। তাদের সকলেই ছিলেন খাযরাজ গোত্রের। তারা হচ্ছেন আসআদ বিন যুরারা, জাবের বিন আব্দুল্লাহ্, আওফ বিন হারিছ, রাফে বিন মালিক, কুতবা বিন আমের এবং উকবা বিন আমের। তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তারা ইসলাম কবুল করল। অতঃপর মদ্বীনায় ফেরত গিয়ে তারাও ইসলামের দাওয়াত দেয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করল। মদ্বীনায় ইসলাম ছড়িয়ে পড়ল এবং প্রতিটি ঘরেই ইসলাম প্রবেশ করল। পরের বছর মদ্বীনা থেকে ১২ জন লোক আসল। জাবের (রাঃ) ব্যতীত আগের বছরের সকলেই এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের সাথে আওফের ভাই মুআয বিন হারিছ, যাকওয়ান বিন আবদে কাইসও ছিল। যাকওয়ান মদ্বীনায় হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত মক্কাতেই ছিল। এই জন্যই তাকে একই সাথে আনসারী মুহাজেরী বলা হয়। তাদের মধ্যে আরও ছিল উবাদা বিন সামিত, ইয়াযিদ বিন ছা'লাবাহ, আবুল হাইছাম ইবনুত তাইহান এবং উয়াইমির বিন সায়েদাহ।

জাবের (রাঃ) হতে বর্ণনা করে আবুয যুবাইর বলেন- মক্কায় অবস্থানকালে নাবী (ﷺ) নবুওয়াতের প্রথম তিন বছর গোপনে দাওয়াত দেয়ার পর একটানা দশ বছর পর্যন্ত হজ্জের মৌসুমে হাজীদের তাঁবুতে গিয়ে দ্বীনের দাওয়াত দিতেন। এমনিভাবে তিনি মাজিন্নাহ ও উকায মেলায় গিয়ে বলতেন- এমন কেউ আছে কি যে আমাকে আশ্রয় দিবে? এমন কেউ আছে কি, যে আমাকে আল্লাহর রিসালাত পৌঁছিয়ে দিতে সাহায্য করবে? বিনিময় স্বরূপ সে জান্নাত লাভ করবে। কিন্তু তিনি কোন সাহায্যকারী বা আশ্রয় দানকারী পান নি। পরিস্থিতি এই পর্যন্ত গিয়ে গড়াল যে, লোকেরা মিশর ও ইয়ামান থেকে মক্কায় তাদের আত্মীয়-স্বজনের কাছে আসত। কুরাইশরা এই নবাগত লোকদের কাছে গিয়ে বলতঃ আমাদের এই যুবক লোকটি (মুহাম্মাদ) থেকে সাবধান! সে যেন তোমাদেরকে ফিতনায় না ফেলে। তারপরও তিনি তাদের কাছে যেতেন এবং আল্লাহর দিকে আহবান জানাতেন। কুরাইশরা রসূল (ﷺ) এর দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে লোকদেরকে দেখিয়ে দিত এবং তাঁর দাওয়াত থেকে বিরত রাখত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াছরিব (মদ্বীনা) হতে আমাদেরকে তাঁর নিকট প্রেরণ করলেন। আমাদের কেউ তাঁর কাছে গিয়ে ঈমান আনয়ন করত। তিনি কুরআন পড়ে শুনাতেন। সে তার পরিবারের লোকদের নিকট (মদ্বীনায়) ফেরত আসত। তার পরিবারের লোকেরাও তার মতই মুসলমান হয়ে যেত। এক পর্যায়ে অবস্থা এ রকম হল যে, আনসারদের সব ঘরেই ইসলাম প্রবেশ করল। তারা প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা দিল।

জাবের (রাঃ) বলেন- অতঃপর আমরা একত্রিত হয়ে বললামঃ আর কত দিন এভাবে আল্লাহর রসূলকে মক্কায় ফেলে রাখব? তিনি মক্কার পাহাড়ি ভূমিতে নির্যাতিত হবেন এবং ভীত-সন্ত্রস্ত

থাকবেন! সুতরাং আমরা হজ্জের মৌসুমে মক্কায় গিয়ে তাঁর কাছে পৌঁছলাম। তিনি আমাদের সাথে আকাবায় মিলিত হওয়ার ওয়াদা করলেন।

আকাবার দ্বিতীয় বায়আত

আমরা নির্দিষ্ট সময়ে মিনার আকাবায় তাঁর সাথে মিলিত হলাম। সেখানে রসূল (ﷺ) এর চাচা আববাসও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন- হে ভাতিজা! তোমার কাছে আগত এই লোকগুলো কারা? ইয়াছরিব তথা মদ্বীনাবাসীদের সাথে আমার পরিচয় রয়েছে। একজন দুইজন করে আমরা তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। এই সময় আববাস আমাদের চেহারার দিকে তাকিয়ে বললেন- এদেরকে তো আমি চিনি না। এরা সকলেই যুবক। আমরা বললামঃ হে আল্লাহর রসূল! আমরা কিসের উপর আপনার হাতে বাইআত করব? তিনি বললেন- খুশীতে অখুশীতে আমার কথা শুনবে ও মানবে, স্বচ্ছলতায় অস্বচ্ছলতায় আল্লাহর রাস্তায় খরচ করবে, সৎ কাজের আদেশ দিবে, অসৎ কাজের নিষেধ করবে, আল্লাহর হক আদায় করবে, এ ব্যাপারে কোন সমালোচকের সমালোচনায় ও নিন্দুকের নিন্দায় ভয় করবেনা, আমি তোমাদের কাছে চলে গেলে তোমরা আমাকে সাহায্য করবে এবং তোমরা যেভাবে নিজেদেরকে, স্ত্রী-সন্তানদেরকে হেফাজত কর, সেভাবেই তোমরা আমাকে হেফাজত করবে। এর বিনিময়ে তোমাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। আমরা বায়আত করার জন্য দাঁড়ালাম। তখন আসআদ বিন যুরারা তাঁর হাত ধরে বললেন- হে মদ্বীনাবাসী! একটু থাম। আমরা এ কথা জেনেই উটের উপর আরোহন করে তাঁর কাছেই এসেছি যে, তিনি আল্লাহর রসূল। তিনি আমাদের কাছে চলে আসার অর্থই হচ্ছে সমগ্র আরবের সাথে তাঁর বিচ্ছেদ, তোমাদের সম্মানী ব্যক্তিগণ অকাতরে নিহত হবে এবং তলোয়ার তোমাদেরকে কেটে টুকরো টুকরো করবে। সুতরাং তোমরা যদি তারপরও সবুর করতে পার, তাহলে তাঁকে তোমাদের কাছে নিয়ে চল। আল্লাহ্ তোমাদেরকে বিনিময় দিবেন। আর তোমরা যদি তোমাদের জানের ভয় কর তাহলে তাঁকে এখনই বর্জন কর। এতে তোমরা আল্লাহর কাছে দুর্বলতার ওযূহাত পেশ করতে পারবে। তারা বললেন- হে আসআদ! তোমার হাত সরাও। আল্লাহর শপথ! আমরা কখনই এই অঙ্গিকার ভঙ্গ করবনা এবং বায়আত ফেরতও দিবনা। সুতরাং আমরা একজন একজন করে তার দিকে এগিয়ে গেলাম। আল্লাহর রসূল আমাদের থেকে উপরোক্ত বিষয়ে বায়আত নিলেন এবং তার বিনিময়ে আমাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিতে থাকলেন।

অতঃপর লোকেরা মদ্বীনায় ফেরত গেল। আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাদের সাথে আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম এবং মুসআব বিন উমাইরকে পাঠালেন। তারা মদ্বীনার লোকদেরকে কুরআন পড়াতে লাগলেন এবং আল্লাহর দ্বীনের দিকে মানুষকে আহবান করতে থাকলেন। তারা উভয়ে আসআদ বিন যুরারার নিকট অবতরণ করলেন। মুসআব সলাতে মুসলিমদের ইমামতি করতেন। তাদের সংখ্যা চল্লিশে পরিণত হলে তিনি তাদেরকে নিয়ে জুমআর সলাতও শুরু করলেন। মুসআব বিন উমায়ের ও আব্দুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুমের দাওয়াতে উসাইরাম ব্যতীত বনী আব্দুল আশহাল গোত্রের সকলেই মুসলমান হয়ে গেল। তিনি বিলম্ব করে উহুদ যুদ্ধের দিন ইসলাম গ্রহণ করলেন। কালেমা পাঠ করেই তিনি যুদ্ধের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়লেন এবং বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে

শাহাদাত বরণ করলেন। রসূল (ﷺ) তাঁর ব্যাপারেই বলেছেন- সে অল্প আমল করেছে এবং বিরাট পুরস্কার অর্জন করেছে।

মদ্বীনায় দ্রুত ইসলাম ছড়িয়ে পড়ল এবং ইসলামের বিজয়ের লক্ষণ পরিলক্ষিত হতে লাগল। অতঃপর মুসআব মক্কায় ফেরত গেলেন।

এই বৎসর হজ্জের মৌসুমে মুসলিম অমুসলিম মিলে মদ্বীনার আনসারদের থেকে প্রচুর সংখ্যক লোক মক্কায় আগমণ করল। তাদের দলনেতা ছিলেন বারা বিন মারুর।

তারা রাতের অন্ধকারে পূর্ব নির্ধারিত সময় মোতাবেক রসূল (ﷺ) এর সাথে গোপনে মিলিত হলেন। তারা সংখ্যায় ছিলেন ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা। এবার আকাবার (দ্বিতীয়) বাইআত সংঘটিত হল। বারা বিন মা'রুর সর্বপ্রথম বাইআত করলেন। সুতরাং সর্বপ্রথম বাইআত করার ফযীলতটি তিনিই অর্জন করলেন। সেই রাত্রে নাবী (ﷺ) তাদের থেকে ১২ জন নকীব (অধিনায়ক) নিযুক্ত করলেন। বায়আত শেষে তারা তলোয়ার হাতে নিয়ে মিনায় বসবাসকারী মুশরিকদের উপর হামলা করার জন্য রসূল (ﷺ) এর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করল। কিন্তু তিনি তাদেরকে সেই অনুমতি দেননি।

বাইয়াতের দফা সমূহ

ইমাম আহমাদ জাবির (রাঃ) হতে বাইয়াতের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। জাবির বলেছেন, 'আমরা আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমরা আপনার নিকট কোন শপথ গ্রহণ করব?'

তিনি বললেন, 'তোমরা যে কথার উপর শপথ গ্রহণ করবে তা হচ্ছে,

১. সুখে দুঃখে সর্ব অবস্থায় কথা শুনবে ও মেনে চলবে।

২. অভাবে ও স্বচ্ছলতায় একই ধারায় খরচ করবে।

৩. ভাল কাজের জন্য আদেশ করবে এবং মন্দকাজ থেকে বিরত থাকতে বলবে।

৪. আল্লাহর পথে দন্ডায়মান থাকবে এবং আল্লাহর ব্যাপারে কোন ভৎর্সনাকারীর ভৎর্সনার পরওয়া করবে না।

৫. যখন আমি তোমাদের নিকট হিজরত করে যাব তখন আমাকে সাহায্য করবে এবং যেমনভাবে আপন জান মাল ও সন্তানদের হেফাজত করছ সেভাবেই আমার হেফাজত করবে। এ সব করলে তোমাদের জন্য জান্নাত রয়েছে।

কা'ব (রাঃ)-এর বর্ণনা সূত্রে ইবনে ইসহাক্ব যে আলোচনা করেছেন তাতে শেষ ধারার (৫) কথা বলা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কুরআন তিলাওয়াত করলেন, আল্লাহর দ্বীনের প্রতি দাওয়াত এবং ইসলাম গ্রহণের প্রতি অনুপ্রেরণা দানের পর বললেন, 'আমি তোমাদের নিকট এ কথার শপথ গ্রহন করছি যে, তোমরা আমাকে ঐ সকল জিনিস থেকে হেফাযত করবে

যে সকল জিনিস থেকে তোমরা আপন ছেলেমেয়ে এবং আত্মীয়-স্বজনদের হেফাজত করে থাক।' এ কথা বলার পরেই বারা (রাঃ) বিন মা'রুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাত ধরে বললেন, 'ঐ সত্ত্বার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য নাবীরূপে প্রেরণ করেছেন, সুনিশ্চিত আমরা আপনাকে ঐ সকল অনিষ্ট থেকে হেফাজত করব, যে সকল অনিষ্ট থেকে আমাদের ছেলেমেয়ে ও আত্মীয়-স্বজনদের হেফাজত করি। অতএব, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আপনি আমাদের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করুন। আল্লাহর শপথ! আমরা যুদ্ধের সন্তান এবং অস্ত্র আমাদের খেলনা। আমাদের এ পদ্ধতি বাপদাদার কাল থেকে চলে আসছে।

কা'ব (রাঃ) বলেন যে, বারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন এমন সময় আবুল হায়সাম বিন তায়হান কথার ছেদ কেটে বললেন 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের ও কিছু মানুষের অর্থাৎ ইহুদীদের মধ্যে চুক্তি ও সন্ধির বন্ধন রয়েছে, আর আমরা এখন সে বন্ধন ছিন্ন করছি। তা হলে এ রকম তো হবে না যে, আমরা এরূপ করে ফেলি তারপরে আল্লাহ যখন আপনাকে জয়যুক্ত করবেন, তখন আপনি আমাদেরকে ছেড়ে দিয়ে নিজ জাতির দিকে ফিরে যাবেন।'

এ কথা শ্রবণের পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মৃদু হেসে বললেন, 'না, বরং তোমাদের রক্ত আমার রক্ত এবং তোমাদের ধ্বংস আমার ধ্বংস, আমি তোমাদেরই এবং তোমরাও আমারই। তোমরা যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে আমিও তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। তোমরা যাদের সঙ্গে সন্ধি করবে আমিও তাদের সঙ্গে সন্ধি করব।

বাইআতের বিপজ্জনক দিকগুলোর পুনঃ স্মরণ

অঙ্গীকারের শর্তাদি সংক্রান্ত আলাপ আলোচনা প্রায় সমাপ্তির পথে এবং লোকজনেরা যখন অঙ্গীকার গ্রহণ আরম্ভ করতে যাচ্ছেন এমন সময় প্রথম সারির দুজন মুসলিম যারা একাদশ বা দ্বাদশ নবুওয়াত বর্ষে হজ্জের মৌসুমে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা উঠে পড়েন, যাতে মানুষের সামনে তাদের দায়িত্বের নাজুকতা ও ভয়াবহতা অর্থাৎ সম্ভাব্য বিপদাপদের ব্যাপারটি ভালভাবে ব্যাখ্যা করার প্রেক্ষাপটে সমস্যার সকল দিক ভালভাবে অবহিত হওয়ার পর তারা শপথ গ্রহণ করে। এর পিছনে আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল তা হচ্ছে এ সকল লোকজন কতটুকু আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত রয়েছে তা অনুধাবন করা।

ইবনে ইসহাক্ব বলেছেন যে, যখন লোকজন অঙ্গীকার গ্রহণের জন্য একত্রিত হলেন তখন আব্বাস বিন উবাদাহ বিন নাযলাহ বললেন, 'তোমরা কি জানো যে, তাঁর সাথে (রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি ইঙ্গিত ছিল) কোন কথার উপর অঙ্গীকার গ্রহণ করতে যাচ্ছ?' তাঁরা সমবেত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'জী হ্যাঁ''।

আব্বাস (রাঃ) বললেন, ‘লাল ও কালো মানুষের বিরুদ্ধে জান্নাতের বিনিময়ে যুদ্ধ করার ব্যাপারে তোমরা তাঁর কাছে অঙ্গীকার গ্রহণ করতে যাচ্ছ। যদি তোমাদের এ রকম ধারণা যে, যখন তোমাদের সকল সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং তোমাদের দলের সম্ভ্রান্ত লোকজনকে হত্যা করা হবে তখন তোমরা তাঁর সঙ্গ ছেড়ে যাবে তাহলে এখনই ছেড়ে যাও। কেননা , তাঁকে নিয়ে যাওয়ার পর যদি তোমরা তাঁকে ছেড়ে দাও তাহলে ইহ ও পরকালের জন্য তা হবে চরম বেইজ্জতির ব্যাপার। আর যদি তোমাদের ইচ্ছা থাকে যে, তোমাদের ধনমাল ধ্বংসের এবং মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের হত্যা সত্ত্বেও এ চুক্তি সম্পন্ন করবে যার প্রতি তোমরা তাকে আহবান করছ তবে অবশ্যই তা গ্রহণ করবে। কেননা, আল্লাহর শপথ! এতেই ইহলৌকিক এবং পরলৌকিক জীবনের জন্য মঙ্গল রয়েছে।

এ কথা শ্রবণের পর সকলেই সমবেত কণ্ঠে বললেন, ‘ধন-সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের হত্যার মতো অত্যন্ত বিপদ সংকুল পরিস্থিতির বিনিময়ে এটা আমরা গ্রহণ করছি। তবে হাঁ একটি প্রাসঙ্গিক কথা, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমরা যদি যথাযথভাবে এ অঙ্গীকার পূরণ করি তবে প্রতিদানে আমাদের জন্য কি পুরষ্কারের ব্যবস্থা রয়েছে?

তিনি বললেন, ‘জান্নাত’’।

লোকেরা বললেন, ‘আপনার হাত মুবারক প্রশস্ত করুন।’

তিনি হাত প্রসারিত করলে লোকেরা তাঁর হাত ধারণ করে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন।

জাবির (রাঃ)-এর বর্ণনা হচ্ছে অঙ্গীকার গ্রহণের জন্য যে সময় আমরা দাঁড়ালাম সে সময় সত্তর জনের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ সদস্য আস’আদ বিন যুরারাহ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাত ধারণ করে বললেন, ‘ইয়াসরিববাসীরা! একটু থেমে যাও। আমরা উটের কলিজা নষ্ট করে (অর্থাৎ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে) এ বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে তাঁর খিদমতে উপস্থিত হয়েছি যে, তিনি আল্লাহর রাসূল (ﷺ)। আজ তাঁকে নিয়ে যাওয়ার অর্থ সমস্ত আরববাসীর সঙ্গে শত্রুতা, তলোয়ারের আঘাতে তোমাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের হত্যা এবং ধন-সম্পদের অসামান্য ক্ষয়-ক্ষতি। অতএব, যদি এ সব সহ্য করতে পার তবে তাকে নিয়ে চল। এ সবের বিনিময়ে আল্লাহর সমীপে তোমাদের জন্য যে মহা পুরষ্কারের ব্যবস্থা রয়েছে তা হচ্ছে ‘জান্নাত’’। আর যদি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর চাইতে এ সব কিছুই তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয় তবে এখনই তাঁকে ছেড়ে দাও। এটাই হবে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ওজর বা আপত্তি।

বাইআতের পূর্ণতা লাভ

বাইআতের শর্ত বা দফাসমূহ পূর্বেই নির্ধারণ করা হয়েছিল। এর ভয়াবহ দিক গুলো সম্পর্কে একবার ব্যাখ্যাও প্রদান করা হয়েছিল। যখন এ অতিরিক্ত সতর্কতার কথা বলা হল তখন লোকেরা সমস্বর বলে উঠলেন, ‘আস’আদ বিন যুরারাহ! নিজ হাত হটাও। আল্লাহর কসম! আমরা এ

অঙ্গীকার ছাড়তে কিংবা ভঙ্গ করতে পারি না।উপস্থিত জনতার এ উত্তরে আস'আদ বিন যুরারাহ ভালভাবে ওয়াকিফহাল হওয়ার সুযোগ লাভ করলেন যে, লোকেরা আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর জন্য কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত রয়েছেন। প্রকৃত পক্ষে আস'আদ বিন যুরারাহ মুসআব বিন উমায়েরের সাথে একযোগে মদীনায় ইসলাম প্রচার কার্যে লিপ্ত ছিলেন এবং সব চেয়ে বড় মুবাল্লে-গ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এ কারণে স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেয়া যায় যে, তিনি অঙ্গীকার গ্রহণকারীদের ধর্মীয় নেতাও ছিলেন। ফলে তিনিই সর্বপ্রথম অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন। এ জন্য ইবনে ইসহাক্বের বর্ণনায় রয়েছে যে, বনু নাজ্জার বলেছেন আবূ উমামা আস'আদ বিন যুরারাহ সর্ব প্রথম মানুষ যিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিলেন।এরপর সাধারণ অঙ্গীকার অনুষ্ঠিত হয়। জাবির (রাঃ)-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, আমরা একে একে দাঁড়ালাম আর নাবী কারীম (ﷺ) আমাদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন। আর এর বিনিময়ে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করলেন।

অবশিষ্ট রইলেন দুজন মহিলা যাঁরা সেখানেই উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের শপথ হল মৌখিক। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কখনও কোন পরস্ত্রীর সঙ্গে করমর্দন করেন নাই।

বারো জন নকীব

অঙ্গীকার পর্ব সম্পন্ন হলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অঙ্গীকারাবদ্ধ লোকদের মধ্যে থেকে বারোজন নেতা নির্বাচন করলেন। নির্বাচিত ব্যক্তিগণ নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন এবং আপন আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে অঙ্গীকারের ধারাসমূহ বাস্তবায়ণের ব্যাপারে জিম্মাদারী ও দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর এরূপ ইঙ্গিত ছিল যে, নিজেদের মধ্যে থেকে তাঁরা এমন সব নেতা নির্বাচন করবেন যাঁরা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সমস্যাবলী সমাধানের ব্যাপারে যথোপযোগী ভূমিকা পালন করবেন। তাঁর ইঙ্গিতে তড়িঘড়ি নেতা নির্বাচন পর্ব সমাপ্ত হল। নয়জন খাযরাজ এবং তিন জন আউস গোত্র থেকে মোট বারজন নেতা নির্বাচন করা হল।

খাযরাজ গোত্রের নেতাগণের নাম হচ্ছে যথাক্রমেঃ

(১) আস'আদ বিন যুরারাহ বিন আদাস

(২) সা'দ বিন রাবী'আহ বিন 'আমর

(৩) আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহাহ বিন সা'লাবাহ

(৪) রাফি বিন মালিক বিন আজলান

(৫) বারা বিন মা'রূর বিন সাখর

(৬) আব্দুল্লাহ বিন 'আমর বিন হারাম

(৭) উবাদা বিন সামিত বিন ক্বায়স

(৮) সা'দ বিন উবাদাহ বিন অইম

(৯) মুনযির বিন 'আমর বিন খুনাইস।

আউস গোত্রের নেতাগণ হচ্ছেন

, (১) উসাইদ বিন হুযাইর বিন সামাক

(২) সা'দ বিন খায়সামা বিন হারিস এবং

(৩) রিফাআ'হহা বিন আব্দুল মুনযির বিন যুবাইর।

যখন এ সকল নেতার নির্বাচন পর্ব সমাপ্ত হল তখন নাবী কারীম (ﷺ) তাঁদের নিকট থেকে পুনরায় অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন, ঈসা (আঃ)-এর পক্ষ যেভাবে হাওয়ারীগণের উপর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল সেভাবে আজ থেকে আপনাদের উপর আপন আপন সম্প্রদায়ের যিম্মাদারী বা দায়িত্ব অর্পিত হল। আর আমার উপর যিম্মাদারী বা দায়িত্ব ভার রইল সমগ্র মুসলিম জাতির। তাঁরা সকলে এক বাক্যে বলে উঠলেন 'জী হ্যাঁ''

নাবী (সাঃ) এবং মুসলিমদের মদীনায় হিজরত

আল্লাহর রসূল (ﷺ) মুসলমানদেরকে মদ্বীনায় হিজরতের অনুমতি দিলেন। মুসলিমগণ দ্রুত মদ্বীনায় হিজরত করতে লাগলেন। আবু সালামা এবং তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামা সর্বপ্রথম মদ্বীনার পথে বের হলেন। কিন্তু আবু সালামার শ্বশুর গোত্রের লোকেরা এসে উম্মে সালামাকে এবং শিশু সন্তান সালামাকে আটকিয়ে দিল। ঐ দিকে আবু সালামার গোত্রের লোকেরা এসে উম্মে সালামার কাছ থেকে নিজেদের গোত্রের সন্তান দাবী করে তারাও সালামাকে ছিনিয়ে নিল। আবু সালামা কঠিন ঈমানী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন এবং স্ত্রী-সন্তান ফেলে একাই মদ্বীনায় চলে গেলেন। এক বছর পর উম্মে সালামা তার শিশু সন্তান নিয়ে মদ্বীনায় হিজরত করলেন। উছমান বিন আবু তালহা তাকে মদ্বীনায় পৌঁছিয়ে দিলেন।

আবু সালামার পথ ধরে লোকেরা একের পর এক মদ্বীনায় হিজরত করতে থাকল। এক পর্যায়ে মক্কাতে রসূল (ﷺ), আবু বকর এবং আলী (রাঃ) ব্যতীত অন্য কোন মুসলিম অবশিষ্ট রইলনা। আবু বকর ও আলী রসূল (ﷺ)-এর আদেশেই মক্কায় রয়ে গেলেন। এ ছাড়া যে সমস্ত মুসলিমকে কুরাইশরা আটকিয়ে রেখেছিল তারাও রয়ে গেলেন। রসূল (ﷺ) হিজরতের জন্য প্রস্ত্তত হয়ে আল্লাহর আদেশের অপেক্ষায় ছিলেন। আবু বকরও প্রস্ত্তত ছিলেন।

মুশরিকরা যখন দেখল রসূল (ﷺ) এর সাথীগণ বের হয়ে যাচ্ছেন এবং সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদ নিয়ে মদ্বীনায় পাড়ি জমাচ্ছেন তখন তারা নিশ্চিত বিশ্বাস করে নিল, মুসলিমগণ অচিরেই মদ্বীনায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবেন। তারা জানত যে, মদ্বীনা সুরক্ষিত একটি দেশ এবং তার অধিবাসীরা যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী। অচিরেই মদ্বীনায় মুসলিমগণ শক্তিশালী হয়ে যাবে। তাই তারা আশঙ্কা করল যে, রসূল (ﷺ) ও মদ্বীনায় চলে যাবেন। সুতরাং বিষয়টি তাদের কাছে খুব বড় হয়ে দেখা দিল। তারা এ ব্যাপারে সিদ্বান্ত নেওয়ার জন্য দারুন্ নাদওয়ায় একত্রিত হল। তাদের বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ লোকদের কেউ অনুপস্থিত রইলনা। তাদের বন্ধু ও মুরববী ইবলীসও একজন নজদী শাইখের বেশ ধরে এবং শরীরে লম্বা চাদর জড়িয়ে বৈঠকে যথাসময়ে উপস্থিত হল। তারা রসূল (ﷺ) এর ব্যাপারে পরামর্শ শুরু করল। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মত প্রকাশ করতে লাগল। কিন্তু ইবলীস কোন রায়কেই পছন্দ করছিলনা। পরিশেষে আবু জাহেল বলল- আমি মনে করি প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে শক্তিশালী যুবককে আমরা বেছে নিব। তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে ধাঁরালো তলোয়ার থাকবে। তারা সকলে মিলে এক সাথে এক আঘাতেই মুহাম্মাদকে হত্যা করে ফেলবে। এতে সকল গোত্রের মধ্যে তার রক্ত ভাগ হয়ে যাবে। তারপর আব্দে মানাফ গোত্রের (মুহাম্মাদেও গোত্রের) লোকেরা এ ব্যাপারে কোন সিদ্বান্ত নিতে পারবেনা। তাদের পক্ষে সকল গোত্রের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করা ও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। আর দিয়ত দেয়ার প্রয়োজন হলে আমরা সকলে মিলেই তা পরিশোধ করে দিব।

এই প্রস্তাব শুনে শয়তান বলল- আল্লাহর শপথ! এটিই হচেছ সঠিক প্রস্তাব। সুতরাং তারা সকলে এই প্রস্তাবের উপরেই একমত হয়ে মজলিস ত্যাগ করল। ঐ দিকে জিবরীল ফিরিস্তা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে অহীর মাধ্যমে এই ষড়যন্ত্রের কথা রসূল (ﷺ) কে জানিয়ে দিলেন এবং সেই রাত্রে তাকে নিজ বিছানায় শয়ন করতে নিষেধ করলেন।

পরের দিন রসূল (ﷺ) স্বীয় চেহারা মুবারক আবৃত করে দিবসের মধ্যভাগে আবু বকরের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। অথচ তিনি এ রকম সময়ে ইতিপূর্বে কখনই আবু বকরের বাড়িতে আসতেন না। তিনি সেখানে গিয়ে বললেন- তোমার কাছে যারা আছে তাদের সকলকে বের করে দাও। আবু বকর (রাঃ) বললেন- হে আল্লাহর রসূল! এরা তো আপনারই পরিবার। তিনি তখন বললেন- আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে মদ্বীনায় হিজরত করার অনুমতি দিয়েছেন। আবু বকর তখন বললেন- হে আল্লাহর রসূল! আমিও আপনার সাথে যেতে চাই। তিনি বললেন- হ্যাঁ, তাই হবে। আবু বকর বললেন- আমার মা-বাপ আপনার জন্য কুরবান হোক! এই দু'টি বাহনের যে কোন একটি আপনি গ্রহণ করুন। রসূল (ﷺ) বললেন- হ্যাঁ, তবে মূল্য পরিশোধ করেই তা গ্রহণ করব। আলী (রাঃ) কে সেই রাত্রে তাঁর বিছানায় ঘুমাতে বললেন।

ঐ দিকে সন্ধ্যা নেমে আসতেই কুরাইশদের নির্বাচিত যুবকেরা একত্রিত হল। তারা রসূল (ﷺ) এর ঘরের দরজায় পাহারা দিতে লাগল এবং তিনি কখন ঘরে প্রবেশ করে নিদ্রা যাবেন সেই সময়ের অপেক্ষা করতে লাগল। তারা পরস্পর পরামর্শ করতে লাগল যে, কোন্ বদ নসীব যুবকটি সর্বাগ্রে আক্রমণ করার ঘৃণিত কাজটি সম্পন্ন করবে।

রসূল (ﷺ) ঘর থেকে বের হয়ে এক মুষ্ঠি মাটি হাতে নিয়ে কাফেরদের মাথায় নিক্ষেপ করতে লাগলেন। তারা তাঁকে দেখতেই পায় নি। তিনি মাটি নিক্ষেপ করছিলেন আর কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করছিলেনঃ

وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ

"এবং আমি তাদের সামনে ও পিছনে প্রাচীর স্থাপন করেছি, অতঃপর তাদেরকে আবৃত করে দিয়েছি, ফলে তারা দেখেনা"।

(সূরা ইয়াসীন-৩৬:৯)

তিনি আবু বকরের বাড়ির দিকে গেলেন। তারা উভয়েই রাতের অন্ধকারে ঘরের জানালা দিয়ে বের হয়ে পড়লেন।

তারা উভয়ে বের হয়ে যাওয়ার পর এক লোক এসে দেখল- রসূল (ﷺ) এর ঘরের দরজায় লোকেরা অপেক্ষা করছে। সে জিজ্ঞেস করল- তোমরা কিসের অপেক্ষা করছ? তারা বলল- আমরা মুহাম্মাদের অপেক্ষা করছি। সে বলল- তোমরা ব্যর্থ হয়েছ ও তোমাদের উদ্দেশ্য সফল হওয়ার নয়। আল্লাহর শপথ! সে তোমাদের পাশ দিয়েই বের হয়ে গেছে। সে তোমাদের মাথায় মাটি নিক্ষেপ করে চলে গেছে। তারা দাঁড়িয়ে নিজেদের মাথা হতে মাটি ঝেড়ে ফেলতে লাগল।

সকাল হলে আলী (রাঃ) ঘর থেকে বের হয়ে আসলেন। তারা তাঁকে নাবী (ﷺ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন- এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানিনা।

অতঃপর তিনি এবং আবু বকর (রাঃ) গারে ছাওরের কাছে গিয়ে তাতে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করার পর গুহার মুখে মাকড়শা জাল বুনিয়ে ফেলল।[1]

রসূল (ﷺ) এবং আবু বকর (রাঃ) মদ্বীনার রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পূর্ব হতেই আব্দুল্লাহ্ ইবনে উরাইকীত লাইছীকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিযুক্ত করে রেখেছিলেন। সে মদ্বীনার রাস্তা সম্পর্কে খুব পারদর্শী ছিল এবং সে তার গোত্রের ধর্মের উপরই ছিল। সে ছিল একজন বিশ্বস্ত লোক। তাই তার কাছে তাদের বাহন দু'টি সোপর্দ করলেন এবং তিন দিন পর গারে ছাওরের নিকট আসতে বললেন।

ঐদিকে কুরাইশরা তাদের সন্ধানে কোন প্রকার অলসতা করলনা। 'কাফা' তথা পদচিহ্ন দেখে যারা পথচারীর পরিচয় ও গতিপথ জানতে পারে তারা এমন লোককে সাথে নিয়েও অনুসন্ধান চালালো। অনুসন্ধান করতে করতে তারা একদম গুহার দরজায় এসে দাঁড়াল।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, আবু বকর (রাঃ) বললেন- হে আল্লাহর রসূল! তাদের কেউ যদি তার দৃষ্টি একটু নীচু করে তাহলেই আমাদেরকে দেখে ফেলবে। এ কথা শুনে নাবী (ﷺ) বললেন- হে আবু বকর! চুপ থাক। সেই দুই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার ধারণা কি? যাদের তৃতীয়জন হচ্ছেন আল্লাহ। তুমি চিন্তা করনা। আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। আবু বকর এবং রসূল (ﷺ) তাদের মাথার উপরে কাফেরদের কথা শুনছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে অন্ধ করে দিলেন। আমের বিন ফুহায়রা আবু বকরের ছাগল চরাত। আবু বকর ও রসূল (ﷺ) সম্পর্কে মক্কায় যা বলা হত সে তা শ্রবণ করত এবং গুহায় এসে তাদের কাছে সেই খবর পৌঁছে দিত। কিন্তু শেষ রাতে সে মক্কায় গিয়ে মক্কাবাসীদের সাথেই রাত্রি যাপন করত এবং সকালে তাদের সাথেই ঘর থেকে বের হত।

তারা গুহায় তিন দিন অবস্থান করলেন। কুরাইশদের অনুসন্ধানের আগুন যখন নিভে গেল তখন আব্দুল্লাহ্ ইবনে উরাইকীত বাহন দু'টি নিয়ে গুহার নিকট এসে উপস্থিত হল। তারা মদ্বীনার পথে যাত্রা শুরু করলেন। আমের ইবনে ফুহায়রা আবু বকরের পিছনে আরোহন করলেন। পথপ্রদর্শক ছিল তাদের সামনে। আল্লাহর চোখ তাদেরকে পাহারা দিচ্ছিল, তাঁর সাহায্য তাদের সঙ্গী ছিল এবং আল্লাহর রহমত ও দয়ার ছায়ায় নাবীর কাফেলা মদ্বীনার পথে অগ্রসর হতে লাগল।

মক্কার মুশরিকরা যখন নিরাশ হল তখন তারা আবু বকর ও রসূল (ﷺ) কে গ্রেপ্তারের বিনিময়ে বিরাট পুরস্কারের ঘোষণা দিল। লোকেরা পুরস্কারের আশায় তাদের অনুসন্ধানে কঠোর পরিশ্রম করল। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছাই বিজয়ী হবে। আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর কাফেলা যখন কুদাইদের উপর দিয়ে বনী মুদলাজ গোত্রের বস্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন বস্তির একজন লোক তাদেরকে দেখে ফেলে। সে সকলের সামনে দাঁড়িয়ে বলল- আমি এই মাত্র সাগরের তীর বেয়ে একটি

কাফেলাকে অতিক্রম করতে দেখেছি। আমার মনে হয় মুহাম্মাদ এবং তাঁর সাথীরা এই কাফেলায় রয়েছে। কথাটি শুনেই সুরাকা বিন মালেক বুঝে ফেলল এবং নিজেই সেই পুরস্কারটি অর্জন করতে চাইল। অতীতে এ রকম অনেক পুরস্কারই সে পেয়েছে। সে অন্যদের থেকে বিষয়টি গোপন রাখার মানসে বলতে লাগল- তোমার এই কথা বাদ দাও তো, তারা হচ্ছে উমুক এবং উমুক। তারা তাদের প্রয়োজনে বের হয়েছে। এই বলে সে সামান্য সময় অবস্থান করল। অতঃপর সে তার তাঁবুতে প্রবেশ করে খাদেমকে বলল- তাঁবুর পিছন দিয়ে ঘোড়াটি নিয়ে বের হও। টিলার পিছনে একটু পরেই আমি তোমার সাথে মিলিত হব। অতঃপর সে বর্শা হাতে নিয়ে বর্শার উপরের অংশ মাটির সাথে লাগিয়ে তা দিয়ে দাগ টানতে টানতে অগ্রসর হতে লাগল। ঘোড়ার নিকট পৌঁছে তাতে লাফ দিয়ে আরোহন করল এবং দ্রুত গতিতে চলতে লাগল। দ্রুত গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে সে একদম তাদের কাছে চলে গেল এবং রসূল (ﷺ) এর কুরআন তিলাওয়াত শুনতে পেল। তিনি ডানে বামে তাকাচ্ছিলেন না। আর আবু বকর (রাঃ) খুব বেশী এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলেন। আবু বকর তখন রসূল (ﷺ) কে বললেন- হে আল্লাহর রসূল! এই তো সুরাকা আমাদের কাছে এসে গেছে। আল্লাহর রসূল (ﷺ) তার বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন। তার ঘোড়ার সামনে পা দু'টি মাটিতে দেবে গেল। সুরাকা বলল- আমি অবশ্যই জানি, তোমাদের বদ দু'আর কারণেই এমনটি হয়েছে। আল্লাহর নিকট আমার জন্য দু'আ কর। আমি অঙ্গিকার করছি যে, যারা তোমাদের সন্ধানে বের হয়েছে আমি তাদেরকে ফিরিয়ে দিব।

রসূল (ﷺ) তার জন্য দু'আ করলেন। ঘোড়ার পা উঠে গেল। এবার সুরাকা রসূল (ﷺ) এর কাছে একটি পত্র লিখে দেয়ার আবেদন করল। রসূল (ﷺ) এর আদেশে আবু বকর (রাঃ) এক খন্ড চামড়ার উপর (নিরাপত্তা প্রদান সম্পর্কে) কিছু লিখে দিলেন। পত্রটি মক্কা বিজয়ের দিন পর্যন্ত তার সাথেই ছিল। মক্কা বিজয়ের দিন সুরাকা পত্রটি নিয়ে আসলে রসূল (ﷺ) তার সাথে কৃত অঙ্গিকার পূর্ণ করলেন এবং বললেন- আজ ওয়াদা-অঙ্গিকার পূর্ণ করার দিন, আজ উত্তম আচরণের দিন। সুরাকা রসূল (ﷺ) এবং আবু বকরের জন্য পাথেয় এবং বাহন পেশ করলে তারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। তারা বললেন- আমাদের তালাশে যারা বের হয়েছে তুমি শুধু তাদেরকে দূরে রাখ এবং তাদের কাছে আমাদের খবর গোপন রাখ। সে বলল- অবশ্যই তা করব। সে ফেরত গিয়ে দেখল- অনেকেই তাদের সন্ধান করছে। সুরাকা তাদেরকে বলতে লাগল-। আমি তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট খবর নিয়ে এসেছি। তারা এই দিকে নয়। সুরাকা দিনের প্রথমভাগে রসূলের শত্রু ছিল। আর দিবসের শেষভাগে তাঁর বন্ধু এবং রক্ষকে পরিণত হল।

তারা চলতে লাগলেন। চলার পথে উম্মে মা'বাদের তাঁবুর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। উম্মে মা'বাদ ছিল একজন সদাচরণকারী মহিলা। তাঁবুর পাশ দিয়ে অতিক্রমকারী লোকদেরকে সে পানাহার করাত। রসূল (ﷺ) এবং আবু বকর (রাঃ) তার কাছে জিজ্ঞেস করলেন- তোমার কাছে খাবার কিছু আছে কি? সে বলল- আল্লাহর শপথ! আমার কাছে খাবার কিছু থাকলে আমি

আপনাদের মেহমানদারী করতে মোটেই কার্পণ্য করতামনা। সেটি ছিল অভাবের বছর। খাদ্যাভাবে উম্মে মা'বাদের বকরীগুলো শুকিয়ে গিয়েছিল। রসূল (ﷺ) তাঁবুর এক পার্শ্বে একটি বকরী দেখতে পেলেন। তিনি বললেন- ওহে উম্মে মা'বাদ! এই বকরীটি এখানে কেন? উম্মে মা'বাদ বলল- দুর্বলতার কারণে এটি অন্যান্য বকরীর সাথে চলতে পারেনা। তাই এটি পিছনে রয়ে গেছে। নাবী (ﷺ) বললেন- বকরীটি কি দুধ দেয়? উম্মে মা'বাদ বলল- এটি দুর্বলতার কারণে চলতেই পারছেনা। দুধ আসবে কোথা হতে? তিনি বললেন- তুমি কি আমাকে এটি দোহন করার অনুমতি দিবে? সে বলল- আমার মা-বাপ আপনার জন্য কুরবান হোক! আপনি যদি তাতে কোন দুধ দেখেন তাহলে দোহন করতে পারেন। রসূল (ﷺ) বকরীর স্তনে হাত লাগালেন, বিসমিল্লাহ্ পাঠ করলেন এবং বরকতের দু'আ করলেন। দুধে বকরীর স্তন ভর্তি হয়ে গেল। তিনি পাত্র আনয়ন করতে বললেন। পাত্র আনয়ন করা হলে তাতে দুধ দোহন করলেন। পাত্র ভর্তি হয়ে দুধের ফেনা উপরে উঠতে লাগল। রসূল (ﷺ) তৃপ্তিসহকারে দুধ পান করলেন এবং তাঁর সাহাবীগণও পান করলেন। তিনি পুনরায় পান করলেন। দ্বিতীয়বারও তিনি পাত্র ভর্তি করে দুধ দোহন করে উম্মে মা'বাদের তাঁবু ত্যাগ করলেন।

কিছুক্ষণ পর উম্মে মা'বাদের স্বামী আবু মা'বাদ বকরীগুলো চালিয়ে নিয়ে ফেরত আসল। তাঁবুতে দুধ দেখে আবু মা'বাদ আশ্চার্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করল- তুমি দুধ কোথায় পেলে? বকরীগুলো খাদ্যাভাবে শুকিয়ে রয়েছে। বাড়ীতে কোন দুধেল ছাগলও নেই। সে বলল- আল্লাহর শপথ! আমাদের কাছ দিয়ে একজন বরকতময় লোক অতিক্রম করেছেন। তার ঘটনা ছিল এই এই। তার অবস্থা ছিল এ রকম এ রকম। আবু মা'বাদ বলল- আল্লাহর শপথ! আমার ধারণা এই লোকটিকেই কুরাইশরা খুঁজছে। হে উম্মে মা'বাদ আমার কাছে তার গুণাগুণ বর্ণনা কর। সুতরাং উম্মে মাবাদ আবু মাবাদের কাছে অত্যন্ত চমৎকার ও সুন্দরভাবে এবং হৃদয়গ্রাহী করে রসূলের গুণাগুণ ও পরিচয় তুলে ধরল। সে বলল- উজ্জল রং, জ্বলজ্বলে মুখ, সুমধুর আচরণ এভাবে শেষ পর্যন্ত। উম্মে মা'বাদের কাছে রসূল (ﷺ) এর প্রশংসা ও গুণাবলী শুনে আবু মা'বাদ বলল- আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই এই ব্যক্তিই হচ্ছেন তিনি যার সম্পর্কে কুরাইশরা বলাবলি করছে এবং যাকে তারা খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমার ইচ্ছা ছিল যে, আমি তাঁর সাথী হয়ে যাব। আমি যদি সুযোগ পাই তাহলে অবশ্যই তার সঙ্গী হব।

ঐদিকে মক্কায় উঁচু কণ্ঠে একটি কবিতা আবৃত্তির আওয়াজ শুনা যাচ্ছিল, কিন্তু কে তা আবৃত্তি করছে, তাকে দেখা যাচ্ছিল না, যার প্রথম লাইন হচ্ছে,

جزى الله رب العرش خير جزائه + رفيقين حلا خيمتي أم معبد

"আরশের প্রভু আল্লাহ্ তা'আলা ঐ দুইজন বন্ধুকে সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন, যারা উভয়েই উম্মে মাবাদের তাঁবুতে অবতরণ করেছেন। এভাবে শেষ পর্যন্ত। আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) বলেন- আমরা জানতাম না যে রসূল (ﷺ) কোন দিকে গিয়েছেন। কিন্তু মক্কার নীচু ভূমিতে একটি

জিন এসে কবিতার এই লাইনগুলো আবৃত্তি করতে লাগল। লোকেরা সেই আওয়াজ শুনে পিছে পিছে চলা শুরু করল। তবে তারা সেই জিনকে দেখতে পাচ্ছিলনা। পরিশেষে জিন মক্কার উঁচু ভূমি দিয়ে বের হয়ে গেল। আসমা বলেন- এই কবিতা শুনে আমরা বুঝতে পারলাম যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) মদ্বীনার দিকে চলে গেছেন।

মদীনায় মুহাম্মাদ (সাঃ)

রসূল (ﷺ) মক্কা হতে মদ্বীনার উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেছেন, এ কথা আনসারগণ যথা সময়েই জানতে পেরেছেন। তারা প্রতিদিন সকালে মদ্বীনার বাইরে হাররায় তথা কালো কালো পাথর বিশিষ্ট ভূমিতে এসে দুপুর পর্যন্ত রসূল (ﷺ) এর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। সূর্যের তাপ বেড়ে গেলে তারা ঘরবাড়িতে চলে যেত।

নবুওয়াতের ১৩তম বর্ষে রবীউল আওয়াল মাসের সোমবারের দিন প্রতিদিনের অভ্যাস মোতাবেক আল্লাহর রসূলকে সম্মানিত মেহমানের ন্যায় সাদরে গ্রহণ করে নেওয়ার জন্য তারা মদ্বীনার বাইরে বের হলেন। এ দিনও রসূলের আগমণের অপেক্ষায় থেকে সূর্যের তাপ বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথেই তারা ফেরত গেলেন।

ঐদিকে একজন ইহুদী তার কোন প্রয়োজনে মদ্বীনার কোন একটি টিলার উপর উঠল। টিলার উপর উঠেই সে আল্লাহর রসূল এবং তাঁর সাথীদেরকে আগমণ করতে দেখল। তাদের আলোকময় চেহারাগুলো চমকাচ্ছিল্ল এবং মরিচিকা তাদের সামনে থেকে সরে যাচ্ছিল। সেই ইহুদী উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করলঃ হে বনী কায়লা (আওস ও খাজরায গোত্রের লোকেরা)! এই তো তোমাদের নেতা চলে এসেছেন, যার জন্য তোমরা অপেক্ষা করছ। আনসারগণ দ্রুত অস্ত্র হাতে নিয়ে তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য অগ্রসর হলেন। বনী আমর বিন আওফ গোত্রের দিক থেকে তাকবীর ধ্বনি শুনা গেল। রসূলের আগমণে মুসলিমগণ আনন্দে আত্মহারা হয়ে তাকবীর পাঠ করলেন। তারা তাঁর সাথে সাক্ষাত করার জন্য বের হয়ে পড়লেন, নবুওয়াতের মহা সম্মানের প্রতি খেয়াল রেখে সুন্দর সুন্দর বাক্যের মাধ্যমে তারা আল্লাহর নাবীকে স্বাগত জানালেন। আনসারগণ চতুর্দিক থেকে তাঁকে পাহারা দিচ্ছিলেন এবং তাঁর প্রতি স্বজাগ দৃষ্টি রাখছিলেন। এ সময় প্রশান্তি ও স্বস্তির এক ছায়াঘন পরিবেশ তাঁকে ঢেকে রাখছিল। এ সময় তাঁর উপর কুরআনের এই আয়াত নাযিল হল-

فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلاهُ وجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالمَلاَئِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ

‘‘(আর যদি নাবীর বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য কর, তবে জেনে রেখো) আল্লাহ্, জিবরাঈল এবং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনগণ তাঁর সহায়। উপরন্তু ফিরিস্তাগণও তাঁর সাহায্যকারী’’। (সূরা তাহরীম-৬৬:৪)

অতঃপর রসূল (ﷺ) চলতে লাগলেন। কুবায় পৌঁছে তিনি বনী আমর বিন আওফ গোত্রে এসে কুলছুম বিন হাদমের নিকট অবতরণ করলেন। কেউ বলেছেন- তিনি সা’দ বিন খাইছামার বাড়িতে অবতরণ করেছিলেন। তিনি কুবাতে ১৪ দিন অবস্থান করলেন। তিনি সেখানে কুবা মসজিদ প্রতিষ্ঠা করলেন। নবুওয়াতের পর এটিই ছিল প্রথম মসজিদ। জুমআর দিন আল্লাহর অনুমতিক্রমে মদ্বীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। বনী সালেম গোত্রের নিকট পৌঁছলে জুমআর সলাতের সময় হয়ে গেল। বনী সালেমের উপত্যকায় তিনি সাহাবীদের নিয়ে জুমআর সলাত আদায় করলেন। সলাতের পর তিনি আবার আরোহন করলেন। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে লোকেরা

উটের লাগাম ধরে ধরে বলতে লাগল- আপনি আমাদের কাছে অবতরণ করুন। আমাদের কাছে রয়েছে সকল প্রকার প্রস্তুতি, রয়েছে অস্ত্র ও প্রতিরোধ ক্ষমতা। তিনি বললেন- উটনীকে যেতে দাও। কারণ সে আল্লাহর পক্ষ হতে আদেশ প্রাপ্ত, তাকে ছেড়ে দাও, সে যেখানে ইচ্ছা সেখানেই অবতরণ করবে।

উটনীটি তাঁকে নিয়ে চলতেই থাকল। যখনই কোন আনসারীর বাড়ির পাশ দিয়ে অতিক্রম করত তখনই তারা এই কামনা করত যে, আল্লাহর রসূল তাদের কাছেই অবস্থান করুক। আর তিনি একই কথা বলতেন- উটনীকে যেতে দাও। কারণ সে আল্লাহর পক্ষ হতে আদেশ প্রাপ্ত। সে যেখানে ইচ্ছা সেখানেই অবতরণ করবে।

উটনী চলতেই থাকল। অতঃপর আজ যেখানে রসূলের মসজিদ রয়েছে সেখানে এসে উটনী বসে পড়ল। নাবী (ﷺ) উটনীর উপরেই বসে রইলেন। উটনী পুনরায় দাঁড়াল এবং একটু অগ্রসর হল। অতঃপর আগের জায়গায় এসে পুনরায় বসে পড়ল। তিনি এবার উটনীর পিঠ থেকে অবতরণ করলেন। এই স্থানেই ছিল রসূল (ﷺ) এর মামাদের বাসস্থান। আল্লাহ্ তা'আলা উটনীকে সঠিক স্থান নির্ধারণের তাওফীক দিয়েছিলেন। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা চেয়েছিলেন যে, তাঁর রসূলের মেহমানদারীর সম্মানটি তাঁর মামাদের জন্যই অর্জিত হোক। সুতরাং তারা রসূল (ﷺ) কে তাদের বাসস্থানে অবতরণ করার আবেদন করতে লাগলেন। আবু আইয়্যুব আনসারী (রাঃ) দ্রুত সামনে এগিয়ে রসূল (ﷺ) এর ভ্রমণ সামগ্রী ও মালপত্র নিজের ঘরে ঢুকিয়ে ফেললেন। রসূল (ﷺ) তখন বলতে লাগলেন- কোন লোক তাঁর সফর সামগ্রীর সাথেই চলে থাকে। ঐ দিকে আসআদ বিন যুরারা রসূল (ﷺ) এর উটনীকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে নিলেন। পরে সেটি তাঁর কাছেই ছিল।

মদ্বীনায় প্রিয় নাবীর আগমনে আনন্দের স্রোত বইতে লাগল। কবিতা ও ছন্দের মাধ্যমে তারা আনন্দ প্রকাশ করছিলেন। এ মর্মে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। আবু কাইস সিরমাহ আনসারী (রাঃ) এর কবিতায় সেই আনন্দের কিছু অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আববাস (রাঃ) তাঁর কাছে গিয়ে কবিতাংশটি মুখস্ত করে নিয়েছিলেন। সেই কবিতার কয়েকটি লাইন হচ্ছে,

1- ثَوَى فى قُرَيْشٍ بِضْعَ عَشْـرَةَ حِجَّةً + يُذَكِّرُ لَوْ يَلْقَى حَبِيباً مُوَاتِــيَا

2- وَيَعْـرِضُ فى أَهْلِ المَوَاسِـمِ نَفْسَهُ + فَلَمْ يَرَ مَنْ يُؤوِي وَلَمْ يَرَ دَاعِـيَا

3- فَلَمَّا أَتَانَا وَاسْتَقَرَتْ بِهِ النَّــوَى + وأَصْبَـحَ مَسْرُورَاً بِطَيْبَبَةَ رَاضِيَا

4- وَأَصْبَحَ لاَ يَخْشَى ظُلاَمَةَ ظَـالِمٍ + بَعِيدٍ وَلاَ يَخْشَى مِنَ النَّاسِ بَاغِيَا

5- بَذَلْنَا لَهُ الأَمْـوَالَ مِنْ حِلِّ مَالِنـا + وَأَنْفُسَنَا عِنْدَ الوَغَى والتَآسِـيَا

6- نُعَادِى الَّذِى عَادَى مِنَ النَّاس كُلِّهِمْ + جَمِيعاً وَإِنْ كَانَ الحَبِيبَ المُصَافِيَا

7- وَنَعْلَـمُ أَنَّ اللهَ لاَ رَبَّ غَيْــرُهُ + وَأَنَّ كِتَابَ اللهِ أَصْبَــحَ هَادِيَا

(১) তিনি (রসূল (ﷺ) মক্কার কুরাইশদের মাঝে ১৩ বছর অবস্থান করে লোকদের নসীহত করেছেন। এই আশায় হয়ত কোন সাহায্যকারী বা বন্ধু পাবেন।

(২) হাজ্জ কিংবা অন্যান্য মৌসুমে মানুষের কাছে নিজেকে পেশ করেছেন, কিন্তু কোন আশ্রয়দাতা পেলেন না এবং তাঁকে কেউ আহবানও করল না।

(৩) তিনি যখন আমাদের নিকট চলে আসলেন তখন থেকে মদ্বীনায় খুশী মনে ও সন্তুষ্ট চিত্তে বসবাস করতে থাকলেন।

(৪) কোন জালেমের জুলুম এবং মানুষের মধ্যে কোন সীমালংঘন কারীরও ভয় রইলনা।

(৫) আমরা তাঁর জন্য জান ও হালাল সম্পদ উৎসর্গ করলাম। বিশেষ করে লড়াইয়ের ময়দানে এবং অন্যান্য স্থানে যখন তা ব্যয় করার প্রয়োজন হয়েছিল।

(৬) সকল মানুষের মধ্য হতে আমাদের যে ব্যক্তি তাঁর সাথে দুশমনী করে আমরা তাঁকে শত্রু মনে করি। যদিও সে আমাদের বন্ধু হয়ে থাকে।

(৭) আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহই আমাদের প্রভু, তিনি ছাড়া আমাদের অন্য কোন রব নেই। আর আল্লাহর কিতাবই আমাদের পথ প্রদর্শক।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন- নাবী (ﷺ) মক্কায় ১৩ বছর অবস্থান করেছেন। অতঃপর তাঁকে হিজরত করার আদেশ দেয়া হয়েছে। তখন তাঁর উপর কুরআনের এই আয়াত অবতীর্ণ হয়-

وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا

“বলঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দাখিল কর সঠিক স্থানে এবং আমাকে বের কর সঠিক রূপে এবং দান কর আমাকে নিজের কাছ থেকে রাজকীয় সাহায্য”। (সূরা ইসরা-১৭:৮০)

বিশিষ্ট তাবেয়ী কাতাদাহ (রহঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন- আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর রসূলকে মক্কা থেকে মদ্বীনায় উত্তম স্থানে বের করলেন। আল্লাহর নাবী জানতেন যে, শক্তি ও সাহায্য ছাড়া এই পৃথিবীতে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তাই আল্লাহর কাছে শক্তি ও সাহায্যকারী প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ্ তাঁকে মক্কাতে অবস্থান কালেই দারুল হিজরত দেখালেন। তখন তিনি সাহাবীদেরকে বললেন- আমাকে তোমাদের হিজরতের স্থান দেখানো হয়েছে। তা হচ্ছে লবণাক্ত ভূমি, তাতে রয়েছে খেজুর গাছ, এবং কালো পাথর দিয়ে ঢাকা দু’টি ভূখন্ডের মাঝখানে তা অবস্থিত।

বারা বিন আযিব (রাঃ) বলেন- রসূল (ﷺ) এর সাহাবীদের মধ্য হতে সর্বপ্রথম আমাদের কাছে মুসআব বিন উমাইর এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুম আগমণ করলেন। তারা উভয়েই লোকদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতে লাগলেন। অতঃপর আম্মার বিন ইয়াসির, বিলাল বিন রাবাহ এবং সা’দ বিন আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) আসলেন। তাদের পথ ধরেই ২০ জনের একটি কাফেলা নিয়ে উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) আগমন করলেন। সকলের শেষে হিজরত করলেন রসূল (ﷺ)।

বারা বিন আযিব (রাঃ) বলেন- রসূলের আগমণে মদ্বীনাবাসীগণ যে রকম খুশী হয়েছিলেন অন্য কোন সময় তাদেরকে এত খুশী হতে দেখিনি। এমনকি নারী, শিশু এবং দাস-দাসীদেরকেও বলতে শুনেছি, এই তো আল্লাহর রসূল আমাদের কাছে চলে এসেছেন।

আনাস (রাঃ) বলেন- রসূল (ﷺ) যেদিন মদ্বীনায় এসে পৌঁছলেন সেদিন আমি উপস্থিত ছিলাম। তিনি যেদিন আমাদের কাছে মদ্বীনায় প্রবেশ করলেন সেদিনের চেয়ে অধিক আলোকিত ও সুন্দর দিন আর কখনও দেখিনি। আর আমি রসূল (ﷺ) এর মৃত্যুর দিনও উপস্থিত ছিলাম। ঐদিনের চেয়ে অধিক অন্ধকারাচ্ছন্ন ও দুঃখের দিন আর কখনও দেখিনি।

অতঃপর তাঁর মসজিদ এবং বাসগৃহ নির্মাণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি আবু আইয়্যুব আনসারী (রাঃ) এর বাড়ীতেই অবস্থান করতে থাকলেন। আবু আইয়্যুব আনসারী (রাঃ) এর বাড়িতে অবস্থান কালেই তিনি যায়েদ বিন হারেছা এবং আবু রাফে (রাঃ) কে দু'টি উটসহ এবং পাঁচশ দিরহাম দিয়ে মক্কায় পাঠালেন। তারা মক্কায় গিয়ে তাঁর কন্যা ফাতেমা, উম্মে কুলছুম, তাঁর স্ত্রী সাওদা, উসামা বিন যায়েদ এবং উসামার মাতা উম্মে আয়মান (রাঃ) কে মদ্বীনায় নিয়ে আসলেন। কিন্তু রসূল (ﷺ) এর আরেক কন্যা যায়নাব (রাঃ) আবুল আসের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। সে তাঁকে আটকিয়ে রেখেছিল। ঐদিকে আবু বকর (রাঃ) এর ছেলে আব্দুল্লাহ্ আবু বকরের পরিবারের সকলকে নিয়ে বের হল। তাদের মধ্যে উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রাঃ) ও ছিলেন। তারা এসে হারেছা বিন নু'মানের বাড়িতে অবতরণ করলেন।

নতুন সমাজ ব্যবস্থার রূপায়ণ

ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মদীনায় আগমন করে প্রথম হিজরী রবিউল আওয়াল মাসের ১২ই তারীখে জুমআর দিন মোতাবেক ২৭শে সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে বনী নাজ্জার গোত্রের আবূ আইউব আনসারীর বাড়ির সম্মুখে অবরতণ করেছিলেন এবং বলেছিলেন 'ইন-শা-আল্লাহ এটাই হবে আমার অবস্থান।' তারপর তিনি আবূ আইউব আনসারীর বাড়িতে স্থানান্তর হয়ে যান।

মসজিদে নববীর নির্মাণ

ইমাম যুহরী বলেন- বর্তমানে যেখানে মসজিদে নববী অবস্থিত সেখানে এসেই নাবী (ﷺ) এর উটনী বসে পড়েছিল। সেই স্থানেই তাঁর হিজরতের পূর্বে মুসলিমগণ সলাত আদায় করতেন। এই জায়গাটি ছিল আসআদ বিন যুরারার প্রতিপালনাধীন সাহল ও সুহাইল নামক দুইজন ইয়াতীম বালকের। তাতে সে সময় উট বাঁধা হত। নাবী (ﷺ) জায়গাটি খরীদ করে তাতে মসজিদ নির্মাণের ব্যাপারে কথা বললেন। বালক দু'টি বলল- বরং আমরা তা বিনা মূল্যে দান করতে চাই। কিন্তু নাবী (ﷺ) তা বিনা মূল্যে নিতে অস্বীকার করলেন। পরিশেষে তিনি উহা দশ দ্বীনারের বিনিময়ে ক্রয় করে নিলেন।

সে সময় মসজিদে নববীর চারটি দেয়াল ছিল। কোন ছাদ ছিলনা। কিবলা ছিল বাইতুল মাকদিস। রসূল (ﷺ) এর মদ্বীনায় আগমনের পূর্বে আসআদ বিন যুরারা সেখানে মুসলিমদেরকে সলাত ও জুমআ পড়াতেন। সেখানে ছিল গারকাদ ও খেজুর গাছ এবং মুশরিকদের কবর। রসূল (ﷺ) এর আদেশে মুশরিকদের কবরগুলোকে উঠিয়ে ফেলা হয় এবং খেজুর ও অন্যান্য গাছগুলোকে কেটে কিবলার দিকে সারিবদ্ধভাবে রেখে দেয়া হয়। মসজিদটি কিবলার দিক থেকে পিছনের দেয়াল পর্যন্ত একশ হাত লম্বা ছিল। বাকী দুই দিকেও অনুরূপ বা তার চেয়ে একটু কম ছিল। ভিত্তিমূল ছিল তিন হাত পরিমাণ। এর উপরই মুসলিমগণ তা কাঁচা ইট দিয়ে তৈরী করেছেন। রসূল (ﷺ) ও তাদের সাথে নির্মাণ কাজে অংশ গ্রহণ করেছেন এবং পাথর ও ইট বহন করেছেন। এ সময় তিনি নিম্নের লাইনগুলো পাঠ করতেন-

اللَّهم لا عَيْشَ إلاَّ عَيْشُ الآخِرةْ + فَاغْفِرْ للأَنْصَارِ وَالمُهَاجِـرَةْ

"হে আল্লাহ! আখিরাতের জীবনই আসল জীবন। তুমি আনসার ও মুহাজিরদেরকে ক্ষমা কর"। তিনি আরও বলতেন-

هَذَا الحِمَالُ لا حِـمَالُ خَيْبَر + هَـذَا أَبَـرُّ رَبَّـنَا وَأَطْهَرُ

"এগুলো খায়বার থেকে আগত খেজুর বা পণ্যের বোঝা নয়; বরং এগুলো ইটের বোঝা এবং এই কাজ আমাদের প্রভুর আনুগত্যের প্রতি ও পবিত্র জীবনের প্রতি উৎসাহ দানকারী"। সাহাবীগণও রসূল (ﷺ)-এর সাথে ইট বহন করতেন আর এই ধরণের ছন্দ পাঠ করতেন। তাদের কেউ কেউ বলতেন-

لَئِنْ قَعَدْنَا وَالرَّسُولُ يَعْمل + لَـذَاكَ مِـنَّا العَمَلُ المُضَـلَّلُ

"আমরা যদি বসে থাকি, আর আল্লাহর রসূল কাজ করেন, তাহলে আমাদের জন্য হবে এটি মারাত্মক ভুল।

তিনি বাইতুল মাকদিসের দিকে মসজিদের কিবলা নির্ধারণ করেন। পিছনের দিকে তিনটি দরজা রাখেন। আরেকটি দরজা রাখেন, যার নাম ছিল বাবে রহমত। তৃতীয় আরেকটি দরজা রাখেন, যা দিয়ে রসূল (ﷺ) মসজিদে প্রবেশ করতেন। খেজুরের কাঠ দিয়ে এর খুঁটি নির্মাণ করেন আর

ছাদে খেজুর গাছের শাখা স্থাপন করেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল- আপনি কি এর উপর ছাদ নির্মাণ করবেন না? তিনি বললেন- না, বরং এটি মুসা (আঃ) এর চালাঘরের ন্যায়ই থাকবে। মসজিদে নববীর পাশেই তিনি তাঁর স্ত্রীদের ঘরও কাঁচা ইট দিয়ে তৈরী করেন। খেজুরের শাখা ও কাঠ দিয়ে তার ছাদ নির্মাণ করেন। গৃহ নির্মাণ শেষে তিনি আয়িশা (রাঃ) এর সাথে সেই নব নির্মিত ঘরে বাসর করেন, যেটি তিনি মসজিদে নববীর পূর্ব প্রান্তে নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী সাওদার জন্য আরেকটি গৃহ নির্মাণ করেন।

মুসলিমগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন

মসজিদে নাবাবীর নির্মাণ কাজে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং মুসলিমগণ যেভাবে পারস্পরিক বোঝাপড়া, সাহায্য সহযোগিতা এবং উৎসাহ-উদ্দীপনার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন তেমনভাবে মুসলিমগণের মধ্যে এমন অপূর্ব এক ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন যার তুলনা মানব জাতির ইতিহাসে কোথাও মিলে না। মুসলিমগণের এ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে 'মুহাজির ও আনসারগণের ভ্রাতৃত্ব বন্ধন' নামে অভিহিত করা হয়েছে। ইবনুল কাইয়্যেম লিখেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আনাস বিন মালেকের গৃহে মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করিয়েছিলেন। এ সভায় সর্বশেষ নব্বই জন মুসলিম উপস্থিত ছিলেন, অর্ধেক সংখ্যক ছিলেন মুহাজির এবং অর্ধেক সংখ্যক আনাসার। 'মুহাজির আনসার ভ্রাতৃত্বের' মূলনীতি গুলো ছিল, 'একে অন্যের দুঃখে দুঃখিত হবেন এবং মৃত্যুর পর নিজ আত্মীয়ের মতো একে অন্যের ওয়ারেস বা উত্তরাধিকারী হবেন। ওয়ারাসাত বা উত্তরাধিকারের এ ব্যবস্থা বদর যুদ্ধ পর্যন্ত চালু ছিল। তারপর যখন এ আয়াতে শরীফা,

(وَأُوْلُوْا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ) [الأنفال: 75]

''কিন্তু আল্লাহর বিধানে রক্ত সম্পর্কীয়গণ পরস্পর পরস্পরের নিকট অগ্রগণ্য।'

(আল-আনফাল ৮ :৭৫)

বলা হয়ে থাকে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কেবলমাত্র মুহাজিরীনদের মধ্যে আরও এক ভ্রাতৃত্ব বন্ধন গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু প্রথম মতটিই অধিক প্রামণ্য ও গ্রহণযোগ্য। কেননা, মুহাজিরীনগণ এমনিতেই পরস্পর ইসলামী ভ্রাতৃত্বে, দেশীয় ও গোত্রীয় ভ্রাতৃত্বে এবং আত্মীয়তার বন্ধনের কারণেই তাঁদের মধ্যে নতুন করে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু আনসারদের ব্যাপারটি ছিল ভিন্ন।

এ ভ্রাতৃত্বের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মুহাম্মাদ গাযালী লিখেছেন যে, 'এ ছিল মূর্খতার যুগের বংশীয় সম্পর্ক ছিন্নকারী। আত্মীয়তা বা অনাত্মীয়তার সম্পর্ক যা কিছু হবে তা হবে ইসলামের জন্য। এরপর থেকে মানুষে মানুষে বংশ, বর্ণ ও দেশের সম্পর্ক মুছে যাবে। উঁচু, নীচু ও মানবত্বের মাপকাঠি হবে কেবলমাত্র তাকওয়ার ভিত্তিতে, অন্য কোন কিছুর ভিত্তিতে নয়।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে শুধুমাত্র ফাঁকা বুলির পোষাক পরে ক্ষান্ত হন নি, বরং এ ছিল এমন এক কার্যকর অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি যা রক্ত ও ধন-সম্পদের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। এটা শুধু ফাঁকা বুলি এবং গতানুগতিক সালাম ও মুবারকবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এ ভ্রাতৃত্বের মধ্যে ছিল সমবেদনা, সহযোগিতা ও সহমর্মিতার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। আর এ কারণেই তাঁর পরিকল্পিত ও প্রতিষ্ঠিত এ নবতর জীবনধারা মানব জাতির ইতিহাসে এমন এক অধ্যায় রচনা করেছিল কোন কালেই যার কোন তুলনা মিলে না।

সহীহুল বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, মুহাজিরগণ যখন মদীনায় আগমন করলেন তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) এবং সা'দ বিন রাবীর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপনে করিয়ে

দিয়েছিলেন। এর পর সা'দ (রাঃ) আব্দুর রহমানকে (রাঃ) বললেন, 'আনসারদের আমি সর্বাপেক্ষা ধনী ব্যক্তি। আপনি আমার সম্পদ দু'ভাগে ভাগ করে অর্ধেক গ্রহণ করুন। তাছাড়া, আমার দুজন স্ত্রী রয়েছে। দুজনের মধ্যে যাকে আপনার পছন্দ হয় আমাকে বলুন, আমি তাকে তালাক দিব। ইদ্দত পালনের পর তাকে বিবাহ করবেন।'

আব্দুর রহমান (রাঃ) বললেন, 'আল্লাহ আপনার ধনজন ও মালমাত্তায় বরকত দিন। আপনাদের বাজার কোথায়?' তাঁকে বনু ক্বাইনুক্বা'র বাজার দেখিয়ে দেয়া হল। তিনি যখন বাজার থেকে ফিরে এলেন তখন তাঁর নিকট অতিরিক্ত কিছু পনির ও ঘি ছিল। এরপর তিনি প্রত্যহ বাজারে যেতে থাকলেন। তারপর একদিন যখন তিনি বাজার থেকে ফিরে এলেন তখন তাঁর শরীরে হলুদ রঙের চিহ্ন ছিল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কী?' তিনি বললেন, 'আমি বিবাহ করেছি।' রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, 'স্ত্রীকে মোহর দিয়েছ তো?' তিনি বললেন, 'একটি খেজুরের বিচী পরিমাণ স্বর্ণ (অর্থাৎ সোয়া ভরি) দিয়েছি।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে এরূপ একটি বর্ণনা এসেছে যে, আনাসারগণ রাসূলুল্লাহ (রাঃ)-এর নিকট এ বলে আবেদন পেশ করলেন যে, 'আপনি আমাদের এবং মুহাজিরীন ভাইদের মধ্যে আমাদের খেজুর বাগানগুলো ভাগ বন্টন করে দিন''। তিনি বললেন, 'না''।

আনসারগণ বললেন, 'তবে আপনারা অর্থাৎ মুহাজিরগণ আমাদের কাজ করে দেবেন এবং তাদেরকে আমরা ফলের অংশ দিব।

তারা বললেন, 'ঠিক আছে, আমরা কথা শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম।

এ থেকে সহজে অনুমান করা যায় যে, আনাসারগণ কিভাবে আন্তরিকতা ও আগ্রহের সঙ্গে আগু বেড়ে মুহাজির ভাইদের জন্য সহমর্মিতা প্রকাশ ও সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করেছিলেন এবং কতটুকু মহববত, খলুসিয়াত ও আত্মত্যাগের সঙ্গে কাজ করেছিলেন। অধিকন্তু, মুহাজিরগণও তাঁদের আনসার ভাইদের প্রতি কতটুকু শ্রদ্ধাশীল, সহমর্মী ও আত্মসচেতন ছিলেন তা এ ঘটনা থেকেই প্রমাণিত হয়ে যায়। আনসারগণের আত্মত্যাগের সুযোগ তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু সুযোগের অপব্যবহার কখনই করেন নি। তাঁদের ভেঙ্গে যাওয়া জীবনধারাকে ন্যূনতম প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে সচল করে তোলার জন্য যতটুকু গ্রহণ করার প্রয়োজন ছিল তাঁরা ঠিক ততটুকুই গ্রহণ করেছিলেন।

এ প্রসঙ্গটি সম্পর্কে সত্য কথা এবং এর গূঢ় রহস্য সম্পর্কে বলতে গেলে কথা অবশ্যই বলতে হয় যে, এ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের ভিত্তি ছিল অভাবিত ও অপূর্ব। আল্লাহ দর্শন এবং বিজ্ঞানের উর্বর পলল ভূমিতে উপ্ত হয়েছিল ইসলামী রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় নীতিমালার বীজ যার ফলে মুসলিমগণের সম্মুখে সৃষ্ট সকল সমস্যার সমাধান হয়েছিল সর্বোত্তম পন্থায়।

পরস্পরে ইসলামী সাহায্যের অঙ্গীকার

উপরি উল্লেখিত ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের মতই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুসলিমগণের মধ্যে আরও একটি অঙ্গীকারপত্র সম্পাদন করেছিলেন যদ্দ্বারা জাহেলিয়াত যুগের সকল গোত্রীয় গন্ডগোলের মূলোৎপাটন এবং যাবতীয় কুসংস্কার ও রসম-রেওয়াজের বিলোপ সাধন ঘটে। এ অঙ্গীকারনামার দফাগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল যার রূপ ছিল এ ধরণেরঃ

এটা লিখিত হচ্ছে নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর পক্ষ থেকে কুরাইশ, ইয়াসরেবী এবং তাঁদের অনুসারী ও তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে জিহাদে অংশগ্রহণকারী মুসলিমগণের জন্যঃ

১. এরা নিজেদের ছাড়া অন্য সকল মানব থেকে ভিন্ন একটি গোষ্ঠি।

২. কুরাইশ মুহাজিরগণ নিজেদের পূর্বেকার অবস্থা মোতাবেক নিজেদের মধ্যে দিয়াত (হত্যার বিনিময়) দেবেন এবং মু'মিনদের মধ্যে ইনসাফের সঙ্গে বন্দীদের মুক্তিপণ প্রদান করবেন। আনসারদের সকল গোত্র নিজেদের পূর্বেকার অবস্থা মোতাবেক নিজেদের মধ্যে দিয়াত প্রদান করবেন এবং তাঁদের সকল দল ঈমানদারদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত পন্থায় আপন বন্দীদের জন্য মুক্তিপণ প্রদান করবেন।

৩. ঈমানদারগণ কোন সহায় সম্পদহীন (অনাথ) কে মুক্তিপণ ও দিয়াত প্রদানের ব্যাপারে উত্তম পন্থা মোতাবেক প্রদান এবং সম্মান করা থেকে বিমুখ করবেন না।

৪. সকল ধর্মপ্রাণ মু'মিন ঐ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধাচরণ করবেন যারা তাঁদের প্রতি অন্যায় আচরণ করবে অথবা ঈমানদারদের বিরুদ্ধে অন্যায়, অত্যাচার, পাপ ও গন্ডগোলের পথ বেছে নেবে।

৫. মু'মিনগণ তাদের বিরুদ্ধে কাজ করবেন যদিও তাদের মধ্যে কেউ আপন পুত্রও হয়।

৬. কোন কাফিরের বদলে কোন মু'মিন কোন মু'মিনকে হত্যা করবেন না।

৭. কোন মু'মিন কোন মু'মিনের বিরুদ্ধে কোন কাফিরকে সাহায্য করবেন না।

৮. আল্লাহর যিম্মা (অঙ্গীকার) একই হবে। একজন সাধারণ মানুষের প্রদানকৃত যিম্মা সকল মুসলমানের জন্য সমানভাবে পালনযোগ্য হবে।

৯. যে সকল ইহুদী মুসলিমগণের অনুগামী হবে তাদের প্রয়োজনে সাহায্য করতে হবে এবং তারা অন্য মুসলিমগণের মতো হয়ে যাবে। তাদের প্রতি কোন অন্যায় করা যাবে না। কিংবা তাদের বিরুদ্ধে অন্যকে সাহায্যও করা যাবে না।

১০. মুসলিমগণের সম্পাদিত সন্ধি হবে একই। কোন মুসলিম কোন মুসলিমকে বাদ দিয়ে আল্লাহর পথে যুদ্ধের ব্যাপারে কোন সন্ধি করবেন না, বরং সকলে সমতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতেই তা করবেন।

১১. মুসলিমগণ ঐ রক্তপাতের ব্যাপারে সমান অধিকার রক্ষা করবেন যা আল্লাহর পথে প্রবাহিত হবে।

১২. কোন কুরাইশ মুশরিককে আশ্রয় দেবে না, তাদের ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে সাহায্য করবে না, আর কোন মু'মিনের হেফাজতের ব্যাপারে মুশরিকদেরকে প্রতিবন্ধক হিসেবে দাঁড় করাবে না।

১৩. যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে হত্যা করবে এবং তা যদি প্রমাণিত হয় তাহলে তার নিকট থেকে হত্যার বদলা গ্রহণ করা হবে যদি নিহতের অভিভাবক রাজী থাকেন।

১৪. যে সকল মু'মিন এর বিরুদ্ধাচরণ করবে তাদের জন্য এছাড়া আর কিছু হালাল হবে না যে, তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবেন, তাঁরা বিরুদ্ধাচারীর বিরুদ্ধাচরণ করবেন।

১৫. কোন মু'মিনের জন্য এটা সঙ্গত হবে না যে, যারা গুন্ডগোল সৃষ্টি করে (বিদ'আতী) তাদের কার্যকলাপে সাহায্য করে অথবা তাকে আশ্রয় দেয়, কিংবা যে তাকে সাহায্য করে তাকে আশ্রয় দেয়। যে এরূপ করবে কিয়ামতের দিন সে অভিশাপ এবং গযবে নিপতিত হবে এবং তার ফরজ ও নফল কোন ইবাদতই কবুল হবে না।

১৬. তোমাদের মধ্যে যখনই যে কোন মতভেদ পরিলক্ষিত হবে তখনই তা আল্লাহ এবং তার রাসূল (ﷺ)-এর বিধি-বিধান মতো ফয়সালার ব্যবস্থা করবে।

ইহুদীদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন

এ চুক্তির ধারাসমূহ

হিজরতের পর মুহাজির ও আনসারদের সমন্বয়ে গঠিত মদীনার মুসলিম সমাজকে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস, সুদৃঢ় ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এবং পরিচ্ছন্ন নিয়ম-শৃঙ্খলার উপর প্রতিষ্ঠিত করতে নাবী কারীম (ﷺ) যখন সক্ষম হলেন তখন মদীনার অমুসলিম জনগোষ্ঠির সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন ও সমঝোতা গড়ে তোলার কাজে মনোনিবেশ করেন। তাঁর এ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ছিল জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের সুখী, সমৃদ্ধ ও বরকতময় জীবনের পথ প্রশস্তকরণ, মদীনবাসী ও পার্শ্ববর্তী জনগোষ্ঠির মধ্যে ঐক্যবোধ সৃষ্টি ও একতার বন্ধন সুদৃঢ় করণ। এ লক্ষ্যে উদার উন্মুক্ত মনমানসিকতা নিয়ে এমন সব নিয়ম নীতি ও কার্যক্রম তিনি অবলম্বন করলেন যে, ধর্মান্ধতা ও স্বার্থান্ধতা-ক্লিষ্ট সম সাময়িক সমাজে যা ছিল একটি কল্পনাতীত ব্যাপার।

মদীনার মুসলিমগণের নিকটতম প্রতিবেশী ছিল ইহুদীগণ। মদীনায় মহানাবী (ﷺ)-এর হিজরতের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিমগণের সুশৃঙ্খল সমাজ সংগঠন, ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন এবং ক্রমবর্ধমান শক্তি সামর্থ্যের ব্যাপারে তারা সতর্কতার সঙ্গে সবকিছু লক্ষ্য করে যাচ্ছিল। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সব ক্ষেত্রেই মুসলিমগণের সাথে শত্রুতা পোষণ করলেও প্রকাশ্য কলহ কিংবা ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হওয়ার হাবভাবও প্রকাশ করে নি। কাজেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজন অনুভব করে চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এ চুক্তিতে তাদেরকে জানমালের সাধারণ নিরাপত্তা এবং ধর্মকর্মের স্বাধীনতার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। তাতে দেশত্যাগ, মালক্রোক এবং ঝগড়া ফাসাদের ব্যাপারে কোন নীতি নির্ধারণ করা হয়নি।

এ চুক্তি ঐ চুক্তির সঙ্গেই হয়েছিল যা মুসলিমদের পরস্পরের সঙ্গে সম্পাদিত হয়েছিল যার উল্লেখ কিছু পূর্বে করা হয়েছে। নিম্নে তার উল্লেখযোগ্য ধারাসমূহ আলোচনা করা হলঃ

১. বনু আওফের ইহুদীগণ মুসলিমদের সঙ্গে মিলেমিশে একই উম্মতের মতো থাকবে, কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে। এটা তাদের নিজেদের অধিকার হিসেবে যেমন গণ্য হবে, ঠিক তেমনিভাবে তাদের সঙ্গে যারা সম্পর্কিত তাদের এবং তাদের দাসদাসীদের বেলায়ও গণ্য হবে। বনু আউফ ছাড়া অন্যান্য ইহুদীদের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হবে।

২. মুসলিম এবং ইহুদী উভয় সম্প্রদায়ের লোকই নিজ নিজ আয়-উপার্জনের যিম্মাদার থাকবে।

৩. এ চুক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষের সঙ্গে অন্য কোন শক্তি যুদ্ধে লিপ্ত হলে চুক্তিভুক্ত পক্ষগুলো সম্মিলিতভাবে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

৪. এ চুক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়ের লোকেরা নিজেদের মধ্যে সহানুভূতি, সদিচ্ছা ও পারস্পরিক উপকারের ভিত্তিতে কাজ করে যাবে, কোন অন্যায়-অনাচার কিংবা পাপাচারের ভিত্তিতে নয়।

৫. মিত্র পক্ষের অন্যায়-অনাচারের জন্য সংশ্লিষ্ট অন্য পক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না।

৬. কেউ কারো উপর জুলুম করলে মজলুমকে সাহায্য করা হবে।
৭. চুক্তিবদ্ধ কোন পক্ষ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে যত দিন চলতে থাকবে ততদিন ইহুদীদেরকেও মুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধের খরচ বহন করতে হবে।
৮. এ চুক্তিভুক্ত সকলের জন্যই মদীনায় কোন প্রকার হাঙ্গামা সৃষ্টি করা কিংবা রক্তপাত ঘটানো হারাম হবে।
৯. চুক্তিভুক্ত পক্ষগুলো কোন নতুন সমস্যা কিংবা ঝগড়া ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়ার উপক্রম হলে এর মীমাংসা করবেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)।
১০. কুরাইশ ও তাদের সহায়তাকারীদের আশ্রয় দেয়া চলবে না।
১১. ইয়াসরিবের উপর কেউ হামলা চালালে সম্মিলিতভাবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এবং নিজ নিজ অঞ্চলে থেকে তা প্রতিহত করতে হবে।
১২. কোন অন্যায়কারী কিংবা পাপীর জন্য এ চুক্তি সহায়ক হবে না।
এ চুক্তি সম্পাদনের ফলে মদীনা এবং সংলগ্ন পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ এক শান্তি-স্বস্তিময় সাম্রাজ্যের রূপ পরিগ্রহ করে যার রাজধানী ছিল মদীনা এবং সর্বময় নেতৃত্বে ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। এ সাম্রাজ্য পরিচালনের ভিত্তি ছিল ইসলামী বিধি-বিধান এবং পরিচালন ভাগের অধিকাংশ কর্মকর্তা ছিলেন মুসলিম। প্রকৃতপক্ষে এভাবে মদীনা ইসলামী হুকুমতের রাজধানীতে পরিণত হয়ে যায়। সুশৃঙ্খল এবং শান্তি-স্বস্তিময় অঞ্চলের সীমারেখা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে নাবী কারীম (ﷺ) পরবর্তী পর্যায়ে অন্যান্য গোত্রের সঙ্গে অবস্থার প্রেক্ষাপটে অনুরূপ চুক্তি সম্পাদন করেন। সে সব চুক্তির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করা হবে।

মুসমানদের জন্য মসজিদুল হারামের দরজা বন্ধ করে দেয়ার ঘোষণা

এরপর সা‘দ ইবনু মু'আয (রাঃ) উমরাহ করার উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করেন এবং উমাইয়া ইবনু খালফের অতিথি হন। তিনি উমাইয়াকে সম্বোধন করে বলেন, ‘আমার জন্য এমন এক সময়ের ব্যবস্থা করে দাও যখন আমি নির্জনে বায়তুল্লাহর ত্বাওয়াফ করতে পারি। সেই মোতাবেক উমাইয়া খরতপ্ত দুপুরে তাকে নিয়ে পথে বের হলে পথে আবূ জাহলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যায়। সে উমাইয়াকে সম্বোধন করে বলে, ‘হে আবূ সাফওয়ান, তোমার সঙ্গে ঐ লোকটি কে?’
উত্তরে উমাইয়া বলল, ‘এ হচ্ছে সা‘দ (রাঃ)।’
আবূ জাহল তখন সা‘দ (ﷺ)-কে লক্ষ্য করে বলল, ‘আমি দেখছি যে, তুমি বড় নিরাপদে ত্বাওয়াফ করতে রয়েছ, অথচ তোমরা বেদ্বীনদেরকে আশ্রয় দিয়েছ এবং তাদেরকে সাহায্য করারও সিদ্ধান্ত নিয়েছ। আল্লাহর কসম! যদি তুমি আবূ সাফওয়ানের সঙ্গে না থাকতে তবে নিরাপদে ফিরে যেতে পারতে না।

তার একথা শুনে সা'দ (রাঃ) উচ্চ কণ্ঠে বললেন, 'দেখো আল্লাহর কসম! যদি তুমি আমার একাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি কর তবে তোমার এমন কাজে আমি প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াব যা তোমাদের জন্য হবে অত্যন্ত ভয়াবহ এবং তা হবে মদীনার পাশ দিয়ে চলে যাওয়া বাণিজ্য পথটি।

যুদ্ধের অনুমতি

মদিনায় ভয়ভীতি ও বিপজ্জনক পরিস্থিতি-যা মুসলিম অস্তিত্বের জন্য একটি মারাত্মক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং যদ্বারা এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, কুরাইশরা কোনোক্রমেই তাদের বিদ্বেষ ও একগুঁয়েমি পরিহার করতে প্রস্তুত নয়। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা মুসলিমদেরকে যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করলেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত মুসলিমদের ওপর যুদ্ধ ফরজ হয়নি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা যে আয়াত নাজিল করলেন, তা হচ্ছে-

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِير

যে লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হচ্ছে, তাদেরকেও যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো। কেননা, তাঁরা অত্যাচারিত এবং তাদেরকে সাহায্য করার ব্যাপারে নিশ্চয় আল্লাহ পূর্ণ ক্ষমতাবান। [সুরা হজ, আয়াত : ৩৯]

অতঃপর এ ধরনের আরও বহু আয়াত অবতীর্ণ হয়, যেগুলোতে বলে দেওয়া হয়, যুদ্ধের এ অনুমতি যুদ্ধ হিসেবে নয়; বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বাতিলের বিলোপ সাধন এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিতকরণ। যেমনটি ইরশাদ হয়েছে-

الَّذِينَ إِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَ اَمَرُوا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْر

পৃথিবীতে যদি আমি এদেরকে কর্তৃত্ব প্রদান করি, তাহলে তারা নামাজ প্রতিষ্ঠিত করবে, জাকাত দেবে এবং ভালো কাজের জন্য আদেশ করবে ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। [সুরা হজ, আয়াত: ৪১]

সঠিক কথা যা না মেনে উপায় নেই তা হচ্ছে, এ অনুমতি সম্পর্কিত আজাখ্যা পরতের পর মদিনায় অবতীর্ণ হয়, মক্কায় অবতীর্ণ হয়নি। তবে অবতীর্ণ হওয়ার সময় নিশ্চিতরূপে নির্দিষ্ট করা নিঃসন্দেহে মুশকিল।

যুদ্ধের অনুমতি তো নাজিল হলো, কিন্তু যে অবস্থার প্রেক্ষাপটে নাজিল হলো, সেটি যেহেতু শুধু কুরাইশের শক্তিমত্তা ও একগুঁয়েমির ফল ছিল, সেহেতু এটাই ছিল সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও বিজ্ঞোচিত কাজ, মুসলিমরা নিজেদের দখলসীমা কুরাইশদের ওই বাণিজ্যপথ পর্যন্ত বিস্তৃত করে নেবে যা মক্কা থেকে সিরিয়া পর্যন্ত চালু ছিল। উক্ত কারণেই দখলসীমা বিস্তৃতির উদ্দেশ্যে রাসুলুল্লাহ সা. দুটো পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন।

পরিকল্পনা দুটি হচ্ছে—

১. যে সকল গোত্র এ রাজপথের আশপাশে কিংবা এই রাজপথ হতে মদিনা পর্যন্ত বিস্তৃত জায়গার মধ্যবর্তী এলাকায় বসবাসরত ছিল, তাদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন এবং যুদ্ধ না করার চুক্তি সম্পাদন।

২. এ রাজপথের ওপর টহলদারি দল প্রেরণ।

প্রথম পরিকল্পনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ছিল, ওই ঘটনাটি যা পূর্বে ইহুদিদের সঙ্গে সংঘটিত হয়েছিল এবং যে চুক্তির বিস্তারিত বিবরণ ইতিপূর্বে প্রদত্ত হয়েছে। সামরিক তৎপরতা শুরুর পূর্বে রাসুলুল্লাহ সা. এভাবে জুহাইনা গোত্রের সঙ্গেও বন্ধুত্ব, মিত্রতা ও পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়ার একটি চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। মদিনা থেকে তিন মনজিলের অধিক, অর্থাৎ ৪০ থেকে ৫০ মাইলের ব্যবধানে তাদের আবাসস্থল অবস্থিত ছিল। টহলদার সৈন্যদের পরিভ্রমণকালে লোকজনের সঙ্গে কয়েকটি চুক্তিও সম্পাদন করেছিলেন, যার আলোচনা পরে আসছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি ছিল যুদ্ধ-বিগ্রহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

বদর যুদ্ধের পূর্বের সারিয়া ও গাজওয়াসমূহ

যুদ্ধের অনুমতি সংক্রান্ত আয়াত নাজিল হওয়ায় এ দুটি পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে মুসলিমদের সামরিক তৎপরতার কাজ আরম্ভ হলো। পরিভ্রমণকারী প্রহরীরূপে মুসলিম সেনাবাহিনী মদিনা এবং তৎসংলগ্ন এলাকাগুলোতে টহল দিতে শুরু করল। যেমনটি ইতিপূর্বে আভাস প্রদান করা হয়েছে। তাঁদের এই টহলদারির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, মদিনার আশপাশে-বিশেষভাবে মক্কা থেকে আগত পথগুলোর ওপর লক্ষ রাখা। এভাবে বিভিন্ন পথের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে নিরাপত্তার ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে লক্ষ করে যাওয়া এবং একই সঙ্গে এ সকল পথের আশপাশে বসবাসকারী গোত্রগুলোর সঙ্গে মিত্রতা ও বন্ধুত্বের চুক্তি সম্পাদন করা। অধিকন্তু, এ সুসংগঠিত টহলদারির অন্য যে একটি উদ্দেশ্যে ছিল তা হচ্ছে ইয়াসরিবের ইহুদি, মুশরিক ও বেদুঈনদের অন্তরে এ ধারণা বদ্ধমূল করে দেওয়া, মুসলিমরা এখন যথেষ্ট শক্তিশালী এবং পূর্বের নাজুক অবস্থাকে পেছনে ফেলে তারা অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। তা ছাড়া কুরাইশ মুশরিকদেরকে তাদের অর্থহীন ক্রোধ ও ইন্দ্রিয়াবেগের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া যাতে এখনো তারা তাদের নির্বুদ্ধিতার যে অন্ধকূপে পতিত রয়েছে, তা থেকে বেরিয়ে আসে এবং জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনার আলোকোজ্জ্বল পথে পদচারণা শুরু করে। পাশাপাশি এর মাধ্যমে নিজেদের আয়- উপার্জন ও জীবন-জীবিকার পথে বিপদের সমূহ-সম্ভাবনা এড়ানোর উদ্দেশ্যে সন্ধির কথা সক্রিয়ভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকে। সাথে সাথে মুসলিমদের আবাসস্থলের ওপর চড়াও হয়ে তাদের ধ্বংস করে ফেলার যে চরম হঠকারী সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ করেছে এবং আল্লাহর দ্বীনের পথে অমানবিক নিপীড়ন-নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে, সেসব থেকে বিরত থাকে। সর্বোপরি, মুসলিমরা যাতে আরব উপদ্বীপে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছানোর ব্যাপারে নিরুদ্বিগ্ন-চিত্তে কর্মপ্রবাহ অব্যাহত রাখতে সক্ষম হন, সেটাও ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য।

সারিয়া ও গাজওয়াহসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

মদিনায় হিজরতের পর মুসলিমদের যে সকল সারিয়া ও গাজওয়ায় অংশগ্রহণ করতে হয়েছিল, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো—

সারিয়াতু সিফিল বাহর বা সমুদ্র উপকূলে প্রেরিত বাহিনী

হিজরি প্রথম বর্ষের রমজান মাস মোতাবেক মার্চ ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দে রাসুলুল্লাহ সা. হামজা ইবনু আবিল মুত্তালিবকে এ অভিযানে সেনাপতি নিযুক্ত করলেন এবং তাঁর অধীনে ৩০ জন মুহাজির সৈন্য দিয়ে তাদেরকে সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনকারী কুরাইশ কাফেলার গতিবিধি লক্ষ করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন। ৩০০ সদস্য বিশিষ্ট এ কুরাইশ কাফেলার অন্যতম সদস্য ছিল আবু জাহাল। মুসলিম বাহিনী ঈস [৩৪৬] নামক জায়গার পার্শ্ববর্তী সমুদ্র উপকূলের নিকট পৌঁছলে ওই কাফেলার সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ ঘটে। পরস্পরের মুখোমুখি হলে একপর্যায়ে উভয় দলই যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু জুহাইনা গোত্রের নেতা মাজদি ইবনু আমর—যিনি উভয় দলেরই মিত্র ছিলেন। অনেক চেষ্টা করে উভয় দলকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখলেন।

গাজওয়ায়ে বুওয়াত বা বুওয়াতের অভিযান

এ অভিযান সংঘটিত হয় হিজরি দ্বিতীয় বর্ষের রবিউল আওয়াল মোতাবেক সেপ্টেম্বর ৬২৩ খ্রিষ্টাব্দে। ২০০ সাহাবি নিয়ে রাসুলুল্লাহ সা. এ অভিযানে বের হলেন। এক কুরাইশ কাফেলার পথরোধ করাই ছিল এ অভিযানের উদ্দেশ্য। উমাইয়া ইবনু খালফসহ ১০০জন কুরাইশ এবং আড়াই হাজার উট ছিল এ কাফেলায়। মুসলিম বাহিনী রাজওয়ার পার্শ্ববর্তী বুওয়াত নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছলেন। কিন্তু কোনো সংঘর্ষ বাঁধেনি। এ গাজওয়ায় গমনকালে সাদ ইবনু মুআজ রাদি.-কে মদিনার আমির নিযুক্ত করা হয়। এ গাজওয়ার পতাকা ছিল সাদা এবং পতাকাবাহী ছিলেন সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাদি.।

বদরের যুদ্ধ

দ্বিতীয় হিজরী সালে নাবী (ﷺ) এর কাছে এই মর্মে খবর পৌঁছল যে, কুরাইশদের একটি বাণিজ্যিক কাফেলা সিরিয়া হতে মক্কার পথে অগ্রসর হচ্ছে। কাফেলার নেতৃত্বে ছিল আবু সুফিয়ান। নাবী (ﷺ) কাফেলাটির পিছু ধাওয়া করার আহবান জানালেন। তবে এর জন্য বেশী প্রস্তুতি গ্রহণ করেন নি। দ্রুত বের হওয়ার প্রয়োজন ছিল বলে এর জন্য বেশী সময় পান নি। তাই তিনি তিনশত তের জন সাহাবী নিয়ে বের হয়ে পড়লেন। তাদের কাছে ছিল দুইটি ঘোড়া এবং সত্তরটি উট। লোকেরা পালাক্রমে আরোহন করতেন।

ঐ দিকে আবু সুফিয়ান নাবী (ﷺ) এর বের হওয়ার কথা জানতে পেরে মক্কায় লোক পাঠিয়ে কাফেলার হেফাজতের জন্য দ্রুত সাহায্যের আবেদন করল। সংবাদ পেয়ে তারা দ্রুত বের হয়ে পড়ল। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের বের হওয়ার অবস্থা বর্ণনা করে বলেন-

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَاللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

"আর তাদের মত হয়ে যেয়োনা, যারা বের হয়েছে নিজেদের অবস্থান থেকে গর্বিতভাবে এবং লোকদেরকে দেখাবার উদ্দেশ্যে। আর আল্লাহর পথে তারা বাধা দান করত। বস্তুতঃ আল্লাহর আয়ত্তে রয়েছে সে সমস্ত বিষয় যা তারা করে"। (সূরা আনফাল-৮:৪৭) সুতরাং পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই আল্লাহ্ তা'আলা উভয় দলকে মুখোমুখী করে দিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- "এমতাবস্থায় যদি তোমরা পারস্পরিক অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে, তবে তোমরা মতবিরোধে লিপ্ত হতে"। (সূরা আনফাল-৮: ৪২)

যাই হোক নাবী (ﷺ) যখন কুরাইশদের বের হওয়ার কথা জানতে পারলেন, তখন সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন।

সেই পরামর্শ সভায় মুহাজিরগণ প্রথমে কথা বললেন এবং অত্যন্ত সুন্দর পরামর্শ দিলেন। অতঃপর তিনি দ্বিতীয়বার পরামর্শ চাইলেন। এবারও মুহাজিরগণই কথা বললেন। তৃতীয়বার পরামর্শ চাইলেন। এতে আনসারগণ বুঝতে পারলেন যে, নাবী (ﷺ) তাদেরকে উদ্দেশ্য করছেন এবার তাদের পরামর্শ শুনতে চাচ্ছেন। তাই সা'দ বিন মুআয উঠে দাঁড়ালেন এবং আনসারদের পক্ষ হতে তিনি তাঁর সুপ্রসিদ্ধ কথাগুলো বললেন। তিনি তাতে রসূল (ﷺ) কে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন যে, আনসারগণ যুদ্ধ করার জন্য পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছেন। সা'দ বিন মুআয বললেন- হে আল্লাহর রসূল! আপনি সম্ভবত আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। ঐ আল্লাহর শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে। আপনি যদি আমাদেরকে ঘোড়া ছুটিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে বলেন, তাহলে আমরা তাই করব। আপনি আমাদেরকে যেখানে যেতে বলেন, আমরা সেখানেই যাবো। এমন কি বারাকুল গামাদ (লোহিত সাগরের অপর প্রামেত্মর একটি অঞ্চলের নাম) পর্যন্ত যেতে বলেন, তাহলে আমরা সেখানে যেতেও দ্বিধাবোধ করবনা। মিকদাদ বিন আসওয়াদও অনুরূপ কথা

বললেন- মিকদাদ (রাঃ) বললেন- মুসা (আঃ) এর অনুসারীরা যেরূপ বলেছিল আমরা সেরূপ বলবনা। তারা মুসাকে বলেছিল- আপনি এবং আপনার প্রভু তাদের (শত্রুদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন। আমরা এখানেই বসে থাকব। আর আমরা বলছিঃ আমরা আপনার ডানে, বামে সামনে এবং পিছনে তথা চতুর্দিক থেকেই যুদ্ধ করব। সাহাবীদের কথা শুনে বিশেষ করে এই দুই নেতার কথা শুনে নাবী (ﷺ) খুব খুশী হলেন। তিনি বললেন- তাহলে তোমরা আগে বাড়, সামনে চল এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর। আল্লাহ্ আমাকে কাফেরদের দুই দলের একটির উপর বিজয় দান করার ওয়াদা করেছেন। আর আমি কাফের নেতাদের নিহত হওয়ার স্থানগুলো দেখতে পাচ্ছি। এরপর নাবী (ﷺ) সামনে চলতে লাগলেন এবং বদর প্রান্তরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি যখন মুশরিকদের মুখোমুখী হলেন এবং উভয় দল পরস্পরকে দেখতে পেল, তখন রসূল (ﷺ) আল্লাহর দরবারে উভয় হাত তুলে দু'আ করতে লাগলেন এবং তাঁর প্রভুর সাহায্য প্রার্থনা করলেন। মুসলমানেরাও আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকলেন এবং আল্লাহর মদদ চাইলেন। আল্লাহ্ তা'আলা এ সময় কুরআনের এই আয়াত নাযিল করলেন-

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ

"তোমরা যখন ফরিয়াদ করতে আরম্ভ করছিলে স্বীয় প্রভুর নিকট, তখন তিনি তোমাদের ফরিয়াদের মঞ্জুরী দান করলেন যে, আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব ধারাবাহিকভাবে আগত এক হাজার ফিরিস্তার মাধ্যমে"। (সূরা আনফাল-৯)

এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়। তা হচ্ছে, এখানে এক হাজার ফিরিস্তার মাধ্যমে সাহায্যের কথা বলা হয়েছে। আর সূরা আল ইমরানে তিন হাজার ও পাঁচ হাজার ফিরিস্তা দ্বারা সাহায্য করার কথা বলা হয়েছে। এর জবাব কী?

এর উত্তর দুইভাবে দেয়া যেতে পারে।

(১) উহুদ যুদ্ধের দিন তিন হাজার ও পাঁচ হাজার ফিরিস্তা দ্বারা সাহায্য করার কথা বলা হয়েছিল। তবে সেখানে একটি শর্ত জড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। শর্ত পূর্ণ না হওয়ার কারণে সেই সাহায্য আগমণ করেনি।

(২) বদরের যুদ্ধের দিনই তিন হাজার বা পাঁচ হাজার ফিরিস্তার মাধ্যমে সাহায্য করা হয়েছিল। আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনা এ কথারই প্রমাণ বহন করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ ۚ فَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ .اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ .بَلٰٓى اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ .وَمَا جَعَلَهُ اللهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ ۚ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ

"বস্তুত আল্লাহ্ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। কাজেই আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পার। তুমি যখন মুমিনগণকে বলতে লাগলে তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের সাহায্যার্থে তোমাদের প্রতিপালক আসমান থেকে অবতীর্ণ তিন হাজার ফিরিস্তা পাঠাবেন? অবশ্য তোমরা যদি সবর কর এবং তাকওয়ার

পথ অবলম্বন কর, আর তারা যদি তখনই তোমাদের উপর চড়াও হয়, তাহলে তোমাদের প্রতিপালক চিহ্নিত ঘোড়ার উপর পাঁচ হাজার ফিরিস্তা তোমাদের সাহায্যে পাঠাতে পারেন। বস্তুত এটা তো আল্লাহ্ তোমাদের সুসংবাদ দান করলেন, যাতে তোমাদের মনে এতে সান্তনা আসতে পারে। আর সাহায্য শুধু পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকেই''।

(সূরা আল-ইমরান-৩:১২৩-১২৬)

মুসলমানেরা যখন আল্লাহর কাছে মদদ চাইল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা এক হাজার ফিরিস্তার মদদ পাঠালেন। তারপর তিন হাজার ফিরিস্তা পাঠালেন। পুনরায় পাঁচ হাজার পাঠালেন। এভাবে ধাপে ধাপে সাহায্য পাঠানোর মাধ্যমে মুমিনদের মনোবল বৃদ্ধি করা হয়েছিল। এটি ছিল তাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দ দায়ক।

প্রথম মতের সমর্থকগণ বলেন- ঘটনাটি অর্থাৎ তিন হাজার ও পাঁচ হাজার ফিরিস্তার মাধ্যমে সাহায্য করার ঘটনা উহুদ যুদ্ধের আলোচনায় বর্ণিত হয়েছে। মাঝখানে অপ্রাসঙ্গিকভাবে বদরের আলোচনা চলে এসেছে। আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের প্রতি বদরের যুদ্ধের দিনের অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর উহুদ যুদ্ধের আলোচনা করা হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তাঁর রসূলের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আর তা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী,

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آَلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ (124) بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آَلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ

''তুমি যখন মুমিনগণকে বলতে লাগলে তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের সাহায্যার্থে তোমাদের প্রতিপালক আসমান থেকে অবতীর্ণ তিন হাজার ফিরিস্তা পাঠাবেন। অবশ্য তোমরা যদি সবর কর এবং তাকওয়ার পথ অবলম্তন কর, আর তারা যদি তখনই তোমাদের উপর চড়াও হয়, তাহলে তোমাদের প্রতিপালক চিহ্নিত ঘোড়ার উপর পাঁচ হাজার ফিরিস্তা তোমাদের সাহায্যে পাঠাতে পারেন''।এটি হচ্ছে আল্লাহর রসূলের কথা। আর বদরের যুদ্ধের দিন এক হাজার ফিরিস্তা দিয়ে সাহায্য করার কথা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন। আর সেটি ছিল শর্তহীন। আর উহুদ যুদ্ধে গায়েবী সাহায্য পাঠানোর বিষয়টি ছিল শর্তযুক্ত তথা সবর করলে এবং তাকওয়ার পথ অবলম্বন করার শর্তে তিন ও পাঁচ হাজার ফিরিস্তার মাধ্যমে সাহায্য করার কথা বলা হয়েছিল।

উহুদ যুদ্ধের ঘটনা সূরা আল-ইমরানে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। মাঝখানে অপ্রাসঙ্গিকভাবে বদরের আলোচনা চলে এসেছে। আর বদরের যুদ্ধের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে, সূরা আনফালে। সুতরাং উভয় সূরার প্রসঙ্গ ও প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ আলাদা। আল্লাহর এই বাণীই প্রমাণ করে যে, উভয় সূরার প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ ভিন্ন। আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আল-ইমরানে বলেন-

وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا

''আর তারা যদি তখনই তোমাদের ওপর চড়াও হয়''।

(সূরা আল-ইমরান-৩:১২৫)

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন- এটি উহুদ যুদ্ধের ঘটনা। এটি প্রমাণ করে যে, উহুদ যুদ্ধের দিনও গায়েবী সাহায্য এসেছিল। সুতরাং এ কথা বলা ঠিক হবেনা যে, বদরের যুদ্ধের দিনই তিন বা পাঁচ হাজার ফিরিস্তা দ্বারা সাহায্য করা হয়েছিল। মোট কথা দ্রুত ও তৎক্ষণাৎ সাহায্য পাঠানো হয়েছিল উহুদ যুদ্ধের দিন। আল্লাহই ভাল জানেন।

কাফেররা যখন বের হওয়ার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করল, তখন তারা তাদের এবং বনী কেনানার মাঝখানের শত্রুতার কথা স্মরণ করল। তখন ইবলীস বনী কেনানার অন্যতম নেতা সুরাকা বিন মালেকের আকৃতিতে প্রকাশিত হয়ে বলতে লাগল-

لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ

"আজকের দিনে কোন মানুষই তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবেনা, আমি হলাম তোমাদের সমর্থক"।

(সূরা আনফাল-৮: ৪৮)

সুতরাং বনী কেনানার লোকেরা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। ইবলীসের এই আশ্বাস পেয়ে কুরাইশরা বীরত্বের সাথে বেরিয়ে পড়ল। পরিশেষে যখন চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল এবং ইবলীস দেখল যে, আকাশ থেকে আল্লাহর সৈনিকগণ অবতরণ করেছেন তখন সে পিছন দিকে পলায়ন করতে লাগল। কুরাইশরা বলল- হে সুরাকা তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ? তুমি কি এর আগে বলনি যে, আমাদের পাশেই থাকবে? তখন ইবলীস বলতে লাগল-

إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ وَاللهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"আমি তোমাদের সাথে নাই। আমি এমন কিছু দেখছি, যা তোমরা দেখছনা; আমি ভয় করি আল্লাহ্কে। আর আল্লাহর আযাব অত্যন্ত কঠিন"।ইবলীসের কথা, আমি এমন কিছু দেখছি, যা তোমরা দেখছ না; এটি ছিল সত্য।

কারণ সে আকাশ থেকে ফিরিস্তাদের অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনা দেখছিল। আর তার কথা, আমি আল্লাহ্কে ভয় করি- এটি ছিল মিথ্যা। কেউ কেউ বলেছেন- ইবলীস কাফেরদের সাথে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করেছিল। এটিই অধিক সুস্পষ্ট।

বদরের যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে মুনাফেক এবং রেসূাক্রান্ত হৃদয়ের অধীকারীরা যখন দেখল যে, আল্লাহর সৈনিকদের সংখ্যা খুবই কম এবং শত্রু সংখ্যা খুব বেশী তখন তারা ভাবতে লাগল যে, সংখ্যাধিক্যই বিজয়ের মানদন্ড। তারা বলতে লাগল- এদের দ্বীন এদেরকে প্রতারিত করছে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেন- আল্লাহর উপর নির্ভেজাল ঈমান এবং ভরসাই বিজয় অর্জনের মাধ্যম। অস্ত্রের প্রাচুর্যতা ও সংখ্যাধিক্য নয়। আল্লাহ্ তা'আলা প্রবল শক্তিধর, তাকে পরাজিত করা অসম্ভব। তিনি প্রজ্ঞাময়। যে বিজয়ের হকদার, তাকেই তিনি বিজয় দান করেন। যদিও সে শক্তির দিক দিয়ে দুর্বল হয়।

রসূল (ﷺ) যখন শাওয়াল মাসে বদর যুদ্ধ এবং বন্দীদের বিষয়ে সিদ্বান্ত গ্রহণ করার সাত দিন পর বনী সুলাইম গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযানে বের হলেন। সেখানকার কুদ্র নামক পানির কাছে পৌঁছে তিন দিন অবস্থান করে যুদ্ধ ছাড়াই মদ্বীনায় ফেরত আসেন।

ঐ দিকে মুশরিকরা যখন পরাজিত ও অপমানিত অবস্থায় মক্কায় পৌঁছল তখন আবু সুফিয়ান মানত করল যে, মদ্বীনাবাসীদের সাথে পুনরায় যুদ্ধ না করা পর্যন্ত মাথায় পানি ব্যবহার করবেনা। সে দুইশত অশ্বারোহীর একটি বাহিনী নিয়ে মদ্বীনার পার্শ্ববর্তী এলাকায় পৌঁছে সালাম বিন মিশকাম নামক ইহুদীর নিকট রাত্রি যাপন করল। সেই ইহুদী মানুষের কাছে আবু সুফিয়ানের আগমণের কথা গোপন রাখল। সকাল বেলা সে বেশ কিছু খেজুর গাছ কর্তন করল এবং একজন আনসারী ও তার এক বন্ধুকে হত্যা করে ফেলল। খবর পেয়ে নাবী (ﷺ) তার সন্ধানে বের হলে সে পালিয়ে যায়। যাওয়ার সময় বোঝা কমানোর জন্য প্রচুর পরিমাণ ছাতু ফেলে যায়। এ কারণেই একে গাযওয়াতুছ ছাওয়ীক বা ছাতুর যুদ্ধ বলা হয়।

অতঃপর নাবী (ﷺ) নজদ এলাকার গাতফান গোত্রের উদ্দেশ্যে বের হন। সেখানে গিয়ে তিনি তৃতীয় হিজরীর পূর্ণ সফর মাস অবস্থান করেন। অতঃপর যুদ্ধ না করেই ফেরত আসেন। সেখান থেকে ফেরত এসে রবীউল আওয়াল মাস মদ্বীনাতেই কাটান। অতঃপর কুরাইশদের উদ্দেশ্যে বের হন। হিজাজের বুহরান এলাকায় পৌঁছে রবীউছ ছানী এবং জুমাদাল আওয়াল মাস অবস্থান করেন। অতঃপর কোন রূপ যুদ্ধ ছাড়াই সেখান থেকে ফেরত আসেন।

অতঃপর মদ্বীনার ইহুদী সম্প্রদায় বনী কায়নুকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং কাব বিন আশরাফকে হত্যা করেন। এর পর অঙ্গীকার ভঙ্গ ও আল্লাহ্ এবং আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্ত্ততি নেওয়ার কারণে মদ্বীনার ইহুদীদেরকে হত্যা করার অনুমতি দেয়া হয়।

নবি কারিম সা.-কে হত্যার ষড়যন্ত্র

বদর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মুশরিকরা ক্ষোভে ও ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল। রাসুল সা.- কে হত্যা করে বদরের গ্লানি ও অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ভীষণ ষড়যন্ত্র চলতে থাকল। শেষ পর্যন্ত তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, দুই যুবক নিজ বুদ্ধিবলে এ সকল মতভেদ ও মতানৈক্যের বুনিয়াদ এবং বদর যুদ্ধের অবমাননাকর পরিস্থিতির মূলোৎপাটন করবে। অর্থাৎ, রাসুল সা.-কে হত্যা করবে। ফলে বদর যুদ্ধের পরের ঘটনা হলো, ওহাব ইবনু উমাইর জুমাহি-যে ছিল কুরাইশের মধ্যে বড় শয়তান এবং মক্কায় সাহাবা ও রাসুলকে কষ্টদানে অগ্রনায়ক। তার পুত্র ওহাব ইবনু উমাইর বদর যুদ্ধে মুসলিমদের হাতে বন্দি হয়েছিল। এ উমাইর একদিন হাতিমে বসে সাফওয়ান ইবনু উমাইয়ার সঙ্গে বদর কূপে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে আলোচনা করছিল। এতে সাফওয়ান বলে উঠল, আল্লাহর শপথ, এর পর আমাদের বেঁচে থাকার আর কোনো আকর্ষণ থাকতে পারে না। উত্তরে উমাইর বলল, আল্লাহর কসম, তুমি সত্যই বলেছ। দেখো, আমার যদি ঋণ না থাকত

যা পরিশোধ করার মতো অবস্থা বর্তমানে আমার নেই এবং আমার ছোট ছোট ছেলেমেয়ে যদি না থাকত, যা আমার অভাবে বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে; তবে এখনই আমি বাহনে আরোহণ করে মুহাম্মদ সা.-এর কাছে যেতাম এবং তাকে হত্যা করে ফেলতাম। কেননা, তাঁর কাছে যাওয়ার কারণ আমার মজুদ রয়েছে। আমার পুত্র তার নিকট কমি কেমছে। সাফওয়ান তার এ কথার উত্তরে বলল, বেশ তোমার সমস্ত ঋণের আর্থি রমে মাদার হচ্ছি এবং তোমার পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্বও নিচ্ছি। তোমার সন্তান হলের আমার সন্তান।

উমাইর বলল, সাবধান! ব্যাপারটা যেন গোপন থাকে। সিদ্ধান্ত হলো, সে তার বদি সন্তানকে মুক্ত করার অজুহাত নিয়ে মদিনায় গমন করবে এবং সুযোগমতো। অতর্কিতভাবে রাসুল সা.-এর ওপর তরবারি চালাবে। ক্ষিপ্ততার সঙ্গে এ কাজ করতে গিয়ে একাধিক বারের বেশি আঘাত করা হয়তোবা সম্ভব নাও হতে পারে এবং এর ফলে রাসুল সা. আহত হয়েও বেঁচে যেতে পারেন। এসব ভেবেচিন্তে উমাইরের তরবারি তীব্র গরমে সিক্ত করা হয়। যাতে মুহাম্মদকে কোনোরকম আঘাত করলেই তার প্রাণ রক্ষার ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব হয়ে পড়বে। রাসুল সা. মসজিদে বসে ছিলেন। উমর রাদি, এবং আরও কয়েকজন সাহাবি রাদি. বাইরে বসে বদর যুদ্ধ সম্বন্ধে কথোপকথন করছিলেন, এমন সময় গলায় তরবারি ঝুলিয়ে উমাইর মসজিদের দ্বারদেশে উপস্থিত হলো। তখন উমর রাদি. তাকে কুরাইশের অন্যতম শয়তান বলে উল্লেখ করলেন। তার কুটিল চাহনি ও সন্দেহজনক হাবভাব দেখে উমর রাদি.-এর মনে খটকা লাগল। তিনি সকলকে সতর্ক হতে ইঙ্গিত করলেন এবং কয়েকজন আনসারকে রাসুল সা.-এর চারদিকে উপবেশন করার আদেশ দিয়ে স্বয়ং রাসুল সা.-এর খিদমতে হাজির হয়ে অবস্থা ব্যক্ত করলেন। উমাইরকে টানতে টানতে রাসুলের দরবারে নিয়ে এলেন। এটা দেখে রাসুল সা. তাকে ছেড়ে দিতে আদেশ করলেন এবং উমাইরকে তাঁর কাছে আসতে বললেন, ইরশাদ করেন, আল্লাহ আমাদেরকে এর চাইতে অনেক ভালো অভিবাদন দান করেছেন; অর্থাৎ, সালাম-যা হচ্ছে জান্নাতিদের অভিবাদন।

তারপর রাসুল সা. উমাইরকে জিজ্ঞেস করলেন, উমাইর কী মনে করে এসেছ? উত্তরে বলল, হে রাসুল, এই বন্দিদের প্রতি আপনি দয়া করুন। তিনি বললেন, এ তো খুব ভালো কথা; কিন্তু এই তরবারি এনেছ কেন?

রাসুল সা. তাকে পুনঃপুনঃ সত্য কথা বলতে নির্দেশ দিলেন, কিন্তু সে নানা টালবাহানা করে এ কথাই বলতে থাকল। তখন রাসুল সা. হেসে মক্কার গুপ্ত ষড়যন্ত্র এবং সাফওয়ানের সাথে প্রতিজ্ঞা, প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে সব কথা ব্যক্ত করতে লাগলেন। এমন গোপনীয় পরামর্শ, গুপ্ত ষড়যন্ত্র-তিনি এসব ব্যাপার কীরূপে অবগত হলেন? উমাইর

তখন চকিতচিত্তে রাসুল সা.-এর এ মুজিজার কথা চিন্তা করতে লাগল। তার বিবেক আর সত্য গোপন করতে পারল না। সে ভয়-ভক্তি বিজড়িত কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলতে লাগল, মুহাম্মদ, পূর্বে আপনার কথায় বিশ্বাস করিনি, সেজন্য এখন অনুতপ্ত হচ্ছি। বস্তুত আপনি সত্যিই আল্লাহর

রাসুল। আল্লাহ তাআলার জন্যই সমস্ত প্রশংসা, তিনি আমাকে সত্যের জ্যোতি দর্শনের সৌভাগ্য প্রদান করেছেন।

রাসুল সা. সাহাবিদেরকে সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের এ ধর্মভাইকে উত্তমরূপে ধর্ম ও কুরআন শিক্ষা দাও এবং তার প্রার্থিত বন্দিদের মুক্তি দাও। কিছুকাল পর উমাইর রাদি. রাসুল সা.-এর খিদমতে হাজির হয়ে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমি আল্লাহর জ্যোতিকে নির্বাপিত এবং সত্যের সেবকদের নির্যাতিত করতে চেষ্টার ত্রুটি রাখিনি। এভাবে যে পাপ আমি সঞ্চয় করেছি, এখন তার প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। আপনি আমাকে অনুমতি দিন। এভাবে তিনি নবিজির সংশ্রবে নতুন জীবন লাভ করে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলেন। এদিকে সাফওয়ান মক্কার লোকদেরকে ইঙ্গিতে বলে রেখেছিল, দেখে নিয়ো, আমি শীঘ্রই এমন এক শুভ সংবাদ দিতে পারব যার ফলে তোমরা বদর যুদ্ধের সমস্ত শোক ভুলে যাবে। কিন্তু উমাইরকে দেখে তারা অবাক। এ কী! এমন দুর্ধর্ষ উমাইর, তার ওপরও মুহাম্মদ-এর জাদু খেটে গেল! যাইহোক উমাইর আর কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে নিজ কর্তব্য পালন করে যেতে লাগলেন। তার আদর্শ ও প্রচারে মক্কার বহুসংখ্যক নর-নারী ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে ধন্য হলো।

উহুদের যুদ্ধ

বদরের যুদ্ধে আল্লাহ্ তা'আলা যখন আবু জাহেলসহ কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে হত্যা করলেন তখন আবু সুফিয়ান বিন হারব তাদের নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করল। দায়িত্ব পেয়ে রসূল (ﷺ) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে আরব গোত্রসমূহকে একত্রিত করতে লাগল। প্রচুর অস্ত্র ও জনবলসহ সে মদ্বীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে বের হয়ে উহুদ পাহাড়ের নিকট তাবু স্থাপন করল।

এর পরিপ্রেক্ষিতে হিজরী তৃতীয় সালের শাওয়াল মাসে মদ্বীনার মুসলমান ও মক্কার কুরাইশদের মধ্যে উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলমানদের যুবকরাও এবার নিজেদেরকে যুদ্ধের জন্য পেশ করে। যারা বয়সে ছোট ছিল তাদেরকে জিহাদে বের হওয়ার অনুমতি দেয়া হয়নি। তাদের মধ্যে ছিলেন আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার, উসামা বিন যায়েদ, যায়েদ বিন ছাবেত এবং আরাবা বিন আওয়াস। আর যাদেরকে জিহাদ করতে সক্ষম মনে করেছেন, তাদেরকে বের হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। তাদের মধ্যে ছিলেন সামুরা বিন জুন্দুব এবং রাফে বিন খাদীজ। এদের বয়স ছিল তখন ১৫ বছর। কেউ কেউ বলেছেন- যাদেরকে অনুমতি দিয়েছিলেন ১৫ বছর বয়স হওয়ার কারণে তাদেরকে বালেগ হিসাবে গণ্য করেছিলেন। আর যাদের বয়স এর কম ছিল নাবালেগ হওয়ার কারণে তাদেরকে ফেরত দিয়েছিলেন।

অন্য একদল আলেম বলেন- ১৫ বছর বয়স বা বালেগ হওয়ার কারণে নয়; বরং যাদের মধ্যে যুদ্ধ করার মত শক্তি দেখেছেন তাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন। আর যাদেরকে ফেরত দিয়েছিলেন শক্তি না থাকার কারণেই তাদেরকে ফেরত দিয়েছেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাঃ) এর হাদীছের কতক শব্দে এসেছে যে, রসূল (ﷺ) যখন আমাকে শক্তিশালী দেখলেন তখন জিহাদের অনুমতি দিলেন।

যাই হোক নাবী (ﷺ) সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন। তিনি জানতে চাইলেন, তিনি মদ্বীনা থেকে বের হয়ে উহুদ প্রান্তরে গিয়ে শত্রুদের মুকাবেলা করবেন? না মদ্বীনায় থেকেই যুদ্ধ করবেন? রসূল (ﷺ)-এর রায় ছিল যে, মুসলমানেরা মদ্বীনা থেকে বের হবেনা; বরং মদ্বীনার ভিতরেই থাকবে। কাফেররা যদি মদ্বীনায় প্রবেশের সাহসিকতা প্রদর্শন করে তাহলে মুসলমানেরা মদ্বীনার প্রবেশ পথে যুদ্ধ করবে এবং মহিলারাও ঘরের ছাদ থেকে কাফেরদের উপর পাথর নিক্ষেপ করবে। মুনাফেক সরদার আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই এই মতকেই সমর্থন করল। আর এটিই ছিল সঠিক রায়। কিন্তু যে সমস্ত সাহাবী বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেনি, তারা মদ্বীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার পরামর্শ দিলেন। তারা এ ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করতে থাকলে তিনি স্বীয় গৃহে প্রবেশ করলেন এবং যুদ্ধের পোশাক পরিধান করলেন। অতঃপর তিনি বের হয়ে পড়লেন। যারা বের হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল এবার তাদের দৃঢ়তায় ভাটা পড়ল। তখন তারা বলল- আমরা আল্লাহর রসূলকে বের হতে বাধ্য করলাম! তারা আরও বলল- হে আল্লাহর রসূল! আপনি যদি মদ্বীনায় অবস্থান করতে চান তাহলে তাই করুন। রসূল (ﷺ) তখন বললেন- যুদ্ধের পোশাক

পরিধান করার পর কোন নাবীর জন্য এটা জায়েয নয় যে, তাঁর মাঝে এবং শত্রুর মাঝে আল্লাহর ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধের পোশাক খুলে ফেলবে।

তাই নাবী (ﷺ) এক হাজার সাহাবী নিয়ে বের হয়ে পড়লেন। বের হওয়ার সময় আব্দুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুমকে মদ্বীনায় অবশিষ্ট মুসলমানদের ইমাম নিযুক্ত করলেন। এর আগে মদ্বীনায় থাকার সময় রসূল (ﷺ) একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি দেখলেন, তাঁর তলোয়ারটি সামান্য ভেঙ্গে গেছে, একটি গাভী যবেহ করা হচ্ছে এবং তিনি একটি সুরক্ষিত দূর্গে স্বীয় হাত ঢুকাচ্ছেন। তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বললেন- তলোয়ার ভেঙ্গে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে তার পরিবারের একজন লোক আক্রান্ত হবেন, গাভী যবেহ করার ব্যাখ্যা করলেন যে, তাঁর সাহাবীদের একটি দল নিহত হবেন আর সুরক্ষিত দূর্গ হচ্ছে মদ্বীনা।

তিনি পবিত্র জুআর দিন উহুদের উদ্দেশ্যে বের হলেন। কিন্তু মদ্বীনা ও উহুদের মধ্যবর্তী স্থানে এসে আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই এক তৃতীয়াংশ লোকসহ ফিরে গেল।

অবশিষ্ট সাতশ সাহাবীকে সাথে নিয়ে তিনি উহুদ প্রান্তরে গিয়ে পাহাড়কে পিছনে রেখে অবস্থান করলেন। মুসলমানদেরকে আদেশ করলেন যে, তাঁর আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত যেন যুদ্ধ শুরু না করেন। শনিবারের দিন তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। এ সময় তিনি ৫০ জন তীরন্দাজ বাহীনির উপর আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইরকে আমীর নিযুক্ত করে তাদেরকে আমীরের আনুগত্য করার আদেশ দিলেন। এমন কি তারা যদি দেখে পাখীরা অন্যান্য সৈনিকদেরকে ছিড়ে খাচ্ছে তাতেও যেন তারা স্থান ত্যাগ না করেন। এই বাহিনীকে পিছনে নিযুক্ত করেছিলেন। যাতে মুশরিকরা পিছন দিক থেকে আক্রমণ করলে তীর নিক্ষেপ করে তাদেরকে প্রতিহত করা যায়।

ঐ দিকে কুরাইশরাও যুদ্ধের প্রস্তুতি নিল। তারা সংখ্যায় ছিল তিন হাজার। তাদের মধ্যে ছিল দুইশত অশ্বারোহী যোদ্ধা।

দিবসের প্রথম ভাগে যখন যুদ্ধ শুরু হল তখন মুসলিমদের বিজয়ের লক্ষণ পরিলক্ষিত হল। আল্লাহর দুশমনেরা পরাজিত হল। তারা পরাজিত হয়ে তাদের মহিলাদের নিকট আশ্রয় নিতে লাগল।

ঐ দিকে রসূল (ﷺ) কর্তৃক নিয়োজিত ৫০ জনের তীরন্দাজ বাহিনী যখন কাফেরদের পরাজয় দেখল তখন তারা রসূল (ﷺ) এর আদেশ অমান্য করে স্থান ত্যাগ করতে লাগল এবং গণীমতের মাল সংগ্রহ করতে লাগল।

তাদের আমীর আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর রসূল (ﷺ) এর আদেশের কথা শুনিয়ে দিলেন। কিন্তু তারা তাঁর কথায় কর্ণপাত করলনা। তাদের ধারণা ছিল মুশরিকরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছে। সুতরাং রসূল (ﷺ) এর আদেশের কার্যকরিতা শেষ হয়ে গেছে। তাই তারা স্থান ত্যাগ করে গণীমত সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

ঐ দিকে মুশরিকদের অশ্বারোহীরা পিছন দিক খালি পেয়ে পুনরায় মুসলমানদের উপর আক্রমণ করল। এক পর্যায়ে তারা মুসলমানদেরকে ঘিরে ফেলল। এখানে ৭০জন সাহাবী শাহাদাত বরণ করলেন। বাকীরা পলায়ন করলে মুশরিকরা রসূল (ﷺ) পর্যন্ত পৌঁছে গেল। মুশরিকরা তাঁর চেহারা মোবারকে আঘাত করল, সামনের দাঁতগুলো ভেঙ্গে ফেলল। পরিশেষে কুরাইশদের আঘাতে তিনি একটি গর্তের মধ্যে পড়ে গেলেন।

এ সময় শয়তান উচ্চস্বরে চিৎকার করল যে, মুহাম্মাদ নিহত হয়েছে। এই কথা শুনে মুসলিমগণ নিরুৎসাহী হয়ে পড়ল এবং তাদের অধিকাংশই পলায়ন করল। আনাস বিন নযর তখন মুসলিমদের একটি দলের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তিনি দেখলেন তারা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন- তোমরা কিসের অপেক্ষা করছ? তারা জবাব দিল যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) নিহত হয়েছেন। তিনি বললেন- তিনি নিহত হয়ে থাকলে তোমাদের বেঁচে থেকে লাভ কি?। তোমরা উঠ এবং তিনি যেই জন্য শহীদ হয়েছেন তোমরাও সে পথে মৃত্যু বরণ কর। অতঃপর তিনি লোকদের দিকে অগ্রসর হয়ে সা'দ বিন মুআয (রাঃ) এর দেখা পেলেন। সা'দকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন- হে সা'দ! আমি উহুদ পাহাড়ের পিছন দিক থেকে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাচ্ছি। অতঃপর তিনি বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করলেন।

কিছুক্ষণ পর রসূল (ﷺ) মুসলমানদের সামনে আগমণ করলেন। কাব বিন মালেকই সর্বপ্রথম তাঁকে হিলমেটের নীচ থেকে চিনে ফেললেন। তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে, হে মুসলিমগণ! এই তো আল্লাহর রসূল এসে গেছেন। তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। রসূল (ﷺ) ইংগিতের মাধ্যমে তাঁকে চুপ থাকতে বললেন। মুসলমানেরা তাঁর চতুর্পাশে এসে একত্রিত হল। সেখানে আবু বকর, উমার এবং আলী (রাঃ) ও ছিলেন।

উহুদ যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন

উহুদ যুদ্ধের দিন যারা শহীদ হন তাদের মধ্যে হামজাহ, মুসআব বিন উমাইর এবং হানযালা (রাঃ) অন্যতম। রসূল (ﷺ) দেখলেন যে, ফিরিস্তাগণ হানযালাকে গোসল দিচ্ছে। তাই তিনি সাহাবীদেরকে বললেন- তোমরা তার স্ত্রীকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস কর। সাহাবীগণ হানযালার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাদেরকে জানালেন যে, যখন যুদ্ধের ডাক আসল তখন তিনি তাঁর স্ত্রীর বুকের উপর ছিলেন। ডাক শুনে তিনি দ্রুত জিহাদের ময়দানে বের হয়ে পড়েন। হানযালার ঘটনা থেকে আলেমগণ দলীল গ্রহণ করেছেন যে, অপবিত্র অবস্থায় যদি কেউ শহীদ হয়, তবে তাকে গোসল দিতে হবে।

এই যুদ্ধে আরও যারা শহীদ হয়েছেন, তাদের মধ্যে আমর বিন ছাবেতও অন্যতম। তিনি উসাইরাম নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ ইসলাম কবুল করতে অস্বীকার করতেন। যখন উহুদ

যুদ্ধের দিন আসল তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অন্তরে ইসলামের প্রতি ভালবাসা ঢুকিয়ে দিলেন। তিনি ইসলামে প্রবেশ করলেন। তলোয়ার হাতে নিয়ে উহুদ প্রান্তরে রসূল (ﷺ) এর নিকট চলে গেলেন। এ সময় তাঁর হাতে কয়েকটি খেজুর ছিল। তিনি সেখান থেকে খাচ্ছিলেন। খেজুরগুলো তিনি এই বলে ফেলে দিলেন যে, আমি যদি এগুলো শেষ করা পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তাহলে তা হবে এক দীর্ঘ জীবন। অতঃপর তিনি বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে পড়ে গেলেন।

তার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে কেউ অবগত ছিলনা। যুদ্ধ শেষে তার গোত্রীয় লোকেরা শহীদদের মধ্যে স্বজনদের খোঁজ করতে গিয়ে উসাইরামকে পেয়ে গেলেন। তখনও তাঁর রূহ বের হয়ে যায়নি। তারা বলে উঠলঃ আল্লাহর শপথ! এ দেখছি উসাইরাম। সে এখানে কি জন্যে আসল? ইতিপূর্বে তাকে তো আমরা ইসলামের প্রতি নাখোশ অবস্থায় দেখেছি। অতঃপর তারা তাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করল। হে উসাইরাম! তুমি কি কারণে উহুদ প্রান্তরে এসেছিলে? স্বীয় গোত্রের লোকদেরকে রক্ষা করতে? না ইসলামের প্রতি অনুরাগী হয়ে? সে উত্তর দিল, বরং ইসলামকে ভালবেসে এবং এতে অনুরাগী হয়ে। আমি আল্লাহর প্রতি এবং আল্লাহর রসূলের প্রতি ঈমান এনেছি। এরপর আমি আল্লাহর রসূলের পক্ষে যুদ্ধ করে এই অবস্থায় পৌঁছেছি। এই বলে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। সাহাবীগণ রসূল (ﷺ) এর নিকট উসাইরামের ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন তিনি বললেন- উসাইরাম জান্নাতী হয়ে গেছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন- তিনি আল্লাহর জন্য একটি সিজদাও করেন নি। তার সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে যে, তিনি সামান্য কাজ করে বিরাট বিনিময় পেয়ে গেলেন।

উহুদ যুদ্ধে আরও যারা শহীদ হয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন জাবের (রাঃ) এর পিতা আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন হারাম। তিনি বলেন- উহুদ যুদ্ধের পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, মুবাশশির বিন মুনযির আমাকে বলছেনঃ অচিরেই তুমি আমাদের সাথে মিলিত হবে। আমি বললামঃ কোথায়? তিনি বললেন- জান্নাতে। আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়াব। আমি মুবাশশিরকে বললামঃ তুমি কি বদরের যুদ্ধে শহীদ হয়ে যাওনি? তিনি বললেন- হ্যাঁ। তবে আমি পুনরায় জীবিত হয়েছি। স্বপ্নের বিষয়টি রসূল (ﷺ) কে বলা হলে তিনি বললেন- হে জাবেরের পিতা! তুমি অচিরেই আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হবে। তিনি উহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

আমর ইবনুল জামুহ ছিলেন একজন লেংড়া সাহাবী। তাঁর ছিল চারজন যুবক পুত্র সন্তান। পুত্রদের সকলেই রসূল (ﷺ) এর সকল যুদ্ধেই অংশ নিতেন। রসূল (ﷺ) যখন উহুদের উদ্দেশ্যে বের হলেন তখন তিনিও তাঁর সাথে বের হতে চাইলেন।

সন্তানেরা তাঁকে বলল- আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। আপনি বাড়িতেই থাকুন। আমরাই আপনার পক্ষ হতে যথেষ্ট। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে জিহাদ থেকে রেহাই দিয়েছেন। আমর বিন জামুহ এ কথা শুনে রসূল (ﷺ) এর নিকট এসে বললেন- হে

আল্লাহর রসূল! আমার এই ছেলেরা আমাকে আপনার সাথে জিহাদে বের হতে বারণ করছে। আল্লাহর শপথ আমি আমার এই লেংড়া পা নিয়ে জান্নাতে বিচরণ করতে চাই। রসূল (ﷺ) তাঁকে বললেন- আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে জিহাদ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। আর তাঁর ছেলেদেরকে বললেন- তোমরা যদি তাকে জিহাদে যেতে দাও, তাহলেও তোমাদের কোন ক্ষতি হবেনা। সম্ভবতঃ আল্লাহ্ তাকে শাহাদাতের মাধ্যমে সম্মানিত করবেন। অতঃপর তিনি রসূল (ﷺ) এর সাথে উহুদের দিন জিহাদে বের হয়ে শহীদ হলেন।

উহুদ যুদ্ধ শেষে আবু সুফিয়ান তিনবার বলল- মুহাম্মাদ কি লোকদের মধ্যে জীবিত আছে? নাবী (ﷺ) লোকদেরকে জবাব দিতে নিষেধ করলেন। অতঃপর আবু সুফিয়ান তিনবার বলল- লোকদের মধ্যে আবু কুহাফার পুত্র আছে কি? পুনরায় তিনবার বলল- লোকদের মধ্যে খাত্তাবের পুত্র কি আছে? অতঃপর আবু সুফিয়ান তার সাথীদের কাছে গিয়ে বলল- এরা তিন জনই নিহত হয়েছে। এ কথা শুনে উমার (রাঃ) আত্মসংবরণ করতে না পেরে বলে উঠলেনঃ আল্লাহর শপথ! হে আল্লাহর দুশমন! তোমার ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তুমি যাদের নাম ধরে ডাকলে তাদের সবাই জীবিত আছেন। তোমার কষ্টের দিনগুলো বাকী রয়েছে। আবু সুফিয়ান বলল- আজকের দিন বদরের যুদ্ধের দিনের প্রতিশোধ হয়ে গেল। আর যুদ্ধ তো পানির পাত্রের মত। অর্থাৎ পানির পাত্র যেমন একজনের হাতে স্থির থাকে না, তেমনি যুদ্ধে একবার একজন, আরেকবার অন্য জন জয়লাভ করে থাকে। তোমরা তোমাদের কিছু লোককে মুছলা অবস্থায় তথা নাক কান কাটা পাবে। অবশ্য এরূপ করার জন্য আমি নির্দেশ করিনি। এতে আমার কোন দুঃখও নেই। এরপর আবু সুফিয়ান উচ্চস্বরে কবিতার ছন্দ উচ্চারণ করতে লাগল- হোবলের জয়! হোবলের জয়! নাবী (ﷺ) তখন বললেন- তোমরা কি তার কথার জবাব দেবে না? তাঁরা বললেন- হে আল্লাহর রসূল! বলুনঃ আমরা কি বলে তার জবাব দেব? তিনি বললেন- তোমরা বলঃ আল্লাহ মহান! তিনি সবচেয়ে বড়। আবু সুফীয়ান বলল- আমাদের আছে উয্যা। তোমাদের কোন উয্যা নেই। নাবী (ﷺ) বললেন- তোমরা কি তার কথার জবাব দেবে না? তারা বললেন- হে আল্লাহর রসূল! বলুনঃ আমরা কি জবাব দেব? নাবী (ﷺ) বললেন- তোমরা বলঃ আমাদের মাওলা হলেন আল্লাহ। তোমাদের কোন মাওলা নেই।

অতঃপর আবু সুফিয়ান বলতে লাগল- আজ আমরা বদরের যুদ্ধের বদলা নিতে সক্ষম হয়েছি। যুদ্ধের ক্ষেত্রে এ রকম সমান সমান হয়েই থাকে। উমার (রাঃ) তখন বললেন- সমান সমান হয় কিভাবে? আমাদের শহীদগণ জান্নাতী। আর তোমাদের নিহতরা জাহান্নামী।

আবু সুফিয়ান যখন শিরক, কুফর ও দেব-দেবী নিয়ে বাহাদুরী করল নাবী (ﷺ) তখন তাওহীদের বড়ত্ব প্রকাশ ও মুসলমানদের একমাত্র মাবুদ আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করার জন্য জবাব দিতে বললেন। এর আগে যখন সে বলেছিল- তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ বেঁচে আছে কি? আবু বকর বেঁচে আছে কি? উমার বেঁচে আছে কি? তখন তিনি জবাব দিতে নিষেধ করেছেন। কেননা

তখনও তাদের প্রতিশোধ স্পৃহা শেষ হয়নি। অতঃপর আবু সুফিয়ান যখন বলল- এদের তিনজনই নিহত হয়েছেন। তখন উমার নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন না। তিনি বললেন- হে আল্লাহর দুশমন তুমি মিথ্যা বলেছ। এদের সকলেই জীবিত আছেন।

উমারের এই ঘোষণায় বিপদজনক অবস্থাতেও সাহসিকতা ও শত্রুদের প্রতি সজাগ থাকার পরিচয় পাওয়া যায়। এতে আরও পরিচয় পাওয়া যায় মুহাম্মাদের অনুসারীগণ বীরত্বের অধিকারী এবং তারা শত্রুদের থেকে ভীত নন। তার জবাবে শত্রুদের মর্ম জ্বালা সৃষ্টি হয়েছিল। আবু সুফিয়ান যখন প্রত্যেকের খবর আলাদাভাবে জানতে চেয়েছিল তখন তিনি জবাব দেন নি। আর যখন তিনজনের কথা একসাথে বলেছিল তখন জবাব দিয়েছেন। এতে তিনি তাদের শক্তিকে দুর্বল করতে চেয়েছেন। সুতরাং প্রথমবার জবাব না দেয়া উত্তম ছিল। দ্বিতীয়বার জবাব দেয়া উত্তম হয়েছে। প্রথমবার জবাব না দিয়ে তিনি আবু সুফিয়ানকে অপমানিত করতে চেয়েছেন। সে যখন তাদের তিনজনকে মৃত জেনে খুশী হতে চেয়েছিল এবং অহংকার করতে চেয়েছিল তখন জবাব দিয়ে তিনি তাকে নিরাশ করতে চেয়েছেন। সুতরাং উমার (রাঃ) এর জবাবে রসূল (ﷺ) এর নিষেধাজ্ঞার বিরোধীতা ছিলনা।

উহুদ যুদ্ধে যে সমস্ত হুকুম-আহকাম ও শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে

- যুদ্ধ শুরু করার পর তা চালিয়ে যাওয়া আবশ্যক। সুতরাং যে ব্যক্তি যুদ্ধের পোশাক পরিধান করবে এবং মাঠে নেমে যাবে তার জন্য যুদ্ধ থেকে সরে আসা বৈধ নয়।
- মুসলিম দেশে শত্রু আগমণ করে হামলা করলে মুসলমানদের জন্য নগর ফটকের বাইরে গিয়ে শত্রুকে প্রতিহত করা আবশ্যক নয়।
- যে সমস্ত শিশু যুদ্ধের ক্ষমতা রাখেনা তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হবেনা।
- জিহাদের ক্ষেত্রে মহিলাদের দ্বারাও সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।
- যুদ্ধের ময়দানে শত্রুদলের মধ্যে ঢুকে পড়া জায়েয আছে। যেমনটি করেছিলেন আনাস বিন নযর (রাঃ)।
- ইমাম যদি আহত হয়ে যান আর তিনি যদি বসে সলাতের ইমামতি করেন, তাহলে পিছনের লোকেরাও বসে সলাত পড়বে।
- আল্লাহর কাছে শাহাদাতের তামান্না (আশা) করা এবং দু'আ করা দোষের কিছু নয়। যেমন আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ শাহাদাত কামনা করেছিলেন।
- কোন মুসলিম যদি আত্মহত্যা করে তাহলে সে জাহান্নামী হবে। কাযমান যখন উহুদ যুদ্ধে আহত হলেন তখন সে জখমের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে আত্ম হত্যা করল। নাবী (ﷺ) তা জানতে পেরে বললেন- সে জাহান্নামী।
- যুদ্ধক্ষেত্রে যারা শহীদ হবে তাদেরকে গোসল দেয়া হবেনা এবং তাদের জানাযা পড়া হবেনা। যে পোষাকে তারা নিহত হবেন সেই পোষাকেই তাদেরকে দাফন করা হবে।

তবে শত্রুরা যদি তার পোশাক ছিনিয়ে নেয় তাহলে অন্য পোষাকে কাফন পরাতে হবে। আর কেউ যদি স্ত্রী সহবাস জনিত কারণে নাপাক থাকে তাহলে গোসল দেয়া হবে। যেমন হানযালা (রাঃ) কে ফিরিস্তারা গোসল দিয়েছিলেন। শহীদদের পরিহিত পোষাকেই দাফন করা মুস্তাহাব না ওয়াজিব? এ ব্যাপারে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। তবে সঠিক কথা হচ্ছে তা ওয়াজিব।

- যুদ্ধের শহীদদেরকে যুদ্ধের ময়দানেই দাফন করতে হবে। কেননা উহুদের যে সমস্ত শহীদকে মদ্বীনায় বহন করে নেওয়া হয়েছিল নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লম তাদেরকে উহুদের মাঠে ফেরত নিয়ে তথায় দাফন করতে আদেশ দিয়েছেন।
- এক কবরে দুইজন বা তিনজন মৃতকে দাফন করা জায়েয আছে।
- বিকলাঙ্গ বা অন্য কোন উযর (ওযূহাত) থাকার কারণে যাদের জন্য জিহাদে বের না হওয়ার অনুমতি আছে, ইচ্ছা করলে তারাও জিহাদে বের হতে পারে। যেমন নাবী (ﷺ) একজন লেংড়া সাহাবীকে যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছিলেন।

কোন মুসলিম যদি যুদ্ধের ময়দানে ভুলক্রমে অন্য কোন মুসলিমকে হত্যা করে ফেলে, তাহলে বাইতুল মাল থেকে দিয়ত পরিশোধ করতে হবে। কেননা রসূল (ﷺ) হুযায়ফা বিন ইয়ামানের পিতার দিয়ত দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হুযায়ফা (রাঃ) তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন।

বি'রে মাউনাহর মর্মান্তিক ঘটনা

যে মাসে রাযী এর ঘটনা সংঘটিত হয় ঠিক সেই মাসেই বি'রে মাউনার বেদনাদায়ক ঘটনাও সংঘটিত হয়। এ ঘটনা রাযী'র ঘটনার চাইতেও কঠিন ও বেদনাদায়ক।

এ ঘটনার সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে, আবূ বারা' 'আমির বিন মালিক যিনি 'মুলায়েবুল আসিন্নাহ' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন (বর্শা নিয়ে যিনি খেলা করেন) এক দফা মদীনায় নাবী কারীম (ﷺ)-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন। নাবী কারীম (ﷺ) তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন না কিংবা তা থেকে সরেও গেলেন না। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! যদি আপনি দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য সাহাবীগণকে (রাঃ) নাজদবাসীগণের নিকট প্রেরণ করেন তাহলে তারা আপনার দাওয়াত গ্রহণ করবে বলে আশা করি।'

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন,

(إِنِّيْ أَخَافُ عَلَيْهِمْ أَهْلَ نَجْد)

'নাজদবাসীদের থেকে নিজ সাহাবীগণ সম্পর্কে আমি ভয় করছি।'আবূ বারা' বললেন, 'তারা আমার আশ্রয়ে থাকবেন।'এ কারণে ইতিহাসবিদ ইবনু ইসহাক্বের বর্ণনা মতে ৪০ জন এবং

সহীহুল বুখারীর তথ্য মোতাবেক ৭০ জন সাহাবাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর সঙ্গে প্রেরণ। ৭০ জনের সংখ্যাটি সঠিক বলে প্রমাণিত। মুনযির বিন আমিরকে (বনু সায়েদা গোত্রের সঙ্গে যার সম্পর্ক ছিল এবং 'মু'নিক লিইয়ামূত' (মৃত্যুর জন্য স্বাধীনকৃত) উপাধিতে ভূষিত ছিলেন, দলের নেতা নিযুক্ত করেন। এ সাহাবাবৃন্দ (রাঃ) ছিলেন বিজ্ঞ, ক্বারী, এবং শীর্ষ স্থানীয়। তাঁরা দিবা ভাগে জঙ্গল থেকে জ্বালানী সংগ্রহ করে তার বিনিময়ে আহলে সুফফাদের জন্য খাদ্য ক্রয় করতেন ও কুরআন শিক্ষা করতেন এবং শিক্ষা দিতেন এবং রাত্রি বেলা আল্লাহর সমীপে মুনাজাত ও সালাতের জন্য দন্ডায়মান থাকতেন। এ ধারা অবলম্বনের মাধ্যমে তাঁরা মাউনার কূপের নিকট গিয়ে পৌঁছলেন। এ কূপটি বনু 'আমির এবং হাররাহ বনু সুলাইমের মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল।

সেই স্থানে শিবির স্থাপনের পর এ সাহাবীগণ (রাঃ) উম্মু সুলাইমের ভ্রাতা হারাম বিন মিলহানকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পত্রসহ আল্লাহর শত্রু 'আমির বিন তোফাইলের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু পত্রটি পাঠ করা তো দূরের কথা তার ইঙ্গিতে এক ব্যক্তি হারামকে পিছন দিক থেকে এত জোরে বর্শা দ্বারা আঘাত করল যে, দেহের অপর দিক দিয়ে ফুটা হয়ে বের হয়ে গেল। বর্শা-বিদ্ধ রক্তাক্তদেহী হারাম বলে উঠলেন, 'আল্লাহর মহান! কাবার প্রভূর কসম! আমি কৃতকার্য হয়েছি।' এরপর পরই আল্লাহর শত্রু আমির অবশিষ্ট সাহাবাদের (রাঃ) আক্রমণ করার জন্য তার গোত্র বনু আমিরকে আহবান জানাল। কিন্তু যেহেতু তাঁরা আবূ বারা'র আশ্রয়ে ছিলেন সেহেতু তারা সেই আহবানে সাড়া দিল না। এদিক থেকে সাড়া না পেয়ে সে বনু সুলাইমকে আহবান জানাল। বুন সুলাইমের তিনটি গোত্র উমাউয়া, রে'ল এবং যাকওয়ান। এ আহবানে সাড়া দিয়ে তৎক্ষণাৎ সাহাবীগণ (রাঃ)-কে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলল। প্রত্যুত্তরে সাহাবায়ে কেরাম যুদ্ধে লিপ্ত হলেন এবং একজন বাদে সকলেই শাহাদত বরণ করলেন। কেবলমাত্র কা'ব বিন যায়দ (রাঃ) জীবিত ছিলেন। তাঁকে শহীদগণের মধ্য থেকে উঠিয়ে আনা হয়। খন্দকের যুদ্ধ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন।

তাছাড়া আরও দু'জন সাহাবী- 'আমর বিন উমাইয়া যামরী (রাঃ) এবং মুনযির বিন উক্ববা বিন আমির (রাঃ) উট চরাচ্ছিলেন। ঘটনাস্থলে তাঁরা পাখী উড়তে দেখে সেখানে গিয়ে পৌঁছেন। অতঃপর মুনযির তাঁর বন্ধুগণের সংখ্যা মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শাহাদতবরণ করেন। 'আমর বিন উমাইয়া যামরীকে বন্দী করা হয়। কিন্তু যখন তারা অবগত হয়ে যে, মুযার গোত্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক রয়েছে তখন আমির তার কপালের চুল কেটে দিয়ে তার মায়ের পক্ষ হতে- যার উপর একটি দাসকে স্বাধীন করার মানত ছিল- তাঁকে মুক্ত করে দেয়।

'আমর বিন উমাইয়া যামরী (রাঃ) এ বেদনা-দায়ক ঘটনার খবর নিয়ে মদীনায় পৌঁছলেন। ৭০ জন বিজ্ঞ মুসলিমের এ হৃদয় বিদারক শাহাদাত উহুদ যুদ্ধের ক্ষতকে আরও বহুগুণে বর্ধিত করে তোলে। কিন্তু উহুদের তুলনায় এ ঘটনা আরও মর্মান্তিক ছিল এ কারণে যে, উহুদ যুদ্ধে মুসলিমগণ

শত্রুদের সঙ্গে মুখোমুখী যুদ্ধ করে শাহাদত বরণ করেন, কিন্তু এক্ষেত্রে মুসলিমগণ চরম এক বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।
'আমর বিন উমাইয়া যামরী (রাঃ) প্রত্যাবর্তন কালে কানাত উপত্যাকার প্রান্তভাবে অবস্থিত কারকারা নামক স্থানে পৌঁছে একটি বৃক্ষের ছায়ায় অবতরণ করেন। বনু কিলাব গোত্রের দু' ব্যক্তিও তথায় অবস্থান গ্রহণ করে। তারা উভয়েই যখন ঘুমে নিমগ্ন হয়ে পড়ে তখন 'আমর বিন উমাইয়া (রাঃ) তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলল। তাঁর ধারণা ছিল যে, এদের হত্যা করে তার সঙ্গীদের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন। অথচ তাদের দু' জনের নিকট রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পক্ষ থেকে অঙ্গীকার ছিল, কিন্তু 'আমর বিন উমাইয়া (রাঃ) তা জানতেন না। কাজেই, মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর যখন তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে ব্যাপারটি অবহিত করেন তখন তিনি বললেন যে,
(لَقَدْ قَتَلْتَ قَتِيْلَيْنِ لَأَدِيَنَّهُمَا) '
তুমি এমন দুজনকে হত্যা করেছ যাদের শোনিত পাতের খেসারত অবশ্যই আমাকে করতে হবে।'
এরপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুসলিম এবং তাঁদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ইহুদীদের নিকট থেকে শোনিত পাতের খেসারত একত্রিত করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এটাই পরিণামে বনু নাযীর যুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।এর বিবরণ পরবর্তীতে আসছে।
মা'উনাহ এবং রাযী'র উল্লেখিত বেদনা-দায়ক ঘটনাবলীতে যা মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে সংঘটিত হয়েছিল রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এতই ব্যথিত হয়েছিলেন এবং এ পরিমাণ চিন্তিত ও মর্মাহত হন যে, যে সকল গোত্র ও সম্প্রদায় বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে সাহাবীগণকে (রাঃ) হত্যা করে নাবী কারীম (ﷺ) এক মাস যাবৎ তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর সমীপে বদ দু'আ করতে থাকেন। তিনি ফজরের সালাতে রে'ল যেকওয়ান, লাহইয়ান এবং উসাইয়া গোত্রের বিরুদ্ধে বদ্-দোয়া করেন এবং বললেন যে,
(عُصَيَّةٌ عَصَتْ اللهَ وَرَسُوْلَه)
উসাইয়া আল্লাহ এবং তার রাসূলের নাফারমানী করেছে।'
আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে স্বীয় নাবীর উপর আয়াত অবতীর্ণ করেন যা পরবর্তী কালে মানসুখ হয়ে যায়।
সেই আয়াত ছিল এইরূপ-
(بَلِّغُوْا عَنَّا قَوْمَنَا أَنَا لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِيْنَا عَنْه) 'আমার সম্প্রদায়কে এ কথা বলে দাও যে, আমরা আপন প্রতিপালকের সঙ্গে মিলিত হয়েছি। তিনি আমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, আমারও তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়েছি। এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কুনুত পাঠ করা ছেড়ে দেন।

গাযওয়ায়ে আহযাব (খন্দক বা পরিখার যুদ্ধ)

এক বছরকালব্যাপী উপর্যুপরি সামরিক অভিযান এবং কর্মকান্ডের প্রেক্ষাপটে আরব উপদ্বীপে শান্তি ও স্বস্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল এবং সর্বত্র সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ বিরাজমান ছিল। কিন্তু যে সকল ইহুদীকে নিজেদের দুষ্কর্ম ও চক্রান্তের কারণে নানা প্রকার অপমান ও লাঞ্ছনার আস্বাদ গ্রহণ করতে হয়েছিল তখনো তাদের চৈতন্যোদয় হয়নি। বিশ্বাসঘাতকতা, শঠতা, অঙ্গীকারভঙ্গ, ধোকাবাজি, আমানতের খেয়ানত ইত্যাদি নানাবিধ অপকর্মের অশুভ ফলাফল থেকে কোন শিক্ষাই তাদের হয়নি। কাজেই, মদীনা থেকে বহিস্কৃত হয়ে খায়বার যাওয়ার পর মুসলিম ও মূর্তিপূজকদের মধ্যে যে সামরিক টানাপোড়েন চলছিল তার ফলাফল কী দাঁড়ায় তা প্রত্যক্ষ করার জন্য তারা অপেক্ষমান থাকে। কিন্তু যখন তারা প্রত্যক্ষ করল যে, পরিস্থিতি ক্রমেই মুসলিমগণের অনুকূলে যাচ্ছে এবং তাঁদের শাসন ক্ষমতা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে তখন তারা হিংসার আগুনে জ্বলেপুড়ে মরতে লাগল এবং নানা প্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। শেষ বারের মতো মুসলিমগণকে এমন এক চরম আঘাত হানার জন্য তারা প্রস্তুতি শুরু করে দিল যাতে তাঁদের জীবন প্রদীপ চিরতরে নির্বাপিত হয়ে যায়। কিন্তু যেহেতু মুসলিমগণের সঙ্গে সরাসরি মোকাবেলা করার সাহস তাদের ছিল না সেহেতু এক অত্যন্ত বিপজ্জনক পন্থা অবলম্বন করল যা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল :

বনু নাযীর গোত্রের ২০ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি মক্কার কুরাইশগণের নিকট উপস্থিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করতে থাকে এবং যুদ্ধে তাদের সাহায্য সহযোগিতা করার জন্যও নিশ্চয়তা প্রদান করে। সেহেতু উহুদ যুদ্ধের দিন কুরাইশরা পুনরায় মুসলিমগণের সঙ্গে বদরে মোকাবেলা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা পালন করতে ব্যর্থ হয় এবং এর ফলে যোদ্ধা হিসেবে তাদের যে সুখ্যাতির হানি হয় তা পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যেই বনু নাযীরের প্রস্তাব তাদের উৎসাহিত করে এবং তারা তা মেনে নেয়।

এরপর ইহুদীগণের এ দলটি বনু গাত্বাফান গোত্রের নিকট যায় এবং কুরাইশদের মতো তাদেরকেও যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। এ প্রেক্ষিতে তারাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। অধিকন্তু, এ প্রতিনিধি দলটি আরবের অবশিষ্ট গোত্রগুলোর নিকট ঘোরাফিরা করে তাদেরকেও যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ এবং উৎসাহিত করতে থাকে। যার ফলে তারা অনেকেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। এভাবে ইহুদীগণ অত্যন্ত কার্যকরভাবে নাবী কারীম (ﷺ), ইসলামী দাওয়াত এবং মুসলিমগণের বিরুদ্ধে কাফির মুশরিকদের বড় বড় গোত্র এবং দলগুলোকে উত্তেজিত ও উদ্বুদ্ধ করে যুদ্ধের জন্য তৈরি করে নেয়।

অতঃপর নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী দক্ষিণদিক হতে কুরাইশ কিনানাহ এবং তুহামায় বসবাসরত দ্বিতীয় হালিফ (চুক্তিবদ্ধ) গোত্রসমূহ মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যায়। এদের সংখ্যা ছিল চার হাজার এবং সার্বিক নেতৃত্বে ছিল আবূ সুফইয়ান। এ বাহিনী মাররুয যাহরান গিয়ে পৌঁছলে বনু

সুলাইম গোত্র এসে তাদের সঙ্গে যোগদান করে। ঐ সময় পূর্বদিক হতে গাত্বাফানী গোত্র ফাযারা, মুররাহ এবং আশজা গোত্র রওয়ানা হয়ে যায়। ফাযারাহর সেনাপতি ছিলেন উয়াইনাহ বিন হাসান, মুররাহর গোত্রের নেতৃত্বে ছিল হারিস বিন আউফ এবং বনু আশজা গোত্রের নেতৃত্বে ছিল মিসআর বিন রুহাইলাহ। তাদের নেতৃত্বাধীনে বনু আসাদ এবং অন্যান্য বিভিন্ন গোত্রের অনেক লোকজনও এসেছিল।

উল্লেখিত গোত্রগুলো একটি নির্দিষ্ট সময় এবং নির্ধারিত কর্মসূচি মোতাবেক মদীনা অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিল। এ প্রেক্ষিতে কয়েক দিনের মধ্যেই মদীনার আশপাশে দশ হাজার সৈন্যের এক দুর্ধর্ষ বাহিনী সমবেত হল। তারা এত বেশী সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করেছিল যে মদীনার মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ ও যুবকের সমষ্টিগত সংখ্যার চাইতেও তাদের সৈন্য সংখ্যা ছিল বেশী। শত্রুপক্ষের এ সৈন্য সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ যদি আকস্মিকভাবে মদীনার দেয়াল পর্যন্ত পৌঁছে যেত তাহলে মুসলিমগণের জন্য তা হতো অত্যন্ত বিপজ্জনক। তখন এতে আশ্চর্য হওয়ার মতো কিছুই থাকত না যে, মুসলিমগণের মূলোৎপাটন করে তাঁদের সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হত।

কিন্তু মদীনার নেতৃত্ব ছিল অত্যন্ত সজাগ ও সচেতন মস্তিস্ক এবং পরিচালনা ছিল নিচ্ছিদ্র যত্মশীল। তাঁর সচেতন হস্তের আঙ্গুলগুলো সর্বক্ষণ পরিস্থিতির নাড়ির গতির উপর ছিল বিদ্যমান। পরিস্থিতির গতিধারার প্রেক্ষাপটে সংঘটিত ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার ঠিক ঠিক আঁচ অনুমান ও তথ্য পরিবেশন এবং তা থেকে মুক্ত থাকার জন্য তিনি উপযুক্ত সময়ে যথার্থ পদক্ষেপ অবলম্বন করে আসছিলেন। কাজেই কাফিরদের বিশাল বাহিনী যখনই মদীনা অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য সচেষ্ট হল তখনই মদীনার সংবাদ সরবরাহকারীগণ পরিচালকের নিকট ত্বরিৎ সংবাদ পরিবেশন করলেন।

সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া মাত্রই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নেতৃস্থানীয় সাহাবাগণের পরামর্শ বৈঠক আহবান করেন এবং প্রতিরোধ সংক্রান্ত পরিকল্পনার ব্যাপারে সলা পরামর্শ করেন। শুরার প্রতিনিধিগণ অনেক চিন্তা ভাবনার পর সর্বসম্মতক্রমে সালামাহন ফারসী (রাঃ)-এর একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। সালামাহন ফারসীর (রাঃ) প্রস্তাবটির ভাষ্য ছিল নিম্নরূপ :

'হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! পারস্যে যখন আমাদেরকে অবরোধ করা হতো তখন আমরা আমাদের পার্শ্ববর্তী স্থানে পরিখা খনন করে নিতাম।'

প্রতিরোধ সংক্রান্ত এ প্রস্তাবটি ছিল অত্যন্ত হেকমতপূর্ণ ও সম্ভাবনাময়। আরববাসীগণ এ প্রস্তাবের হেকমত সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। এ প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তা বাস্তবায়ণের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ অবলম্বন করেন। এতে প্রতি দশ জনের উপর ৪০ (চল্লিশ) হাত পরিখা খননের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। দায়িত্ব প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মুসলিমগণ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পরিখা খননে আত্মনিয়োগ করেন। নাবী কারীম (ﷺ) এ কাজে সকলকে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করতে থাকেন এবং নিজেও পুরোপুরিভাবে ওতে অংশগ্রহণ করেন। সাহল বিন সা'দ হতে বুখারী

শরীফে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে আমরা খন্দকে ছিলাম। লোকজনেরা খনন করছিলেন এবং আমরা কাঁধে করে মাটি বহন করছিলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পাঠ করলেন, (اللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الْآخِرَةِ، فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ) অর্থ: 'হে আল্লাহ! পরকালীন জীবন তো হচ্ছে প্রকৃত জীবন, অতএব মুহাজিরীন এবং আনসারগণকে ক্ষমা করে দাও।

আনাস হতে বর্ণিত অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন খন্দকের দিকে আগমন করলেন তখন প্রত্যক্ষ করলেন যে, এক শীতের সকালে আনসার ও মুহাজিরীনগণ খনন করছেন। তাদের নিকট এমন কোন দাস নেই যে তাদের পরিবর্তে দাসগণ এ কাজ করে দেয়। তাদের কষ্ট এবং ক্ষুধার ভাব দেখে রাসুল্লাহ (ﷺ) বললেন,

اللهم إن العيش عيش الآخرة ** فاغفر للأنصار والمهاجرة

'হে আল্লাহ! অবশ্যই, পরকালীন জীবনটাই প্রকৃত জীবন। অতএব, আনসার এবং মুহাজিরগণকে ক্ষমা করে দিন।

আনসার এবং মুহাজিরগণ প্রত্যুত্তরে বললেন,

نحن الذين بايعوا محمداً ** عَلٰى الجهاد ما بقينا أبداً

অর্থ: 'আমরা সেই ব্যক্তি যারা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর হস্তে জিহাদের বাইআত করেছি, আমাদের এ প্রতিজ্ঞা চূড়ান্ত ও স্থায়ী।

সহীহুল বুখারীতে বারা' বিন আযিব হতে বর্ণিত আছে, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে খন্দকের মাটি বহনরত অবস্থায় প্রত্যক্ষ করেছি। এ মাটি বহন করার কারণে তাঁর দেহ মুবারক ধূলি ধূসরিত হয়ে উঠেছিল। এ অবস্থায় তাঁকে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহার কবিতার নিম্নোক্ত চরণগুলো আবৃত্তি করতে শুনেছিলাম :

اللهم لولا أنت ما اهتدينا ** ولا تصدقنا ولا صلينا

فأنزلن سكينة علينا ** وثبت الأقدام إن لاقينا

إن الألى رغبوا علينا ** وإن أرادوا فتنة أبينا

অর্থ: 'হে আল্লাহ! যদি তোমার অনুগ্রহ না হতো তাহলে আমরা হিদায়াত প্রাপ্ত হতাম না, আমরা দান খায়রাত করতাম না এবং সালাত আদায় করতাম না। অতএব আমাদের প্রতি শান্তি বর্ষণ কর এবং কাফিরদের সঙ্গে যদি আমাদের মোকাবেলা হয় তাহলে আমাদেরকে ধৈর্য্যদান করিও। তারা আমাদের বিরুদ্ধে লোকদের প্ররোচিত করেছে। যদি তারা ফেৎনা সৃষ্টি করতে চায় তাহলে আমরা কখনই মাথা নত করব না।

বারা' বিন আযিব বলেছেন, 'শেষের শব্দগুলো রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অধিক টান দিয়ে উচ্চারণ করছিলেন, অন্য একটি বর্ণনায় করিতাটির শেষাংশ ছিল নিম্নরূপ :

إن الألى قد بغوا علينا ** وإن أرادوا فتنة أبينا

অর্থ: 'তারা আমাদের উপর অত্যাচার করেছে এব তারা যদি আমাদেরকে ফেৎনায় নিক্ষেপ করতে চায়, আমরা কখনই মাথা নত করে তা মেনে নেব না।'

মুসলিমগণ একদিকে এতই আবেগের সঙ্গে কাজ করছিলেন, অপর দিকে তাঁদের ক্ষুধার তাড়না এত অধিক ছিল যে, তা চিন্তা করতে গেলে অন্তর ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, পরিখা খননরত মুসলিমগণের জন্য যে সামান্য পরিমাণ খাদ্য দ্রব্য আনা হয়েছিল তা ছিল অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত। এ দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্যই তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন।

আবূ ত্বালহাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট আমরা ক্ষুধার অভিযোগ করলাম এবং নিজ নিজ পেটের আবরণ উন্মোচন করে পেটের সঙ্গে বেঁধে রাখা পাথর দেখালাম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আপন পেটের আবরণ উন্মোচণ করে দেখালেন যে, তাঁর পেটের দুটি পাথর বাঁধা আছে।

পরিখা খননকালে নবুওয়াতের কতিপয় নিদর্শনও প্রকাশিত হয়। সহীহুল বুখারীর বর্ণনায় আছে যে, নাবী কারীম (ﷺ)-এর তীব্র ক্ষুধার ব্যাপারটি অবগত হয়ে জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) একটি বকরীর বাচ্চা যবেহ করলেন এবং তাঁর স্ত্রী এক সা' (আনুমানিক আড়াই কেজি) যব পিসে আটা তৈরি করলেন। অতঃপর কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবীসহ একান্তে তাঁর বাসায় তশরীফ আনয়নের জন্য নাবী কারীম (ﷺ)-কে অনুরোধ পেশ করলেন। কিন্তু নাবী কারীম (ﷺ) পরিখা খননরত সকল সাহাবী (রাঃ)-কে (যাদের সংখ্যা ছিল এক হাজার) সঙ্গে নিয়ে তাঁর গৃহে গমন করলেন। আল্লাহ তা'আলার অশেষ অনুগ্রহে এ স্বল্প খাদ্যে সাহাবীগণের সকলেই পূর্ণ পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করলেন অথচ মাংসের পাত্রে সাবেক পরিমাণ মাংস অবশিষ্ট রইল এবং আটার পাত্রেও সাবেক পরিমাণ আটা অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় ক্রমাগতভাবে রুটি তৈরি হতে থাকল।

তাঁর পিতা এবং মামাকে খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে নু'মান ইবনু বাশীরের বোন অল্প খেজুরসহ খন্দকের নিকট আগমন করলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তা চেয়ে নিয়ে একটি কাপড়ের উপর ছড়িয়ে দেন। অতঃপর খননরত সাহাবীদের দাওয়াত দিয়ে তা খেতে বললেন। সাহাবীগণ খেতে থাকলে খেজুরের পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকল। পূর্ণ পরিতৃপ্তি সহকারে সকল সাহাবীর খাওয়ার পরেও এ পরিমাণ খেজুর অবশিষ্ট রইল যে, তার কিছু পরিমাণ কাপড়ের বাইরেও পড়েছিল।

খন্দক খনন কালে উপর্যুক্ত ঘটনাবলীর চাইতেও উল্লেখযোগ্য আরও ইমাম বুখারী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। জাবির বলেন, আমরা পরিখা খনন কাজে নিয়োজিত থাকা অবস্থায় একটি অত্যন্ত শক্ত পাথর আমাদের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করল। কয়েকজন সাহাবী নাবী কারীম (ﷺ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! একটি অত্যন্ত শক্ত গোছের পাথর আমাদের খনন কাজে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে।'

নাবী কারীম (ﷺ) বললেন, 'আমি অবতরণ করছি', অতঃপর তিনি যখন সেখানে তশরীফ আনয়ন করলেন তখনো তাঁর পেটের উপর একটি পাথর বাঁধা ছিল। আমরাও তিন দিন যাবৎ কোন

প্রকার খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করি নি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন এ খন্ডের উপর আঘাত করলেন তখন তা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে স্তুপে পরিণত হয়ে গেল।

বারা’ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, ‘খন্দক খনন কালে এক স্থানে একটি অত্যন্ত শক্ত পাথর দৃষ্টিগোচর হল। এ পাথরটিকে কোদাল দ্বারা আঘাত করলে সে আঘাতে পাথরটির কিছুই হল না, বরং কোদাল প্রত্যাঘাত খেয়ে ফিরে আসতে থাকল। উপায়ান্তর না দেখে নাবী কারীম (ﷺ)-কে ব্যাপারটি অবহিত করা হল। ব্যাপারটি অবগত হয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সেখানে আগমন করলেন এবং কোদাল হাতে নিয়ে বিসমিল্লাহ বলার পর পাথরটিকে আঘাত করলেন। এ আঘাতের ফলে পাথরের একটি অংশ ভেঙ্গে পড়ল। তখন তিনি বললেন,

(اللهُ أَكْبَرُ، أُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحُ الشَّامِ، وَاللهِ إِنِّيْ لَأَنْظُرُ قُصُوْرَهَا الْحُمُرِ السَّاعَةِ)

‘আল্লাহ আকবার! আমার হাতে সিরিয়া দেশের চাবি কাঠি দেয়া হয়েছে। আল্লাহ সাক্ষী আছে, সেখানকার লাল দালানগুলো আমার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।’

অতঃপর যখন তিনি দ্বিতীয়বার আঘাত করলেন তখন অন্য একটি অংশ ভেঙ্গে পড়ল। তিনি বললেন,

(اللهُ أَكْبَرُ، أُعْطِيْتُ فَارِسٌ، وُاللهِ إِنِّيْ لَأَبْصِرُ قَصْرَ الْمَدَائِنِ الْأَبْيَضِ الْآنَ)

‘আল্লাহ আকবার! আমাকে পারস্য সাম্রাজ্য দেয়া হয়েছে। আল্লাহ সাক্ষী, এ সময় আমি মাদায়েনের সাদা দালানাগুলো প্রত্যক্ষ করছি। অতঃপর বিসমিল্লাহ্ সহকারে তিনি তৃতীয় বার আঘাত করলেন। তখন পাথরটির অবশিষ্টাংশ ভেঙ্গে পড়ল। এবার তিনি বললেন,

(اللهُ أَكْبَرُ، أُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحُ الْيَمَنِ، وَاللهِ إِنِّيْ لِأَبْصِرُ أَبْوَابَ صَنَعَاءِ مِنْ مَكَانِيْ)

‘আল্লাহ আকবার! আমাকে ইয়ামান রাজ্যের চাবিগুলো প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ সাক্ষী, এখন আমি সানআর সিংহদ্বার প্রত্যক্ষ করছি।সালমান ফারসী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত থেকে ইবনু ইসহাক্ব অনুরূপ বর্ণনা প্রদান করেছেন।

যেহেতু উত্তর দিক ছাড়া অন্যান্য সব দিক থেকেই মদীনা নগরী পাহাড়, পর্বত এবং খেজুর বাগান দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল সেহেতু একজন বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ ও দক্ষ সৈনিক হিসেবে যথার্থই তিনি ধারণা করেছিলেন যে, মদীনার উপর এত বিশাল এক বাহিনীর আক্রমণ একমাত্র উত্তর দিক থেকেই সম্ভব হতে পারে এবং সেই দিকেই তিনি পরিখা খনন করেছিলেন।

মুসলিমগণ পরিখা খনন কাজ একটানা অব্যাহত রাখেন। দিবা ভাগে তাঁরা খনন কাজ চালিয়ে যেতেন এবং সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরে যেতেন। এভাবে মদীনার পার্শ্ববর্তী দেয়াল পর্যন্ত কাফিরদের সুসজ্জিত সৈন্যদল পৌঁছার পূর্বেই নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী খন্দক তৈরির কাজ সম্পন্ন্ হয়ে যায়।

এদিকে চার হাজার সৈন্য সমন্বয়ে গঠিত কুরাইশ বাহিনী মদীনার নিকটবর্তী রূমাহ, জুরফ এবং জাগাবার মধ্যবর্তী মাজমাউল আসয়াল নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে। অন্যদিকে গাত্বাফান

এবং তাদের নাজদী সঙ্গীরা ছয় হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে উহুদের পূর্ব পাশে যামবে নাকনী নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে। এহেন পরিস্থিতির প্রতি ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহ বলেন,

(وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُوْنَ الْأَحْزَابَ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُوْلُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيْمَانًا وَتَسْلِيْمًا) [الأحزاب: 22].

'মু'মিনরা যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখল তখন তারা বলে উঠল- আল্লাহ ও তাঁর রসূল এরই ওয়া'দা আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল সত্য বলেছেন। এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্যের আগ্রহই বৃদ্ধি পেল।' [আল-আহযাব (৩৩) : ২২]

কিন্তু মুনাফিক্ব এবং দুর্বল অন্তঃকরণের লোকদের দৃষ্টি যখন সেই বিশাল সৈন্যবাহিনীর উপর পতিত হতো তখন তাদের অন্তর প্রকম্পিত হতে থাকল। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

(وَإِذْ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُوْلُهُ إِلَّا غُرُوْرًا) [الأحزاب: 12].

' আর স্মরণ কর, যখন মুনাফিক্বরা এবং যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা বলছিল- আল্লাহ ও তাঁর রসূল আমাদেরকে যে ওয়া'দা দিয়েছেন তা ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়।' [আহযাব (৩৩) : ১২]

যাহোক, শত্রুপক্ষের সঙ্গে মোকাবেলার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তিন হাজার সৈন্যের এক বাহিনীসহ অগ্রসর হলেন এবং সালা পর্বতকে পিছনে রেখে শিবির স্থাপন করলেন, সম্মুখভাগে ছিল খন্দক যা মুসলিম এবং কাফিরদের মধ্যে একটি প্রতিবন্ধক প্রাচীর হিসেবে বিদ্যমান ছিল। মুসলিম প্রতীক চিহ্ন (কোড পরিভাষা) ছিল[حٰم~ لاَ يُنْصَرُوْنَ] (হামীম, তাদেরকে সাহায্য করা হবে না)। এ সময় মদীনার দায়িত্বভার অর্পণ করা হয় ইবনু উম্মু মাকতুমের উপর। মদীনার মহিলা এবং শিশুদেরকে নগরের দূর্গ ও গর্তসমূহে সুরক্ষিত রাখা হয়।

আক্রমণের উদ্দেশ্যে মুশরিকগণ যখন মদীনার দিকে অগ্রসর হল তখন প্রত্যক্ষ করল যে, একটি প্রশস্ত পরিখা তাদের এবং মুসলিমগণের মধ্যে প্রতিবন্ধক হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে। অনন্যোপায় হয়ে তাদেরকে অবরোধ সৃষ্টির কথা ভাবতে হল অথচ যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার সময় এ রকম কোন চিন্তা ভাবনা কিংবা প্রস্তুতি তাদের ছিল না। কারণ প্রতিরোধের এ পরিকল্পনা তাদের নিজেদের কথা অনুযায়ী এমন একটি চাতুর্যপূর্ণ কৌশল যে সম্পর্কে আরবগণের কোন ধারণা ছিল না। কাজেই, এ ধরণের রণ-কৌশল সম্পর্কে তারা চিন্তাই করে নি।

খন্দকের নিকট উপস্থিত হয়ে মুশকিরগণ তাদের ধারণাতীত এ রণ-কৌশল প্রত্যক্ষ করে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে উঠল এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে চক্কর দিতে থাকল। এ অবস্থায় তারা এমন কোন দুর্বল স্থানের অনুসন্ধান করছিল যেখান দিয়ে অবতরণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হতে পারে। এদিকে মুসলিমগণ তাদের গতিবিধির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখাছিলেন এবং তারা যাতে খন্দকের নিকটবর্তী হতে সাহসী না হয় এ উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে তীর নিক্ষেপ করছিলেন যাতে তারা

খন্দকের মধ্যে লাফ দিয়ে পড়তে কিংবা অংশ বিশেষ ভরাট করে ফেলে পথ তৈরি করে নিতে না পারে।

এদিকে কুরাইশ আশ্বারোহীগণ এটা কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না যে খন্দকের পাশে অবরোধ সৃষ্টি করে ফলাফলের আশায় অনর্থক অনির্দিষ্ট কাল যাবৎ তারা বসে থাকবে। এ জাতীয় ব্যবস্থা ছিল তাদের অভ্যাস ও শানের সম্পূর্ণ বিপরীত। কাজেই, তাদের একটি দল যার মধ্যে ছিল ‘আমর বিন আবদে উদ্দ, ইকরামা বিন আবূ জাহল এবং যারবার বিন খাত্তাব একটি সংকীর্ণ স্থান দিয়ে খন্দক পার হয়ে গেল এবং তাদের ঘোড়াগুলোও সালায়ার মধ্যবর্তী স্থানে চক্কর দিতে থাকল। পক্ষান্তরে আলী এবং কয়েকজন সাহাবী (রাঃ) খন্দকের যে অংশ দিয়ে তারা প্রবেশ করেছিল সেখানে অবস্থান নিয়ে তাদের পথ বন্ধ করে দিলেন। এর প্রেক্ষিতে ‘আমর বিন আবদে উদ্দ সামনা সামনি মোকাবেলার জন্য উচ্চ কণ্ঠে আহবান জানাল। আলী (রাঃ) তার সঙ্গে মোকাবেলার জন্যে মুখোমুখী হয়ে এমন এক বাক্য উচ্চারণ করেন যার ফলে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত অবস্থায় সে ঘোড়া হতে লাফ দিয়ে অবতরণ করে। সে অশ্বের পদযুগল কর্তন ও অবয়ব বিকৃত করত- সে অন্যতম বীর ও সাহসী মুশরিক ছিল। আলী (রাঃ)-এর সম্মুখে এসে পড়ে। অতঃপর উভয়ের মধ্যে শুরু হল মোকাবেলা। চলল উভয়ের মধ্যে আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণের পালা। অবশেষে প্রবল আঘাত হেনে আলী (রাঃ) তাকে হত্যা করেন। এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে অন্যান্য মুশরিকগণ ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় খন্দক পেরিয়ে পলায়ন করে। তারা এতই ভীত হয়ে পড়েছিল যে, পলায়নের সময় ইকরামা তার বর্শা ফেলে দিয়ে পলায়ন করে।

মুশরিকগণ কোন কোন সময় খন্দক অতিক্রম করে যাওয়ার কিংবা এর প্রশস্ততা কমিয়ে পথ তৈরি করে নেয়ার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালায়, কিন্তু মুসলিমগণও খন্দক থেকে তাদের দূরে রাখার লক্ষে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করে যেতে থাকেন। তারা অদম্য সাহস এবং দক্ষতার সঙ্গে তীর নিক্ষেপ করেন এবং প্রতিপক্ষের তীরন্দাযির মোকাবেলা করে তাদের সকল প্রকার প্রচেষ্টাকে বিফল করে দেন।

শত্রুপক্ষের সঙ্গে অব্যাহত মোকাবেলা করার কারণে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং সাহাবীগণ (রাঃ)-এর পক্ষে সালাত আদায় করা সম্ভব হয় নি। যেমনটি সহীহাইনের মধ্যে জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, খন্দকের দিন উমার বিন খাত্তাব আগমন করেন এবং কাফিরগণ সম্পর্কে কিছু ভালমন্দ কথা বলার পর আরজ করেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! অদ্য সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় খুব কষ্টে সালাত আদায় করতে সক্ষম হয়েছি।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন,(وَأَنَا وَاللهِ مَا صَلَّيْتُهَا) ‘আল্লাহ তা‘আলার শপথ! আমি এখনো সালাত আদায় করতে পারি নি।’

এরপর আমরা নাবী কারীম (ﷺ)-এর সঙ্গে বুতহান নামক স্থানে অবতরণ করি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সেখানে অযু করেন এবং আমরাও অযু করি। অতঃপর তিনি আসরের সালাত আদায় করেন।

এটি ছিল সূর্য অস্তমিত হয়ে যাওয়ার পরের কথা। এরপর মাগরিবের সালাত আদায় করা হয়।[12]

নির্দিষ্ট সময়ে এ সালাত আদায় করতে না পারার কারণে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এতই মর্মাহত হয়েছিলেন যে, মুশরিকদের বিরুদ্ধে তিনি বদ দু'আ করেছিলেন। বুখারী শরীফে আলী (রাঃ)-এর রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, খন্দকের দিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন,

(مَلأَ اللهُ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهِمْ وَقُبُوْرَهِمْ نَارًا، كَمَا شَغَلُوْنَا عَنْ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ)

'হে আল্লাহ! ঐ সকল মুশরিকের বাড়িঘর ও কবর এমনভাবে আগুণে পরিপূর্ণ করে দাও যেভাবে তারা আমাদেরকে 'সালাতে উস্তা' বা মধ্যবর্তী সলাত আদায় করা থেকে বিরত রেখেছে এবং এভাবে সূর্য অস্তমিত হয়ে গেছে।

মুসনাদে আহমাদ এবং মুসনাদে শাফেয়ীতে বর্ণিত আছে যে, মুশরিকগণ নাবী কারীম (ﷺ)-কে জোহর, আসর, মাগরিব ও এশার সালাত আদায় করা থেকে বিরত রাখে। এ প্রেক্ষিতে তিনি একত্রে এ সালাত আদায় করেন। ইমাম নাবাবী বলেন, 'উল্লেখিত বর্ণনা সমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের ব্যাপারে সমাধান হবে, খন্দক যুদ্ধের কয়েকদিন পর্যন্ত এ সমস্যা চালু ছিল। কাজেই, কোন দিন এ রকম এবং অন্য দিন ভিন্ন রকম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল।

এখান থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, মুশরিকগণের পক্ষ থেকে খন্দক অতিক্রম করার প্রচেষ্টা এবং মুসলিমগণের পক্ষ থেকে অব্যাহত প্রতিরোধ কয়েক দিন পর্যন্ত চালু ছিল একটি বিরাট প্রতিবন্ধক, এই জন্যে সামানাসামনি সংগ্রামের সুযোগ সৃষ্টি হয় নি। যুদ্ধের গতিধারা তীর নিক্ষেপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

অবশ্য, তীর নিক্ষেপের ফলে উভয় পক্ষেরই কয়েক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করতে হয় কিন্তু তাদের সংখ্যা আঙ্গুলে গণনা করা সম্ভব। মুসলিম মৃত ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিল ছয় জন এবং মুশরিকদের পক্ষে দশ জন। এর মধ্যে এক কিংবা দু' জন তরবারির আঘাতে নিহত হয়েছিল।

ঐ দু' প্রতিপক্ষ দলের পরস্পর পরস্পরের প্রতি তীর নিক্ষেপের এক পর্যায়ে সা'দ বিন মু'আয তীরবিদ্ধ হন। তীরের আঘাতে তাঁর হাতের মূল শিরা কর্তিত হয়। হেববান বিন আরাক নামক এক কুরাইশীর তীরের আঘাতে তিনি আহত হন। আহত হওয়ার পর তিনি প্রার্থনা করেন, 'হে আল্লাহ! তুমি জানো যে, যে সম্প্রদায় তোমার রাসূল (ﷺ)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং তাকে দেশ হতে বাহির করে দিয়েছে, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার ব্যাপারটি আমার নিকট যত প্রিয়, অন্য কোন সম্প্রদায়ের নিকট ততটা প্রিয় নয়। হে আল্লাহ! আমি মনে করি যে, এখন তুমি তাদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধকে শেষ পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছ। কিন্তু যুদ্ধের ব্যাপারে এখনো যদি কোন কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহলে আমাকে তাদের জন্য অবশিষ্ট রেখে দাও যেন আমি তাদের সঙ্গে জিহাদে লিপ্ত হতে পারি। আর যদি তুমি যুদ্ধ শেষ করে থাক তাহলে এ আঘাতকে বাকী রেখে

এটাকে আমার মৃত্যুর কারণ করে দাও।তিনি তাঁর দু'আয় সর্বশেষে বলেছেন, বনু কুরাইযাহর ব্যাপারে আমার চক্ষু শীতল না হওয়া পর্যন্ত আমাকে মৃত্যু দিও না।

যে প্রকারেই হোক এক দিকে মুসলিমগণ শত্রুদের সামনাসামনি হয়ে উদ্ভূত সমস্যাবলী সমাধানে তৎপর রয়েছেন, অন্য দিকে ষড়যন্ত্রকারী এবং কপটদের শঠতা স্বর্প আপন গর্তের মধ্যে কুন্ডলী পাকাচ্ছে এবং প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে যে, তারা মুসলিমগণের দেহে গরল ঢেলে দেবে। যেমন বনু নাযীরের বড় অপরাধী হুওয়ায় বিন আখতাব বনু কুরাইযাহর আবাসস্থলে এসে তাদের নেতা কা'ব বিন আসাদ কোরযীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। এ কা'ব বিন আসাদ হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে বনু কোরাইয়ার পক্ষ থেকে অঙ্গীকার পালনের অধিকার রাখত এবং যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে এ চুক্তি করেছিল যে, যুদ্ধের সময় সে তাঁকে সাহায্য করবে। (যেমনটি ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে) হুওয়ায় এসে যখন দরজায় করাঘাত করে তখন সে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু হুওয়ায় তার সঙ্গে এমন এমন সব কথাবার্তা বলতে থাকে যে, শেষ পর্যন্ত তাঁর জন্য সে দরজা খুলে দেয়। হুওয়ায় বলল, 'হে কা'ব! আমি তোমার নিকট যুগের ইজ্জত এবং জোয়ারের সাগর নিয়ে এসেছি। আমি নেতা ও পরিচালকগণসহ মুশরিকদেরকে নিয়ে এসে রুমার মাজমাউল আসয়ালে অবতরণ করিয়েছি। তাছাড়া, বনু গাত্বাফানকে তাদের পরিচালক ও নেতৃবৃন্দসহ উহুদের নিকট যামবে নাকমীতে শিবির স্থাপন করেছি। তারা আমার সঙ্গে এ মর্মে অঙ্গীকার করেছে,

'মুহাম্মাদ এবং তার সঙ্গী সাথীদের সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন না করা পর্যন্ত তারা এখান থেকে ফিরে যাবে না।'

কা'ব বলল, 'আল্লাহর কসম! তুমি আমার নিকট যুগের অপমান এবং বর্ষণ-মুখর মেঘমালা নিয়ে এসেছ যা শুধু বিজলীর চমক দিচ্ছে। কিন্তু ওর মধ্যে ফলোৎপাদক কিছুই নেই; হুওয়াই, আমি দুঃখিত আমাকে আমার আপন অবস্থার উপর থাকতে দাও। আমি মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর মধ্যে সততা ও বিশ্বাস রক্ষা ছাড়া অন্য কোন কিছুই দেখি নি।'

কিন্তু হুওয়াই অনবরত তার চুলের খোপা এবং কাঁধের মধ্যে মোচড় দিতে এবং ফুসলাতে থাকল। এভাবেই তাকে বশীভূত করে ফেলল। অবশ্য এ ব্যাপারে হুওয়াইকে কা'বের সঙ্গে একটি অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে হয়। অঙ্গীকারটি ছিল এরূপ যে, কুরাইশগণ যদি মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে হত্যা না করে ফিরে আসার পথ ধরে তাহলে সেও তাদের সঙ্গে তাদের দূর্গে প্রবেশ করবে। অতঃপর তাদের অবস্থা যা হবে তারও তাই হবে। উভয়ের এ অঙ্গীকারের ফলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে কা'বের সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ হয়ে যায় এবং এর ফলে মুসলিমগণের সহযোগী হয়ে দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে তাদের শত্রুদের পক্ষাবলম্বন করে।

এরপর বনু কুরাইযাহর ইহুদীগণ প্রকৃত পক্ষে যুদ্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাজ কর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। ইবনু ইসহাক্বের বর্ণনা সূত্রে জানা যায় যে, সাফিয়্যাহ বিনতে আব্দুল মুত্তালিব

(রাঃ) হাস্সান বিন সাবেত (রাঃ)-এর 'ফারে' নামক দূর্গের মধ্যে অবস্থান করছিলেন। মহিলা এবং শিশুদের সঙ্গে হাস্সানও (রাঃ) সেখানে ছিলেন। সাফিয়্যাহ (রাঃ) বলেন, 'আমাদের নিকটবর্তী স্থান দিয়ে এক জন ইহুদী গমন করল এবং দূর্গের চারদিকে ঘোরাফিরা করতে থাকল। এটি হচ্ছে সেই সময়ের ঘটনা যখন বনু কুরাইযাহ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে সম্পাদিত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে চুক্তির শর্তাবলী থেকে নিজেদের মুক্ত করে নিয়েছিল। আর আমাদের এবং তাঁদের মধ্যে এমন কেউই ছিল না যে, তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুসলিমগণকে নিয়ে শত্রুদের মোকাবেলায় ব্যাপৃত ছিলেন। আমাদের নিকট আসতে পারতেন না। এ জন্য আমি বললাম, 'হে হাস্সান! আপনি তো দেখতে পাচ্ছেন যে এ ইহুদী আমাদের দূর্গের চতুর্দিকে ঘোরাফিরা করছে। আল্লাহর কসম! আমি আশঙ্কা করছি যে, এ ব্যক্তি অন্যান্য ইহুদীদেরকে আমাদের দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন করে দেবে। এদিকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) শত্রুর মোকাবেলায় এতই ব্যস্ত রয়েছেন যে, তাঁরা আমাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসতে পারবেন না। সুতরাং আপনি গিয়ে তাকে হত্যা করে আসুন।

উত্তরে হাসান (রাঃ) বললেন, 'আল্লাহর কসম! আপনি জানেন যে, আমি এ কাজের লোক নই।' সাফিয়্যাহ বললেন, 'আমি এখন নিজেই কোমর বাঁধলাম। তারপর স্তম্ভের একটি কাঠ নিলাম এবং দূর্গ হতে বের হয়ে ঐ ইহুদীর কাছে গেলাম। অতঃপর ঐ কাঠ দ্বারা আঘাত করে করে তার দফা শেষ করে দিলাম এবং দূর্গে ফিরে এসে হাসান (রাঃ)-কে বললাম, যান, এখন তার অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাব পত্রগুলো নিয়ে আসুন। সে পুরুষ লোক বলে আমি তার অস্ত্র খুলিনি। আমার এ কথা শুনে হাসান (রাঃ) বললেন, তার অস্ত্র এবং আসবাবপত্রের আমার কোন প্রয়োজন নেই। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, মুসলিম শিশু এবং মহিলাগণের হেফাযতের উপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ফুফুর ঐ ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপের অত্যন্ত গভীর এবং তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। এ পদক্ষেপের ফলে সাধারণ ইহুদীগণের মনে এ ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে এ দূর্গবাসীগণের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সৈন্য মোতায়েন রয়েছে এবং এ কারণেই তারা দূর্গের উপর চড়াও হওয়ার সাহস করে নি। অথচ দূর্গের মধ্যে তখন কোন সৈন্যই ছিল না।

তবে মূর্তিপূজক আক্রমণকারীদের সঙ্গে তাদের একাত্মতার প্রমাণস্বরূপ তারা তাদের জন্য রসদ সরবরাহ করতে থাকে। ঐ পর্যন্ত মুসলিম বাহিনী তাদের রসদবাহী বিশটি উট আটক করেছিলেন। যাহোক, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন ইহুদীগণের অঙ্গীকার ভঙ্গের সংবাদ অবগত হলেন তখন তিনি এ সম্পর্কিত তথ্যানুসন্ধানের জন্য তৎক্ষণাৎ মনোনিবেশ করলেন। উদ্দেশ্য ছিল বনু কুরাইযাহর মনোভাব অবহিত হওয়ার পর প্রয়োজন বোধে সে আলোকে সামরিক কৌশল পুনর্বিন্যাস করে দেয়া।

কাজেই, এ ব্যাপারে তথ্যানুসন্ধানের জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সা'দ বিন মু'আয, সা'দ বিন উবাদাহ, আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা এবং খাওয়াত বিন জোবায়ের (রাঃ)-কে প্রেরণ করেন। বনু কুরাইযাহ

সম্পর্কে যে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে তা সঠিক না মিথ্যা সে ব্যাপারে অনুসন্ধান চালানোর জন্য তিনি তাদের পরামর্শ দেন। যদি সঠিক হয় তাহলে আভাষ ইঙ্গিতে শুধু তাঁর কাছেই তা ব্যক্ত করার জন্য পরামর্শ দেন। সৈন্যদের মনোবল অটুট রাখার জন্যই এ ব্যবস্থা। পক্ষান্তরে, যদি তারা অঙ্গীকার মান্য করে চলে তাহলে তা সর্ব সমক্ষে প্রকাশ ও আলোচনা করার জন্য পরামর্শ দান করেন।

যখন তারা বনু কুরাইযাহর নিকট গিয়ে পৌঁছলেন তখন তাদের চরম বিশৃঙ্খল ও উত্তেজিত অবস্থায় দেখতে পেলেন। তারা প্রকাশ্যে গালিগালাজ করল, শত্রুতামূলক কথাবার্তা বলল এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি অবমাননা সূচক উক্তি করল। তারা এমন সব কথাবার্তাও বলল, ‘আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে? আমাদের এবং মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর মধ্যে কোন অঙ্গীকার নেই।’

বনু কুরাইযাহর এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করার পর নাবী কারীম (ﷺ)-এর নিকট ফিরে এসে তাঁরা ইঙ্গিতে বললেন, আযল ও কারাহ। এর অর্থ হল আযল ও কারাহ গোত্র যেমন রাজী এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাহাবাগণের সঙ্গে অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিল, বনু কুরাইযাহর ইহুদীগণও অনুরূপভাবে অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে।

বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ, ইফকের ঘটনা ও শিক্ষা

বনু মুস্তালিকের যুদ্ধঃ

সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই যুদ্ধ তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু না হলেও ইসলামের বিকাশ এবং প্রাসঙ্গিক ঘটনা প্রবাহের কারণে এই যুদ্ধের আলাদা গুরুত্ব আছে। অধিকাংশের মতে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল পঞ্চম হিজরীর শাবান মাসে। ইবনে ইসহাকের মতে, শাবান মাসে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রাসূল সাঃ তার গোয়েন্দা বাহিনী মারফত জানতে পারেন, বনু মুস্তালিক গোত্রের সরদার হারিস বিন আবী যিরার মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য নিজ গোত্র এবং অন্যান্য গোত্র থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে মদিনার অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছেন। রাসূল সাঃ তথ্যানুসন্ধান ও পরিস্থিতি যাচাইয়ের জন্য হযরত বুরায়দা ইবনে হুসায়ব আসলামী রাঃ কে প্রেরণ করলেন। তিনি ফিরে এসে খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেন। রাসূল সাঃ যখন এই অভিযোগের সত্যতা নিশ্চিত হলেন তখন তিনি যুদ্ধ প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য সাহাবীদেরকে নির্দেশ দিলেন এবং অভিমুখে একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। এই বাহিনী প্রেরণ করা হয়েছিল শাবান মাসের ২ তারিখে। এই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর পক্ষে প্রথম কোন মুনাফিক বাহিনী অংশগ্রহণ করে। এর পূর্বে আর কখনো মুনাফিকেরা যুদ্ধ করেনি।

মদিনার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেয়া হয় যায়েদ বিন হারিসার উপর, ভিন্নমতে আবুজার এবং ভিন্নমতে নুমায়লা বিন আব্দুল্লাহ লায়সী রাঃ কে। হারিস ইবনে আবি যিরার মুসলিম বাহিনীর খোঁজ নেওয়ার জন্য একজন গোয়েন্দা পাঠান কিন্তু মুসলিমগণ তাকে গ্রেপ্তার করে হত্যা করেন। হারিস তাঁর প্রেরিত গোয়েন্দার নিহত হওয়ার খবর পেল এবং খবর পেল যে, রাসূল সাঃ তাদের বিরুদ্ধে বাহিনী প্রেরণ করেছেন। তখন সে এতটা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল যে, যেসকল বেদুইন তাদের সাথে ছিল তারাও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল। রাসূলুল্লাহ সাঃ মুরায়সী কূপ পর্যন্ত যখন পৌছলেন তখন বনু মুস্তালিক গোত্র যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। মুসলিম বাহিনীর পতাকা বহন করছিলেন আবু বকর সিদ্দিক রাঃ এবং আনসারদের বিশেষ পতাকাটি ছিল হযরত সা'দ ইবনে উবাদা রাঃ এর হাতে। কিছুক্ষনের মাঝেই উভয়পক্ষের মাঝে তীর বিনিময় শুরু হয়। এরপর রাসূল সাঃ-এর নির্দেশক্রমে সাহাবিগণ সর্বোচ্চ শক্তি নিয়ে শত্রুবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং বিজয় অর্জন করেন। মুশরিকরা পরাজিত হয় এবং কিছুসংখ্যক নিহত হয়। মহিলা ও শিশুদের বন্দি করা হয়। বকরীসহ পশুপাল শেষপর্যন্ত মুসলিমগণ গনিমত হিসেবে লাভ করেন। মুসলিমদের মধ্যে মাত্র একজন শাহাদাত বরণ করেন। একজন সাহাবী ভুলক্রমে তাকে হত্যা করে ফেলেছিলেন। তবে এই যুদ্ধ সম্পর্কে ইবনুল কাইয়িম লিখেছেন- মুসলিমদের সাথে কোন সম্মুখ যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি বরং মুসলিম বাহিনীর শত্রুদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করে মহিলা ও শিশুদের আটক করেন এবং চতুষ্পদ জন্তু গুলোকে নিজেদের অধিকার নিয়ে আসেন।

জুয়াইরিয়া রাঃ এর সাথে রাসূল সাঃ-এর বিবাহঃ

শত্রুবাহিনীর নারী ও শিশুদের মাঝে জুয়াইরিয়া ছিলেন। তিনি ছিলেন বনু মুস্তালিকের সর্দার হারিস ইবনে আবী যিরারের কন্যা। কটনে তিনি সাবিত ইবনে কায়স রাঃ এর অংশে পড়েন। হযরত সাবিত তাঁকে মুকাতাব অর্থাৎ, নির্দিষ্ট অর্থ দিয়ে মুক্ত করে দেওয়ার শর্তে দাসী করে নেন। রাসূল সাঃ তাঁর পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করে জুয়াইরিয়াকে মুক্ত করে দেন এবং তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যান। এই বিয়ের ফলে বনু মুস্তালিক গোত্রের একশ পরিবারের লোকদেরকে সাহাবীগণ মুক্ত করে দেন। তারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন আর এর ফলে বলা হতে থাকলো যে এরা সকলেই রাসূল সাঃ-এর শ্বশুর বংশের লোক। এটাই ছিল বনু মুস্তালিক যুদ্ধের বিবরন।

বনু মুস্তালিক যুদ্ধে মুনাফিকদের কার্যকলাপঃ

বনু মুস্তালিক যুদ্ধের পর রাসূল সাঃ তখনও মোরায়সী ঝর্ণার নিকটে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় কিছু লোক পানি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সেখানে আসে। আগমনকারীদের মধ্যে হযরত উমার রাঃ এর একজন শ্রমিকও ছিল। তার নাম ছিল যাহাজা গিফারী। আর একজন ছিল যার নাম ছিল সিনান ইবনে ওয়াবার জুহানী। কোন কারণে দুজনের মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়ে শেষ পর্যন্ত ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়। এক পর্যায়ে জুহানী চিৎকার শুরু করে দেয়, 'আনসারদের দল সাহায্যের জন্য দ্রুত এগিয়ে এসো'। অপরপক্ষে জাহাজাও আহবান করতে থাকে, 'মুহাজিরদের দল আমাকে সাহায্য করার জন্য শীঘ্রই এগিয়ে এসো'। রাসূল সাঃ-এর সংবাদ পেয়ে তৎক্ষণাৎ সেখানে গেলেন এবং বললেন, "আমি তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান আছি অথচ তোমরা জাহেলী যুগের মতো আচরণ করছো? তোমরা এটা ছেড়ে দাও, এসব হচ্ছে দুর্গন্ধযুক্ত"।

আব্দুল্লাহ বিন উবাই এ ঘটনা শুনে রাগে ফেটে পড়ল এবং বলল, 'এর মধ্যেই এরা এরকম কাজ শুরু করে দিয়েছে? আমাদের অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে আমাদের সাথেই প্রতিযোগিতা করছে এবং আমাদের সমকক্ষ হতে চাচ্ছে? আল্লাহর কসম আমাদের এবং তাদের উপর সেই উদাহরণ প্রযোজ্য হতে যাচ্ছে যেমনটা পূর্ব যুগের লোকেরা বলেছেন যে, নিজের কুকুরকে লালন-পালন করে হৃষ্টপুষ্ট করো যেন সে তোমাকে ছেড়ে খেতে পারে। আল্লাহর কসম যদি আমি ফিরে যেতে পারি তাহলে দেখবে যে আমাদের সম্মানিত ব্যক্তিগণই নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের মদিনা থেকে বের করে দিয়েছে'। এরপর উপস্থিত লোকদেরকে সে বলল, 'এই বিপদ তোমরা নিজেরাই নিয়ে এসেছ, তোমরা তাকে নিজ শহরে জায়গা দিয়েছো এবং নিজেদের সম্পদ বন্টন করে দিয়েছ। দেখো, তোমাদের হাতে যা কিছু আছে তা দেয়া যদি বন্ধ করে দাও তবে সে তোমাদের শহর ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবে'। এই সময়ে বৈঠকে যায়েদ বিন আরকাম রাঃ উপস্থিত ছিলেন। তিনি ফিরে

এসে তার চাচাকে সমস্ত কথা বলে দিলেন। তার চাচা এসব কথা রাসূল সাঃ কে জানালেন। এ সময় সেখানে হযরত উমার রাঃ উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ রাসূল, আপনি আব্বাদ ইবনে বিশরকে নির্দেশ দিন। সে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে হত্যা করুক'। তখন রাসূল সাঃ বললেন, "এটা কি করে সম্ভব! লোকে বলবে যে, মুহাম্মাদ নিজের সঙ্গী সাথীদের হত্যা করছে। না, তা হতে পারে না। তবে তোমরা যাত্রার কথা ঘোষণা করে দাও"। এ কথা শোনার পর রাসূল সাঃ সম্পূর্ণরূপে কথা বলা বন্ধ করে দিলেন, লোকজনেরা যাত্রা শুরু করে দিল। এমন সময় হযরত উসায়দ ইবনে হুযায়র রাঃ নামক একজন মুজাহির রাসূল সাঃ-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন। তিনি তাকে সালাম জানিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, এমন অসময়ে যাত্রা শুরু করা হলো?" রাসূল সাঃ বললেন, "তোমাদের সাথী অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই যা বলেছে তা কি তুমি শুনেছ?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সে কি বলেছে? রাসূল সাঃ বললেন, "তার ধারণা হচ্ছে, সে যদি মদিনায় ফিরে আসে তাহলে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ নিকৃষ্ট ব্যক্তিবর্গকে মদিনা থেকে বের করে দেবে"। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আপনি যদি চান তাহলে তাকে মদিনা থেকে বের করে দেয়া হবে। আল্লাহর শপথ, সে নিকৃষ্ট এবং আপনি পরম সম্মানিত। হে আল্লাহর রাসূল, আপনি তার সাথে সহনশীলতা দেখান। কারণ আল্লাহই ভালো জানেন তিনি আপনাকে আমাদের মাঝে এমন এক সময় নিয়ে আসেন যখন তার গোত্রের লোকেরা তাকে মুকুট পরানোর জন্য মনি-মুক্তার মুকুট তৈরি করছিল। এই কারণে এখন সে মনে করছে, আপনি তার নিকট থেকে তার রাজত্ব কেড়ে নিয়েছেন'।এরপর সন্ধ্যা পর্যন্ত সারা দিন এবং সকাল পর্যন্ত সারারাত মুসলিম বাহিনী পথ চলতে থাকে। এমনকি পরবর্তী দিন যুহর পর্যন্ত ভ্রমণ অব্যাহত রাখা হয়। রোদের প্রখরতায় সাহাবীগণ প্রচন্ড কষ্ট পাচ্ছিলেন। এরপর এক স্থানে বিশ্রামের জন্য শিবির স্থাপন করা হয়। সাহাবিরা এতটাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে শরীর ভূমিতে রাখতে না রাখতেই সকলে ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ল। এই দীর্ঘ ভ্রমণের ব্যাপারে রাসূল সাঃ এর উদ্দেশ্য ছিল, লোকজন যেন আরামে বসে গল্প করার সুযোগ না পায়। এদিকে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই যখন জানতে পারল যে, যায়েদ বিন আরকান রাঃ তার সমস্ত কথা রাসূল সাঃ-এর কাছে বলে দিয়েছেন তখন সে রাসূল সাঃকে এসে বলল, 'আল্লাহর শপথ, জায়েদ আপনাকে যে সকল কথা বলেছে আমি তা কখনোই বলিনি। এমনকি মুখেও আনিনি'। এ সময় যেসকল আনসাররা সেখানে ছিলেন তারাও বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, এখনও তো জায়েদ নাবালক ছেলেই আছে এবং হয়তো তারই ভুল হয়েছে। আব্দুল্লাহ যা বলেছিল হয়তো সে ঠিক ঠিকভাবে তা স্মরণ রাখতে পারেনি'। এ কারণে রাসূল সাঃ- আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর কথা সত্য বলে মেনে নিলেন। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যায়দ ইবনে আরকাম রাঃ বললেন, এ কথা শুনে এতটা দুঃখিত হয়ে পড়েছিলাম যে ইতোপূর্বে আর কখনো এত দুঃখিত হইনি। সেই দুঃখে আমি বাড়িতে বসে থাকলাম। এরপর আল্লাহ তাআলা সুরা মুনাফিকুন নামে একটি সূরা অবতীর্ণ করে তাদের কথা প্রকাশ করে দিলেন।

সূরা মুনাফিকুন এর ১ থেকে ৮ নং আয়াত নাযিল হওয়ার পর আল্লাহর রাসূল যায়েদ রাঃ কে ডেকে পাঠালেন এবং এই আয়াতগুলো পাঠ করে শোনালেন। এরপর বললেন, "আল্লাহ তায়ালা তোমার কথার সত্যতা প্রমাণ করেছেন"।

ইফকের ঘটনাঃ

আয়েশা রা. বলেছেন যে, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরের ইচ্ছা করতেন তখন তিনি তাঁর স্ত্রীগণের নামের ব্যাপারে লটারি করতেন। এতে যার নাম আসত তাকেই তিনি সাথে করে সফরে বের হতেন। আয়েশা রা. বলেন, এমনি এক যুদ্ধে (মুরায়সীর যুদ্ধ) তিনি আমাদের মাঝে লটারি করেন। এতে আমার নাম বেরিয়ে আসে। তাই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সফরে বের হলাম। তখন আমাকে হাওদাজসহ সাওয়ারীতে উঠানো ও নামানো হত। এমনি করে আমরা চলতে থাকলাম। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এ যুদ্ধ থেকে অবসর হলেন, তখন তিনি (বাড়ির দিকে) ফিরলেন। ফেরার পথে আমরা মদীনার নিকটবর্তী হলে তিনি একদিন রাতের বেলা রওয়ানা হওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। রওয়ানা হওয়ার ঘোষণার পর আমি উঠলাম এবং (প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য) পায়ে হেটে সেনাছাউনী অতিক্রম করে (একটু সামনে) গেলাম। এরপর প্রয়োজন সেরে আমি আমার সাওয়ারীর কাছে ফিরে এসে বুকে হাত দিয়ে দেখলাম যে, (ইয়ামানের অন্তর্গত) যিফার শহরের পুতি দ্বারা তৈরী করা আমার গলার হারটি ছিড়ে কোথায় পড়ে গিয়েছে। তাই আমি ফিরে গিয়ে আমার হারটি তালাশ করতে আরম্ভ করলাম। হার তালাশ করতে করতে আমার আসতে বিলম্ব হয়ে যায়'।আয়েশা রা. বলেন, 'যে সমস্ত লোক উটের পিঠে আমাকে উঠিয়ে দিতেন তারা এসে আমার হাওদাজ উঠিয়ে তা আমার উটের পিঠে তুলে দিলেন, যার উপর আরোহণ করতাম। তারা মনে করেছিলেন যে, আমি এর মধ্যে আছি, কারণ খাদ্যভাবে মহিলাগণ তখন খুবই হালকা পাতলা হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের দেহ মাংসল ছিলনা। তাঁরা খুবই স্বল্প পরিমাণ খানা খেতে পেত। তাই তারা যখন হাওদাজ উঠিয়ে উপরে রাখেন তখন তখন তা হালকা হওয়ার বিষয়টিকে কোন প্রকার অস্বাভাবিক মনে করেননি। অধিকন্তু আমি ছিলাম একজন অল্প বয়স্কা কিশোরী। এরপর তারা উট হাঁকিয়ে নিয়ে চলে যায়। সৈন্যদল রওয়ানা হওয়ার পর আমি আমার হারটি খুঁজে পাই এবং নিজস্ব স্থানে ফিরে এসে দেখি তাদের (সৈন্যদল) কোন আহবায়ক এবং কোন উত্তরদাতা তথায় নেই। (নিরুপায় হয়ে) তখন আমি পূর্বে যেখানে ছিলাম সেখানে বসে রইলাম। ভাবছিলাম, তাঁরা আমাকে দেখতে না পেলে অবশ্যই আমার কাছে ফিরে আসবে। ঐ স্থানে বসে থাকা অবস্থায় ঘুম চেপে আসলে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। বানু সুলামী গোত্রের যাকওয়ান শাখার সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল রা. (যাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফেলে যাওয়া আসবাবপত্র কুড়িয়ে নেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন) সৈন্যদল চলে যাওয়ার পর সেখানে ছিলেন। তিনি প্রত্যুষে আমার অবস্থানস্থলের কাছে পৌঁছে একজন ঘুমন্ত

মানুষ দেখে আমার দিকে তাকানোর পর আমাকে চিনে ফেললেন। তিনি আমাকে দেখেছিলে পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে। তিনি আমাকে চিনতে পেরে 'ইন্না লিল্লাহহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন, রাসূল সাঃ এর স্ত্রী?”- একথা বললে আমি তা শুনতে পেয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠলাম এবং চাদর টেনে আমার চেহারা ঢেকে ফেললাম। আল্লাহর কসম, আমি কোন কথা বলিনি এবং তাঁর থেকে ইন্না লিল্লাহ........ পাঠ ছাড়া আর কোন কথাই শুনতে পাইনি। এরপর তিনি সাওয়ারী থেকে অবতরণ করলেন এবং সাওয়ারীকে বসিয়ে তার সামনের পা নিচু করে দিইয়ে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ালেন। আমি গিয়ে তাতে আরোহণ করলাম। পরে তিনি আমাকেসহ সাওয়ারীকে টেনে আগে আগে চলতে লাগলেন, পরিশেষে ঠিক দ্বিপ্রহরে প্রচণ্ড গরমের সময় আমরা গিয়ে সেনাদলের সাথে মিলিত হলাম। সে সময় তাঁরা একটি জায়গায় অবতরণ করছিলেন'।

আয়েশা রা. বলেন, এরপর আমরা মদীনায় আসলাম। মদীনায় আগমন করার পর এক মাস পর্যন্ত আমি অসুস্থ থাকলাম। এদিকে অপবাদ রটনাকরীদের কথা নিয়ে লোকদের মধ্যে আলোচনা ও চর্চা হতে লাগল। কিন্তু এসবের কিছুই আমি জানি না। তবে আমার সন্দেহ হচ্ছিল এবং তা আরো দৃঢ় হচ্ছিল আমার এ অসুখের সময়। কেননা এর পূর্বে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যেরূপ স্নেহ- ভালবাসা লাভ করতাম আমার এ অসুখের সময় তা আমি পাচ্ছিলাম না। তিনি আমার কাছে এসে সালাম করে কেবল 'তুমি কেমন আছ' জিজ্ঞাসা করে চলে যেতেন। তাঁর এ আচরণই আমার মনে চরম সন্দেহের উদ্রেক করে। তবে কিছুটা সুস্থ হয়ে বাইরে বের হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ জঘন্য অপবাদ সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতাম না। আয়েশা রা. বলেন, একদা আমি এবং উম্মে মিসতাহ একত্রে বের হলাম। আমরা আমাদের কাজ থেকে ফারিগ হওয়ার পর বাড়ি ফেরার পথে উম্মে মিসতাহ তার কাপড়ে জাড়িয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে বললেন, মিসতাহ ধ্বংস হোক। আমি তাকে বললাম, "আপনি খুব খারাপ কথা বলছেন। আপনি কি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিকে গালি দিচ্ছেন?" তিনি আমাকে বললেন, ওগো অবলা, সে তোমার সম্পর্কে কি বলে বেড়াচ্ছে তুমি তো তা শোননি। আয়েশা রা. বলেন, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে আমার সম্পর্কে কী বলছে? তখন তিনি অপবাদ রটনাকরীদের কথাবার্তা সম্পর্কে আমাকে জানালেন। আয়েশা রা. বর্ণনা করেন, এরপর আমার পুরানো রোগ আরো বেড়ে গেল। আমি বাড়ি ফেরার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে আসলেন এবং সালাম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কেমন আছ? আয়েশা রা. বলেন, আমি আমার পিতা-মাতার কাছে গিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক খবর জানতে চাচ্ছিলাম, তাই আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললাম, আপনি কি আমাকে আমার

পিতা-মাতার কাছে যাওয়ার জন্য অনুমতি দেবেন? আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমকে অনুমতি দিলেন। তখন (বাড়িতে গিয়ে) আমি আমার আম্মাকে বললাম, আম্মাজান, লোকজন কি আলোচনা করছে? তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম, সতীন

আছে এমন স্বামী সোহাগিনী সুন্দরী রমণীকে তাঁর সতীনরা বদনাম করবে না, এমন খুব কমই হয়ে থাকে।
আয়েশা রা. বলেন, আমি বিস্ময়ের সাথে বললাম, সুবহানাল্লাহ। লোকজন কি এমন গুজবই রটিয়েছে! আয়েশা রা. বর্ণনা করেন, রাতভর আমি কাঁদলাম। কাঁদতে কাঁদতে ভোর হয়ে গেল। এর মধ্যে আমার অশ্রুও বন্ধ হল না এবং আমি ঘুমাতেও পারলাম না। এরপর ভোরবেলাও আমি কাঁদছিলাম। তিনি আরো বলেন যে, এ সময ওহী নাযিল হতে বিলম্ব হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রীর (আমার) বিচ্ছেদের বিষয়টি সম্পর্কে পরামর্শ ও আলোচনা করার নিমিত্তে আলী ইবনে আবু তালিব এবং উসামা ইবনে যায়েদ রা.-কে ডেকে পাঠালেন। আয়েশা রা. বলেন, উসামা রা. রাসূলুল্লাহ সাঃ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীদের পবিত্রতা এবং তাদের প্রতি (নবীজীর) ভালবাসার কারণে বললেন, (হে আল্লাহর রাসূল) তাঁরা আপনার স্ত্রী, তাদের সম্পর্কে আমি ভাল ছাড়া আর কিছুই জানি না। আর আলী রা. বললেন, হে আল্লাহ রাসূল সাঃ, আল্লাহ তো আপনার জন্য সংকীর্ণতা রাখেননি। তাকে (আয়েশা) ব্যতীত আরো বহু মহিলা রয়েছে। তবে আপনি এ ব্যাপারে দাসী (বারীরা রা.) কে জিজ্ঞাসা করুন। সে আপনার কাছে সত্য কথাই বলবে। আয়েশা রা. বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারীরা রা.-কে ডেকে বললেন, হে বারীরা তুমি তাঁর মধ্যে কোন সন্দেহমূলক আচরণ দেখেছ কি? বারীরা রা. তাকে বললেন, সেই আল্লাহর শপথ যিনি আপনাকে সত্য বিধানসহ পাঠিয়েছেন আমি তার মধ্যে কখনো এমন কিছু দেখিনি যার দ্বারা তাকে দোষী বলা যায়। তবে তাঁর ব্যাপারে শুধু এতটুকু বলা যায় যে, তিনি হলেন অল্প বয়স্কা যুবতী, রুটি তৈরী করার জন্য আটা খামির করে রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। আর বকরী এসে অমনি তা খেয়ে ফেলে।
আয়েশা রা. বলেন, (এ কথা শুনে) সেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে সাথে উঠে গিয়ে মিম্বরে বসে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর ক্ষতি থেকে রক্ষার আহবান জানিয়ে বললেন, হে মুসলিম সম্প্রদায়, যে আমার স্ত্রীর ব্যাপারে অপবাদ ও বদনাম রটিয়ে আমাকে কষ্ট দিয়েছে তার এ অপবাদ থেকে আমাকে কে মুক্ত করবে? আল্লাহর কসম, আমি আমার স্ত্রী সম্পর্কে ভাল ছাড়া আর কিছুই জানিনা। আর তাঁরা (অপবাদ রটনাকারীরা) এমন এক ব্যক্তির (সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল) নাম উল্লেখ করছে যার সম্বন্ধেও আমি ভাল ছাড়া কিছু জানি না। সে তো আমর সাথেই আমার ঘরে যায়। আয়েশা রা. বলেন, (এ কথা শুনে) বনী আবদুল আশহাল গোত্রের সাদ ইবনে মুআয রা. উঠে বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে এ অপবাদ থেকে মুক্তি দেব। সে যদি আউস গোত্রের লোক হয় তা হলে তার শিরচ্ছেদ করব। আর যদি সে আমাদের ভাই খাযরাজের লোক হয় তাহলে তার ব্যাপারে আপনি যা বলবেন তাই পালন করব"। আয়েশা রা. বলেন, এ সময় হাসসান ইবনে সাবিত রা.-এর মায়ের চাচাতো ভাই খাযরাজ গোত্রের সর্দার সা'দ ইবনে উবাদা রা. দাঁড়িয়ে এ কথার প্রতিবাদ করলেন। আয়েশা রা. বলেন, এ ঘটনার পূর্বে

তিনি একজন সৎ ও নেককার লোক ছিলেন। কিন্তু (এ সময়) গোত্রীয় অহমিকায় উত্তেজিত হয়ে তিনি সাদ ইবনে মুআয রা.-কে বললেন, তুমি মিথ্যা কথা বলছ। আল্লাহর কসম, তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না এবং তাকে হত্যা করার ক্ষমতাও তোমার নেই। যদি সে তোমার গোত্রের লোক হত তাহলে তুমি তার হত্যা হওয়া কখনো পছন্দ করতে না। তখন সাদ ইবনে মুআয রা.-এর চাচাতো ভাই উসাইদ ইবনে হুযাইর রা. সাদ ইবনে উবাদা রা.-কে বললেন, বরং তুমি মিথ্যা কথা বললে। আল্লাহর কসম, আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করব। তুমি হলে মুনাফিক। তাই মুনাফিকদের পক্ষ অবলম্বন করে কথাবার্তা বলছ।আয়েশা রা. বলেন, এ সময় আউস ও খাযরাজ উভয় গোত্র খুব উত্তেজিত হয়ে উঠে। এমনকি তারা যুদ্ধের সংকল্প পর্যন্ত করে বসে। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের থামিয়ে শান্ত করলেন এবং নিজেও চুপ হয়ে গেলেন। আয়েশা রা. বলেন, আমি সেদিন সারাক্ষণ কেঁদে কাটালাম। অশ্রুঝরা আমার বন্ধ হয়নি এবং একটু ঘুমও আমার আসেনি। তিনি বলেন, আমি ক্রন্দনরত ছিলাম আর আমার পিতা-মাতা আমার পার্শ্বে বসা ছিলেন। এমনি করে একদিন দুই রাত কেঁদে কেঁদে কাটিয়ে দিই। এর মাঝে আমার কোন ঘুম আসেনি। বরং অবারিত ধারায় আমার চোখ থেকে অশ্রুপাত হতে থাকে। মনে হচ্ছিল যেন, কান্নার ফলে আমার কলিজা ফেটে যাবে। আমি ক্রন্দনরত ছিলাম আর আমার আব্বা-আম্মা আমার পাশে বসা ছিলেন। এমতাবস্থায় একজন আনসারী মহিলা আমার কাছে আসার অনুমতি চাইলে আমি তাকে আসার অনুমতি দিলাম। সে এসে বসল এবং আমার সাথে কাঁদতে আরম্ভ করল। তিনি বলেন, আমরা ক্রন্দনরত ছিলাম ঠিক এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে এসে সালাম করলেন এবং আমাদের পাশে বসে গেলেন। আয়েশা রা. বলেন, অপবাদ রটানোর পর আমার

কাছে এসে এভাবে তিনি আর কখনো বসেননি। এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ একমাস কাল অপেক্ষা করার পরও আমার বিষয়ে তাঁর নিকট কোন ওহী আসেনি।

আয়েশা রা. বলেন, বসার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালিমা শাহাদাত পড়লেন। এরপর বললেন, যা হোক, আয়েশা তোমার সম্বন্ধে আমার কাছে অনেক কথাই পৌঁছেছে, যদি তুমি এর থেকে মুক্ত হও তাহলে শীঘ্রই আল্লাহ তোমাকে এ অপবাদ থেকে মুক্ত করে দেবেন। আর যদি তুমি কোন গুনাহ করে থাক তাহলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাওবা কর। কেননা বান্দা গুনাহ স্বীকার করে তাওবা করলে আল্লাহ তায়ালা তাওবা কবুল করেন। আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কথা বলে শেষ করলে আমার অশ্রুপাত বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি এক ফোটা অশ্রুও আমি আর অনুভব করলাম না। তখন আমি আমার আব্বাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলছেন আমার পক্ষ হতে আপনি তার জবাব দিন। আমার আব্বা বললেন, আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ সাঃ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কি জবাব দিব আমি তা জানিনা। তখন আমি আমার আম্মাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন, আপনি তার জবাব দিন। আম্মা বললেন, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ সাঃ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কি জবাব দিব আমি তা জানি না। তখন আমি ছিলাম অল্প বয়স্কা কিশোরী। কুরআনও বেশি পড়তে পারতাম না। তথাপিও এ অবস্থা দেখে নিজেই বললাম, আমি জানি আপনারা এ অপবাদের ঘটনা শুনেছেন, আপনারা তা বিশ্বাস করেছেন এবং বিষয়টি আপনাদের মনে সুদৃঢ় হয়ে আছে। এখন যদি আমি বলি যে, এর থেকে আমি পবিত্র এবং আমি নিষ্কলুষ তাহলে আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন না। আর যদি আমি এ অপরাধের কথা স্বীকার করে নেই যা সম্পর্কে আল্লাহ জানেন যে, আমি এর থেকে পবিত্র তাহলে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন। আল্লাহর কসম, আমি ও আপনারা যে অবস্থায় শিকার হয়েছি এর জন্য (নবী) ইউসুফ আ.-এর পিতার কথা উদাহরণ ব্যতীত আমি কোন উদাহরণ খুঁজে পাচ্ছি না। তিনি বলেছিলেন: "সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে আল্লাহই একমাত্র আমার আশ্রয়স্থল"। এরপর আমি মুখ ফিরিয়ে আমার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। আল্লাহ তায়ালা জানেন যে, সে মুহূর্তেও আমি পবিত্র। অবশ্যই আল্লাহ আমার পবিত্রতা প্রকাশ করে দেবেন। তবে আল্লাহর কসম, আমি কখনো ধারণা করিনি যে, আমার ব্যাপারে আল্লাহর ওহী নাযিল করবেন যা পঠিত হবে। আমার ব্যাপারে আল্লাহ কোন কথা বলবেন আমি নিজেকে এতখানি যোগ্য মনে করিনি বরং আমি নিজেকে এর চেয়ে অধিক অযোগ্য বলে মনে করতাম। তবে আমি আশা করতাম যে, হয়তো রাসূলুল্লাহ সাঃ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এমন স্বপ্ন দেখানো হবে যার দ্বারা আল্লাহ আমার পবিত্রতা প্রকাশ করে দেবেন। আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনো তাঁর বসার জায়গা ছাড়েননি এবং ঘরের লোকদের থেকেও কেউ ঘর থেকে বাইরে যাননি। এমতাবস্থায় তাঁর উপর ওহী নাযিল হতে শুরু হল। ওহী নাযিল হওয়ার সময় তাঁর যে বিশেষ কষ্ট হত তখনও সে অবস্থা তাঁর হল। এমনকি প্রচণ্ড শীতের দিনেও তাঁর দেহ থেকে মোতির দানার মত বিন্দু বিন্দু ঘাম গড়িয়ে পড়ত ঐ বাণীর গুরুভাবের কারণে, যা তাঁর প্রতি নাযিল করা হয়েছে। আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাঃ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ অবস্থা দূরীভূত হলে তিনি হাসিমুখে প্রথমে যে কথাটি বললেন, তা হল, হে আয়েশা! আল্লাহ তোমার পবিত্রতা জাহির করে দিয়েছেন। আয়েশা রা. বলেন, এ কথা শুনে আমার আম্মা আমাকে বললেন, তুমি উঠে রাসূলুল্লাহ সাঃ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর। আমি বললাম, আল্লাহর কসম আমি এখন তাঁর দিকে উঠে যাব না। মহান আল্লাহ ব্যতীত আমি কারো প্রশংসা করব না। আয়েশা রা বললেন, আল্লাহ (আমার পবিত্রতা ঘোষণা করে) যে দশটি আয়াত নাযিল করেছেন, তা হল এই: "

যারা এ অপবাদ রটনা করেছে (তারা তো তোমাদেরই একটি দল; এ ঘটনাকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না; বরং এও তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে তাদের কৃত পাপকর্মের ফল এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে তার জন্য আছ কঠিন শাস্তি। এ কথা শোনার পর মুমিন পুরুষ এবং নারীগণ কেন নিজেদের বিষয়ে সৎ ধারণা করেনি এবং বলেনি, এটা তো সুস্পষ্ট অপবাদ। তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, সেহেতু তারা আল্লাহর বিধানে মিথ্যাবাদী। দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমরা যাতে লিপ্ত ছিলে তার জন্য কঠিন শাস্তি তোমাদেরকে স্পর্শ করত। যখন তোমরা মুখে মুখে এ মিথ্যা ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিলনা এবং একে তোমরা তুচ্ছ ব্যাপার বলে ভাবছিলে, অথচ আল্লাহর কাছে তা ছিল খুবই গুরুতর ব্যাপার। আল্লাহ পবিত্র, মহান! এ তো এক গুরুতর অপনাদ। আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক তাহলে কখনো অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করবে না, আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বিবৃত করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। যারা মুনিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য আছে দুনিয়া ও আখিরাতের মর্মন্তুদ শাস্তি। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউই অব্যাহতি পেতে না। আল্লাহ দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু। (সূরা নূর, ২৪: ১১-২০)

আত্মীয়তা এবং দারিদ্রের কারণে আবু বকর সিদ্দীক রা. মিসতাহ ইবনে উসাসাকে আর্থিক ও বৈষয়িক সাহায্য করতেন। কিন্তু আয়েশা রা. সম্পর্কে তিনি যে অপবাদ রটিয়েছিলেন এ কারণে আবু বকর সিদ্দীক রা কসম করে বললেন, আমি আর কখনো মিসতাহকে আর্থিক কোন সাহায্য করব না। তখন আল্লাহ তায়ালা নাযিল করলেন-

وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

অর্থঃ তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর রাস্তায় যারা গৃহত্যাগ করেছে তাদেরকে কিছুই দিবে না। তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে এবং তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। শোন! তোমরা কি পছন্দ কর না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা নূর, ২৪: ২২)

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর আবু বকর সিদ্দীক রা. বলে উঠলেন হ্যাঁ, আল্লাহর কসম, অবশ্যই আমি পছন্দ করি যে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিন। এরপর তিনি মিসতাহ রা.-এর জন্য যে অর্থ খরচ করতেন তা পুনরায় দিতে শুরু করলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম, আমি তাকে এ অর্থ দেওয়া আর কখনো বন্ধ করব না। আয়েশা রা. বললেন, আমার এ বিষয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়নাব বিনতে জাহাশ রা.-কেও জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

তিনি যায়নাব রা.-কে বলেছিলেন, তুমি আয়েশা রা. সম্পর্কে কী জান অথবা বলেছিলেন তুমি কী দেখেছ? তখন তিনি বলেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার চোখ ও কানকে সংরক্ষণ করেছি। আল্লাহর কসম! আমি তাঁর সম্পর্কে ভাল ছাড়া আর কিছুই জানি না। আয়েশ রা. বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীগণের মধ্যে তিনি আমার সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। আল্লাহ তাকে আল্লাহ-ভীতির ফলে রক্ষা করেছেন। আয়েশা রা. বলেন, অথচ তাঁর বোন হামনা রা. তাঁর পক্ষ অবলম্বন করে অপবাদ রটনাকারীদের মত অপবাদ রটনা করে বেড়াচ্ছিলেন। বর্ণনাকারী ইবনে শিহাব রহ. বলেন, ঐ সমস্ত লোকের ঘটনা সম্পর্কে আমার কাছে যা পৌঁছেছে তা হল এই: উরওয়ার রা. বলেন, আয়েশা রা. বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ কসম, যে ব্যক্তি সম্পর্কে অপবাদ দেওয়া হয়েছিল, তিনি এসব কথা শুনে বলতেন, আল্লাহ মহান। ঐ সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, আমি কোন স্ত্রীলোকের কাপড় খুলেও কোনদিন দেখিনি। আয়েশা রা. বলেন, পরে তিনি আল্লাহর পথে শাহাদত লাভ করেছিলেন। (সহীহ বুখারী, আল মাগাযী অধ্যায়, হাদীস নং ৩৮৪৬)

সূরা নূর এর আলোকে ইফকের ঘটনা থেকে প্রাপ্ত শার'ঈ নির্দেশনাঃ

১। মুমিনদের পারস্পরিক সহমর্মিতা ও পরস্পরের প্রতি উত্তম ধারণা করার নির্দেশনা দিয়েছেন আল্লাহ। (৪ নং আয়াত)

২। কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা আয়েশা রাঃ এর চারিত্রিক পবিত্রতার নিশ্চয়তা দিয়েছেন। (১১ নং আয়াত)

৩। সংবাদ প্রচার এর পূর্বেই যাচাই-বাছাইয়ের নির্দেশনা আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। (১২ ও ১৩ নং আয়াত)

৪। ভিত্তিহীন অপপ্রচার থেকে নিবৃত্ত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। (১৭ নং আয়াত)

৫। মমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রচার ও প্রসারের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি জানিয়ে দেওয়া হয়। (১৯ নং আয়াত)

৬। শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। (২১ নং আয়াত)

৭। নিকট আত্মীয় স্বজনদের মন্দ আচরণ সত্বেও তাদের জন্য সাদাকা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়। (২২ নং আয়াত)

৮। সত্য ও ন্যায়ের পথে থাকা মুমিন বান্দাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাদের মর্যাদা রক্ষায় এবং তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনাকারীদের দুনিয়া ও পরকালে লাঞ্চনার হুমকি দেওয়া হয়। (২৩-২৫ নং আয়াত)

হুদাইবিয়ার সন্ধি

ষষ্ঠ হিজরীরজ্বিলকদ মাসে (মার্চের ৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে) মদিনা শহরবাসী এবং কুরাইশ গোত্রের মধ্যে সম্পাদিত একটি ঐতিহাসিক সন্ধিচুক্তি। এই সন্ধিচুক্তিটি একটি দশ বছর শান্তি প্রতিষ্ঠিত করে এবং মুহাম্মাদকে পরের বছর হজ্জের সময় মক্কার দিকে আসতে অনুমোদন করে।

হিজরি ৬ষ্ঠ সনের জ্বিলকদ মাসে হুদাইবিয়ার অভিযান সংঘটিত হয়। এই সনে মুহাম্মাদ একদা স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি তার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে মদীনা থেকে মক্কায় গমন করেন এবং সেখানে উমরাহ পালন করলেন। নবীর স্বপ্ন নিছক একটি স্বপ্ন নয়, বরং সেটিও একধরনের ওহী। সুতরাং এরপর তিনি চৌদ্দশত সাহাবীসহ উমরাহ পালন করার জন্য মক্কা রওনা হলেন। কিন্তু জেদ্দা থেকে মক্কাগামী পথের পাশে হুদাইবিয়া নামক স্থানে মক্কার গুপ্তচরদের দ্বারা তিনি বাধাপ্রাপ্ত হন। ফলে, মক্কায় পৌঁছে উমরাহ পালন করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়।[৪]পথিমধ্যে হুদাইবিয়া নামক স্থানে উনি তীব্র বাধার সম্মুখীন হন। এই স্থানের সানিয়াতুল মিরার নামক স্থানে উনার উটনী বসে যায়। অপরদিকে কুরাইশদের পক্ষ থেকে সামরিক অভিযানের হুমকি আসতে থাকে। শেষ পর্যন্ত কুরাইশদের পক্ষ থেকে সুহায়ল ইবনে আমরকে দূত হিসাবে পাঠানো হয়। সেখানে নিম্নবর্ণিত লিখিত সমঝোতাগুলোই হুদাইবিয়ার সন্ধি হিসাবে পরিচিত।[৫] মুহাম্মাদ উমরাহের জন্য নিয়ে আসা পশুগুলো সেখানে কোরবানী করে মদীনায় ফিরে যান। অতঃপর পবিত্র কোরআনে সুরা ফাতেহতে ইহাকে প্রকাশ্য বিজয় হিসাবে অ্যাখ্যায়িত করা হয়।

খায়বারের যুদ্ধ

৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন আরবের মদিনা নগরী থেকে ১৫০ কিলোমিটার (৯৩ মা) দুরে অবস্থিত খায়বার নামক মরুভূমিতে বসবাসরত ইহুদিগণের সাথে মুসলিমগণের সঙ্ঘটিত একটি যুদ্ধ। মুসলিমদের ইতিহাস অনুসারে, মুসলিমগণ সেখানে দুর্গে আশ্রয় নেয়া ইহুদিদেরকে আক্রমণ করেছিল।সপ্তম হিজরিতে খায়বারের ইহুদিরা পরিকল্পনা করে মদীনা আক্রমণ করার কারণে খায়বার যুদ্ধ হয়। খায়বার মদীনা থেকে ৮০ মাইল দূরের একটি বড় শহর। এখানে ইহুদীদের অনেকগুলো দুর্গ ও ক্ষেত খামার ছিল। মূলত খায়বার ছিল ইহুদীদের একটি উপনিবেশ। খায়বারের ইহুদীরা বনু কোরাইজা গোত্রের ইহুদীদেরকে বিশ্বাসঘাতকায় উদ্দীপিত করেছিল। মুহাম্মাদ সা. কে হত্যা করার পরিকল্পনা এই খায়বার থেকে করা হতো। খায়বারের ইহুদীরা গাতাফান গোত্র ও বেদুঈনদের সাথে মিলিত হয়ে মদীনা আক্রমণ করার ব্যাপারে পরিকল্পনা করছিল। খায়বার যুদ্ধে পরাজিত ইহুদীদেরকে মুহাম্মাদ সা. কোন নির্বাসন দেন নি। প্রতি বছর তাদের উৎপাদিত ফল ফসলের অর্ধেক ইহুদীরা মুসলমানদের কে দিবে এই শর্তে খায়বারের ইহুদীরা খায়বারে থাকার অনুমতি পায়। কিন্তু এই খায়বার যুদ্ধের পর পর এক ইহুদী মহিলা মুহাম্মাদ সা. কে আমন্ত্রণ করে ছাগলের মাংসের ভিতরে বিষ মিশিয়ে মুহাম্মাদ সা. কে হত্যা

করতে চেয়েছিল। এই ঘটনার পরেও মুহাম্মাদ সা. খায়বারের সকল ইহুদীদের কে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।আক্রমণের কারণ প্রসঙ্গে, স্কটিশ ঐতিহাসিক উইলিয়াম মন্টগোমারি ওয়াট খায়বার যুদ্ধে বনু নাদির গোত্রের উপস্থিতি উদ্ধৃত করেন, যারা মদিনার ইসলামী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবেশী আরব গোত্রগুলোর মধ্যে শত্রুভাবাপন্ন মানসিকতা জাগিয়ে তুলছিল। ইতালীয় প্রাচ্যবিদ লরা ভেক্সিয়া ভ্যাগ্লিয়েরিওয়াটের তত্ত্বের সাথে সহমত পোষণ করে দাবী করেন যে, যুদ্ধের পেছনে আরও কারণ থাকতে পারে, যেগুলো হল, ইহুদিদের উক্ত দুরভিসন্ধির প্রতিক্রিয়া মুহাম্মাদের সাহাবীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা এবং ভবিষ্যতের যুদ্ধ অভিযানসমূহের রসদ হিসেবে যুদ্ধলব্ধ মালামালসমূহ লুণ্ঠনের উপযোগিতা।

পরিশেষে খায়বারের ইহুদিগণকে অবরোধ করা হয় এবং উক্ত উপত্যকায় তাদেরকে থাকার অনুমতি দেয়া হয় এই শর্তে যে, তারা মুসলিমগণকে তাদের উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক বাৎসরিকভাবে প্রদান করবে। খলিফা ওমররের সময়ে ওমর কর্তৃক বহিষ্কৃত হওয়ার আগ পর্যন্ত ওখানেই তাদের বসবাস অব্যাহত ছিল। এই বিজয়ের ফলাফলস্বরূপ বিজিত ইহুদিদের উপর ইসলামের বিধান অনুযায়ী জিজিয়া কর আরোপ করা হয় এবং তাদের অধিভুক্ত জমিসমূহ মুসলিমদের প্রশাসনিক দখলের অন্তর্ভুক্ত হয়।বিনিময়ে, ইহুদিগণ তাদের ধর্মপালনের অনুমতি পায়, বৃহৎ পরিসরে নিজ সম্প্রদায়ের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করে, মুসলিমদের কাছ থেকে বহিঃশক্তির আক্রমণ থেকে প্রতিরক্ষা লাভের প্রতিশ্রুতি লাভ করে এবং তাদেরকে সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণ এবং যাকাত প্রদানের দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দেয়া হয়, যেগুলো মুসলিম নাগরিকদের জন্য বাধ্যতামূলক।

মুতার যুদ্ধ

ওমরাতুল ক্বাযা থেকে ফিরে এসে যিলহাজ্জ মাসের শেষ দিনগুলিসহ পরবর্তী চার মাস রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় অবস্থান করেন। অতঃপর মদীনার নিরাপত্তা বিধান ও শাম অঞ্চলে মুসলমানদের উপর খ্রিষ্টান শাসকদের অব্যাহত অত্যাচার দমনের উদ্দেশ্যে জুমাদাল ঊলা মাসে এই অভিযান প্রেরণ করেন। এটিই ছিল খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম যুদ্ধাভিযান (সীরাহ ছহীহাহ ২/৪৭০)। এ যুদ্ধের কারণ হিসাবে ওয়াক্বেদী যা বর্ণনা করেছেন,[1] তা বিদ্বানগণের নিকট গ্রহণযোগ্য না হ’লেও এটা নিশ্চিত যে,

إن الله إذا أراد شيئا هيأ له الأسباب

‘আল্লাহ যখন কোন কিছু করার ইচ্ছা করেন, তখন তার জন্য কারণসমূহ সৃষ্টি করে দেন’। অতএব বাহ্যিক ও প্রত্যক্ষ কারণ নিশ্চয়ই কিছু ছিল। যার জন্য যুদ্ধ যাত্রা অপরিহার্য হয়েছিল। তবে এটা নিশ্চিত ধারণা করা যায় যে, মদীনাকে ইহূদীমুক্ত করার পর এবং হোদায়বিয়াতে প্রধান

প্রতিপক্ষ কুরায়েশদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি হওয়ার পর তৃতীয় প্রতিপক্ষ খ্রিষ্টান রোমক শক্তিকে পদানত করা ও ইসলামী বিজয়ের পথ সুগম করা মুতা যুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ হ'তে পারে। এর মাধ্যমে আল্লাহ চেয়েছিলেন শাম ও পারস্যে রাজত্বকারী রোমক ও পারসিক দুই পরাশক্তির বিরুদ্ধে ইসলামের বিজয়াভিযান শুরু করতে। যা ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে সুসম্পন্ন হয়। যায়েদ বিন হারেছাহর নেতৃত্বে ৩০০০ সৈন্যের অত্র বাহিনী প্রেরিত হয়। পক্ষান্তরে বিরোধী বুছরার রোমক গবর্ণর শুরাহবীল বিন 'আমর আল-গাসসানীর ছিল প্রায় ২ লাখ খ্রিষ্টান সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী (ইবনু হিশাম ২/৩৭৫)। বায়তুল মুক্বাদ্দাসের নিকটবর্তী মু'তা (مُؤْتَة) নামক স্থানে সংঘটিত এই যুদ্ধে সেনাপতি যায়েদ বিন হারেছাহ, অতঃপর জা'ফর বিন আবু ত্বালিব, অতঃপর আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা পরপর তিনজন সেনাপতি শহীদ হ'লে সকলের পরামর্শে খালেদ বিন অলীদ সেনাপতি হন। অতঃপর তাঁর হাতে বিজয় অর্জিত হয়। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ।-

এই বাহিনীর সেনাপতি হিসাবে যায়েদ বিন হারেছাহকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এসময় রাসূল (ছাঃ) বলেন, যদি যায়েদ নিহত হয়, তবে তার স্থলে জা'ফর বিন আবু ত্বালিব সেনাপতি হবে। যদি সে নিহত হয়, তাহ'লে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা সেনাপতি হবে (বুখারী হা/৪২৬১)। বস্তুতঃ এই ধরনের সাবধানতা ছিল এটাই প্রথম (সীরাহ ছহীহাহ ২/৪৬৭)।

মুসলিম বাহিনী শামের মা'আন (مَعَان) অঞ্চলে অবতরণ করে। অতঃপর তারা হঠাৎ জানতে পারেন যে, রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস এসময় এক লাখ সৈন্য নিয়ে শামের বালক্বা অঞ্চলের মাআবে (مَآب) অবস্থান করছেন। সেখানে তার সাথে যোগ হয়েছে লাখাম, জুযাম, ক্বাইন (الْقَيْن), বাহরা ও বালী প্রভৃতি আরব-খ্রিষ্টান গোত্র সমূহের আরো এক লাখ যোদ্ধা।

অভাবিতভাবে বিরোধী পক্ষের বিশাল সৈন্য সমাবেশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে তাঁরা দুশ্চিন্তায় পড়েন। অতঃপর পরামর্শ সভায় বসেন। এটি ছিল বদর যুদ্ধের মত। যেখানে পূর্ব থেকে কেউ জানতেন না যে, তারা এত বড় একটি সিদ্ধান্তকারী যুদ্ধের সম্মুখীন হবেন। সভায় কেউ মত প্রকাশ করেন যে, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে শত্রু সংখ্যার খবর দিয়ে পত্র লিখি। অতঃপর তিনি আমাদের জন্য সাহায্যকারী বাহিনী পাঠাবেন অথবা আমাদেরকে যা নির্দেশ দিবেন, তাই করব। তখন আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা ওজস্বিনী ভাষায় সকলের উদ্দেশ্যে বলেন,

يَا قَوْمِ، وَاللهِ إِنَّ الَّتِي تَكْرَهُونَ لَلَّتِي خَرَجْتُمْ تَطْلُبُونَ، الشَّهَادَةُ- وَمَا نُقَاتِلُ النَّاسَ بِعَدَدِ وَلاَ قُوَّةٍ وَلاَ كَثْرَةٍ، مَا نُقَاتِلُهُمْ إِلاَّ بِهَذَا الدِّينِ الَّذِي أَكْرَمَنَا اللهُ بِهِ، فَانْطَلِقُوا فَإِنَّمَا هِيَ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ إِمَّا ظُهُورٌ وَإِمَّا شَهَادَةٌ. قَالَ: فَقَالَ النَّاسُ: قَدْ وَاللهِ صَدَقَ ابْنُ رَوَاحَةَ-

'হে আমার কওম! আল্লাহর কসম! তোমরা যেটাকে অপছন্দ কর, নিশ্চয় তোমরা সেটা অন্বেষণের জন্যই বের হয়েছ। আর তা হ'ল 'শাহাদাত'। আমরা মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করিনা সংখ্যা দ্বারা, শক্তি দ্বারা বা আধিক্য দ্বারা। আর আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করিনা কেবলমাত্র এই দ্বীনের স্বার্থ ব্যতীত। যার মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। অতএব সামনে বাড়ুন। নিশ্চয় এর মধ্যে

কেবলমাত্র দু’টি কল্যাণের একটি রয়েছে। হয় বিজয় নয় শাহাদাত। অতঃপর সকলে বললেন, قَدْ وَاللهِ صَدَقَ ابْنُ رَوَاحَةَ অবশ্যই, আল্লাহর কসম! ইবনু রাওয়াহা সত্য বলেছেন’। এরপর তিনি সকলের উদ্দেশ্যে ৮ লাইনের একটি স্বতঃস্ফূর্ত কবিতা পাঠ করেন’।অতঃপর সকলে নতুন উদ্দীপনায় স্রেফ আল্লাহর উপর ভরসা করে যুদ্ধের প্রস্ত্ততি শুরু করেন এবং দু’দিন পর যুদ্ধে রওয়ানা হন ও মুতা (مُؤْتَةَ) নামক স্থানে খ্রিষ্টান বাহিনীর মুখোমুখি হন। অতঃপর তুমুল যুদ্ধের এক পর্যায়ে সেনাপতি যায়েদ বিন হারেছাহ বর্শার আঘাতে শহীদ হন। অতঃপর জা‘ফর বিন আবু ত্বালিব যুদ্ধের ঝান্ডা তুলে নেন। এসময় তাঁর ঘোড়া শাক্বরা (شَقْرَاء) নিহত হয়। অতঃপর মাটিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধাবস্থায় তাঁর ডান হাত কর্তিত হয়। তখন তিনি বাম হাতে ঝান্ডা আঁকড়ে ধরেন। এরপর বাম হাত কর্তিত হয়। তখন বগলে ঝান্ডা চেপে ধরেন। অতঃপর তিনি শহীদ হন। তাঁর পরে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা পতাকা তুলে ধরেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনিও শহীদ হয়ে যান।তখন সকলের পরামর্শক্রমে খালেদ বিন অলীদ সেনাপতি হন।অতঃপর তাঁর হাতেই বিজয় অর্জিত হয়। মুসলিম বাহিনীর সীসাঢালা ঐক্য, অপূর্ব বীরত্ব, অভূতপূর্ব শৌর্য-বীর্য, নিখাদ শাহাদাতপ্রিয়তা, খালেদের অতুলনীয় যুদ্ধ নৈপুণ্য এবং সর্বোপরি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে অত্যন্ত অল্প ক্ষতির বিনিময়ে বিশাল বিজয় সাধিত হয়। ফালিল্লাহিল হাম্দ।

এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর মাত্র ১২ জন শহীদ হন’ (ইবনু হিশাম ২/৩৮৮-৮৯)। রোমক বাহিনীর হতাহতের সঠিক সংখ্যা জানা না গেলেও একা খালেদ বিন অলীদের যেখানে নয় খানা তরবারি ভেঙ্গেছিল’ (বুখারী হা/৪২৬৫), তাতে অনুমান করা চলে কত সৈন্য তাদের ক্ষয় হয়েছিল। বলা বাহুল্য, এটাই ছিল ‘খন্দক’ যুদ্ধের পর সবচেয়ে বড় যুদ্ধ।

মু‘জিযা

এ যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ) থেকে মু‘জেযা প্রকাশিত হয়। যেমন মদীনায় খবর পৌছার পূর্বেই তিনি সকলকে সেনাপতিদের পরপর শাহাদাতের খবর দেন এবং অশ্রুসিক্ত নয়নে বলেন, حَتَّى أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِم ‘অবশেষে ঝান্ডা হাতে নিয়েছে ‘আল্লাহর তরবারি সমূহের অন্যতম তরবারি’। অতঃপর আল্লাহ তাদের হাতে বিজয় দান করেছেন’ (বুখারী হা/৪২৬২)

মক্কা বিজয়

৮ম হিজরীর ৭ই রামাযান মোতাবেক ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর শুক্রবার ১০,০০০ ছাহাবী নিয়ে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) মদীনা হ’তে রওয়ানা হন এবং ১৭ই রামাযান মোতাবেক ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী সোমবার এক প্রকার বিনা যুদ্ধে মক্কা বিজয় সম্পন্ন হয়।মুসলিম পক্ষে দলছুট ২ জন শহীদ ও কাফের পক্ষে অতি উৎসাহী হয়ে অগ্রবর্তী ১২ জন নিহত হয়। এ সময়

মদীনার দায়িত্বে ছিলেন আবু রুহুম কুলছূম(أبو رُهْمٍ كُلْثومُ بنُ حُصَيْنِ) বিন হোছায়েন আল-গেফারী।এটি ছিল একটি সিদ্ধান্তকারী যুদ্ধ। এই যুদ্ধের পর রাসূল (ছাঃ)-এর সত্যতার ব্যাপারে সমগ্র আরব বিশ্বে সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর হয়ে যায়। কেননা ইতিপূর্বে কা'বাগৃহের উপর কর্তৃত্বের কারণে মানুষ কুরায়েশ নেতাদের প্রতি একটা অন্ধ আবেগ ও আনুগত্য পোষণ করত। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ।-

জন্মভূমি মক্কা হ'তে হিজরত করার ৭ বছর ৩ মাস ২৭ দিন পর বিজয়ীর বেশে পুনরায় মক্কায় ফিরে এলেন মক্কার শ্রেষ্ঠ সন্তান বিশ্ব মানবতার মুক্তিদূত, নবীকুল শিরোমণি শেষনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। বিনা যুদ্ধেই মক্কার নেতারা তাঁর নিকটে আত্মসমর্পণ করলেন। এতদিন যারা ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও মুসলমানদের যাবতীয় দুঃখ-কষ্টের মূল। বিজয়ী রাসূল (ছাঃ) তাদের কারু প্রতি কোনরূপ প্রতিশোধ নিলেন না। সবাইকে উদারতা ও ক্ষমার চাদরে ঢেকে দিয়ে বললেন, 'আজ তোমাদের উপরে কোনরূপ অভিযোগ নেই, তোমরা মুক্ত'। কিন্তু কি ছিল এর কারণ? কিভাবে ঘটলো হঠাৎ করে এ ঐতিহাসিক বিজয়? দু'বছর আগেও যে মুসলিম বাহিনীতে তিন হাযার লোক সংগ্রহ করাও দুঃসাধ্য ছিল, তারা কোথা থেকে কিভাবে দশ হাযার লোক নিয়ে ঝড়ের বেগে হঠাৎ ধূমকেতুর মত আবির্ভূত হ'ল মক্কার উপরে? অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল মক্কার নেতারা ফ্যালফ্যাল করে। টুঁ শব্দটি করার সাহস কারু হ'ল না? নিমেষে বন্ধ হয়ে গেল মক্কা-মদীনার সংঘাত। পৌত্তলিক মক্কা দু'দিনের মধ্যেই হয়ে গেল তাওহীদবাদী মুসলমান। কা'বাগৃহ হ'ল মূর্তিশূন্য। 'উয্যার বদলে শুরু হ'ল আল্লাহর জয়গান। শিরকী সমাজ পরিবর্তিত হ'ল ইসলামী সমাজে। সমস্ত আরব উপদ্বীপে বয়ে চলল শান্তির সুবাতাস। কি সে কারণ? কিভাবে সম্ভব হ'ল এই অসম্ভব কান্ড? এক্ষণে আমরা সে বিষয়ে আলোকপাত করব।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মক্কায় প্রবেশ

ক্বাছওয়া উটনীর পিঠে সওয়ার হয়ে আনছার ও মুহাজির পরিবেষ্টিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কায় প্রবেশ করেন। এদিন তিনি আল্লাহর প্রতি বিনয়ী ও তাঁর নে‘মতের শুকরিয়া আদায়কারী হিসাবে মক্কায় প্রবেশ করেন। বিজয়ী সেনাপতির ন্যায় অহংকারীভাবে নয়। এ সময় তিনি সওয়ারীর উপরে বসে সূরা ফাৎহ বা তার কিছু অংশ ধীর কণ্ঠে বারবার পাঠ করছিলেন’
(বুখারী হা/৪২৮১, ৫০৪৭)।

যুদ্ধের প্রস্তুতি থাকার কারণে রাসূল (ছাঃ) এ দিন মুহরিম ছিলেন না। এ সময় তাঁর মাথায় লৌহ শিরস্ত্রাণের উপর কালো পাগড়ী ছিল’।অতঃপর তিনি মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করেন এবং হাতের মাথা বাঁকানো লাঠি দ্বারা হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করেন। অতঃপর বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করেন।এ সময় কা‘বাগৃহের ভিতরে ও বাইরে ৩৬০টি মূর্তি ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাতের লাঠি দ্বারা এগুলি ভাঙতে থাকেন এবং কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পড়তে থাকেন।

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا

‘তুমি বল, হক এসে গেছে, বাতিল দূরীভূত হয়েছে। নিশ্চয়ই বাতিল দূরীভূত হয়েই থাকে’
(বনু ইসরাঈল ১৭/৮১)।

তিনি আরও পড়েন,

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ

‘তুমি বল হক এসে গেছে এবং বাতিল আর না শুরু হবে, না ফিরে আসবে’ (সাবা ৩৪/৪৯)। অর্থাৎ সত্যের মুকাবিলায় মিথ্যা এমনভাবে পর্যুদস্ত হয় যে, তা কোন বিষয়ের সূচনা বা পুনরাবৃত্তির যোগ্য থাকে না’ (বুখারী হা/৪২৮৭)।

ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী অতঃপর তিনি ওছমান বিন ত্বালহাকে ডেকে তাকে ভিতর থেকে সমস্ত মূর্তি-প্রতিকৃতি বের করার নির্দেশ দেন। এসময় তিনি তার মধ্যে ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ)-এর দু’টি প্রতিকৃতি দেখেন। যাদের হাতে ভাগ্য নির্ধারণী তীর দেখে তিনি বলে ওঠেন,

قَاتَلَهُمُ اللهُ لَقَدْ عَلِمُوا مَا اسْتَقْسَمَا بِهَا قَطُّ

মুশরিকদের আল্লাহ ধ্বংস করুন। আল্লাহর কসম! তারা জানে যে, তাঁরা কখনোই এ ধরনের ভাগ্যতীর ব্যবহার করেননি’। তিনি বলেন,

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفاً مُسْلِماً، وَما كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

‘ইবরাহীম কখনো ইহূদী বা নাছারা ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম। আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না’
(আলে ইমরান ৩/৬৭)।

ইবনু আববাসের অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, সেখানে মারিয়ামের ছবিও ছিল (বুখারী হা/৩৩৫১)।

এভাবে সমস্ত ছবি-মূর্তি দূর হওয়ার পর তিনি কা‘বাগৃহে প্রবেশ করেন ও ঘরের চারিদিকে তাকবীর দেন

(বুখারী হা/৪২৮৮)।

ইবনু ওমরের বর্ণনায় এসেছে যে, অতঃপর তিনি ভিতরে প্রবেশ করেন ও দরজা বন্ধ করে দেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন উসামা, বেলাল এবং ওছমান বিন তালহা (রাঃ)। এরপর তিনি কা‘বার দরজা পিছনে রেখে সম্মুখ দেওয়ালের তিন হাত পিছনে দুই খাম্বার মাঝে দাঁড়িয়ে বাম দিকে এক খাম্বা ও ডান দিকে দুই খাম্বা এবং পিছনে তিন খাম্বা রেখে দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করেন। এ সময় কা‘বাগৃহে মোট ছয়টি খাম্বা ছিল’।কোন কোন বিদ্বান একে ‘তাহিইয়াতুল মসজিদ’ দু’রাক‘আত ছালাত বলেছেন।

ঐদিন আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) কা‘বা গৃহের মধ্যে ছালাত আদায় করেছিলেন কি-না, এ নিয়ে বেলাল ও উসামাহর দু’ধরনের বক্তব্য থাকায় বিদ্বানগণ একমত হ’তে পারেননি। বেলাল বলেছেন, ‘পড়েছেন দুই ইয়ামানী খাম্বার মাঝে’ (বুখারী হা/১৫৯৮, ৪২৮৯)।

অন্যদিকে উসামা বলেছেন, ‘পড়েননি, বরং ঘরের চারদিকে হেটে তাকবীর দিয়েছেন’

(মুসলিম হা/১৩৩০, ফাৎহ ৩/৫৪৩)।

এর সমন্বয় দু’ভাবে হ’তে পারে।

১. বেলালের বর্ণনা হ্যাঁ বোধক (مُثْبِتٌ)। তাছাড়া এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। অতএব সেটাই অগ্রাধিকারযোগ্য।

২. উসামা বালতি ভরে পানি নিয়ে যখন প্রবেশ করেন, তখন তিনি তাকে (ছালাত শেষে) দাঁড়িয়ে দো‘আ পাঠ ও তাকবীর দিতে দেখেন। উপরন্তু ঘরে ছিল অন্ধকার। অতএব বাহির থেকে ঢুকে ছালাত দেখতে না পাওয়াটা অসম্ভব কিছু নয় (ফাৎহ ৩/৫৪৭)।

এটা নিশ্চিত যে, ঐ সময় রাসূল (ছাঃ) ‘মুহরিম’ ছিলেন না (বুখারী হা/৪২৮৬)।

অতএব মসজিদ হিসাবে সেখানে ‘তাহিইয়াতুল মাসজিদ’ দু’রাক‘আত নফল ছালাত পড়াটাই স্বাভাবিক। পরবর্তীতে বিদায় হজ্জের সময় তিনি কা‘বার মধ্যে ছালাত আদায় করেননি। বরং বাইরে মাক্বামে ইবরাহীমে দাঁড়িয়ে কা‘বাকে সামনে রেখে ছালাত আদায় করেছেন। কেননা এভাবে আদায়ের নির্দেশ রয়েছে কুরআনে (বাক্বারাহ ২/১২৫)

অতঃপর তিনি দরজা খুলে দেন। এসময় শত শত মানুষ কা‘বাগৃহের সম্মুখে দন্ডায়মান ছিল’ (মুসলিম হা/১৩২৯)। অতঃপর ত্বাওয়াফ শেষে উষ্ট্রীকে বসানোর জায়গা না পেয়ে বাতনে ওয়াদীতে সরিয়ে দেন

(ছহীহ ইবনু হিববান হা/৩৮২৮)।

এসময় আবুবকর (রাঃ) তাঁর বৃদ্ধ ও অন্ধ পিতা আবু কুহাফাকে নিয়ে আসেন। তাকে দেখে রাসূল (ছাঃ) বললেন, কেন তুমি তাকে বাড়ীতে রেখে এলে না? আমিই তাঁর কাছে যেতাম। আবুবকর

(রাঃ) বললেন, আপনি যাওয়ার চাইতে তাঁরই আসার হক বেশী। অতঃপর তিনি পিতাকে সামনে বসিয়ে দিলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাঁর বুকে হাত রেখে বললেন, ইসলাম কবুল করুন! নিরাপদ থাকুন'। তিনি ইসলাম কবুল করলেন।

হুনাইনের যুদ্ধ

এ প্রস্তুতির কথা জানতে পেরে নবী করীম -ও সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এই ক্রমবর্ধমান ফিতনাকে সময় থাকতেই মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করতে হবে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে অষ্টম হিজরীর ১০ শাওয়াল মাসে ১০,০০০ বা ১১,৫০০ বা ১২,০০০ বা ১৬,০০০ মুসলিম সৈন্য নিয়ে মুহাম্মাদ(সঃ) দুশমনের মুকাবিলার জন্যে রওয়ানা হলেন।ঐ সময় মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিলো বিপুল আর তাদের যুদ্ধ-সরঞ্জামও ছিলো প্রচুর। এটা দেখেই তাদের মনে পূর্ণ প্রত্যয় জন্মালো যে, দুশমনরা তাদের মুকাবিলা করতে কিছুতেই সমর্থ হবে না; বরং অচিরেই তারা ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যাবে। এমন কি, কোনো কোনো মুসলমানের মুখ থেকে এ উক্তি পর্যন্ত বেরিয়ে পড়লো : 'আজ আর আমাদের ওপর কে জয়লাভ করতে পারে কিন্তু এরূপ ধারণা মুসলমানদের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে কিছুমাত্রও সামঞ্জস্যশীল ছিল না। কারণ তাদের কখনো আপন শক্তি-সামর্থ্যের ওপর ভরসা করা উচিত নয়। তাদের শক্তি হওয়া উচিত শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার দয়া ও করুণা। কুরআন পাকে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : 'হুনাইনের দিনকে স্মরণ করো, যখন তোমরা নিজেদের সংখ্যাধিক্যতে তুষ্ট ছিলে; কিন্তু তাতে তোমাদের কোনো কাজ হয়নি; বরং জমিন প্রশস্ত থাকা সত্ত্বেও তা তোমাদের জন্যে সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিলো এবং তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়েছিলে। অতঃপর আল্লাহ তাঁর রাসূল এবং মুসলমানদের ওপর নিজের তরফ থেকে সান্ত্বনা ও প্রশান্তির ভাবধারা নাযিল করলেন এবং তোমরা দেখতে পাওনি এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে কাফিরদের শাস্তি দিলেন। কাফিরদের জন্যে এমনি শাস্তিই নির্ধারিত।'

এ যুদ্ধে আল্লাহ পাক মুসলমান বাহিনীকে আত্মিক প্রশান্তি ও ৫,০০০ বা ৮,০০০ বা ১৬,০০০ ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করেছিলেন। আর নবী মুহাম্মদ এক মুষ্টি মাটি আল্লাহর নাম নিয়ে কাফেরদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। এর মাটি সব কাফেরের চোখে পড়ে। ফলে তারা আর দেখতে পারে না। কাফেররা পরাজিত হলো।

হুনাইন হচ্ছে মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী একটি উপত্যকা। এখানেই এই ঐতিহাসিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলমানরা সামনে আসা মাত্র দুশমনরা আশ-পাশের পাহাড় থেকে এলোপাথাড়ি তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করলো। এ পরিস্থিতির জন্যে মুসলমানরা মোটেও প্রস্তুত ছিলো না। এর ফলে তাদের সৈন্যদলে বিশৃংখলা দেখা দিলো এবং কিছুক্ষণের জন্যে তারা ময়দান ত্যাগ করলো। অনেক বেদুইন গোত্র ময়দান থেকে পালিয়ে গেলো। এদের মধ্যে সবেমাত্র ঈমান এনেছে এবং পূর্ণ প্রশিক্ষণ পায়নি এমন অনেক নও-মুসলিমও ছিলো। এই বিশৃংখল পরিস্থিতিতে হযরত

অত্যন্ত দৃঢ়তা ও প্রশান্ত চিত্তে যুদ্ধ ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং দুশমনদের মুকাবিলা করা ও ময়দান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করার জন্যে মুসলমানদের প্রতি ক্রমাগত আহবান জানাতে লাগলেন। তার এই অপূর্ব ধৈর্য-স্থৈর্য এবং তার চারপাশে বহু সাহাবীর অকৃত্রিম দৃঢ়তা দেখে মুসলিম সৈন্যরা পুনরায় ময়দানে আসতে শুরু করলো এবং নবতর উৎসাহ-উদ্দীপনা ও শৌর্য-বীর্যের সঙ্গে দুশমনদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। নবী করীম (স) এবং তার সাহাবীদের এই ধৈর্য ও দৃঢ়তাকেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর তরফ থেকে অবতীর্ণ সান্ত্বনা ও প্রশান্তির লক্ষণ বলে উল্লেখ করেছেন। এর ফলে আল্লাহর অনুগ্রহে অল্পক্ষণের মধ্যেই যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেলো এবং মুসলমানরা পুরোপুরি জয়লাভ করলো। কাফিরদের প্রায় ৭০ ব্যক্তি নিহত এবং সহস্রাধিক লোক বন্দী হলো।

দুশমনদের পশ্চাদ্ধাবন ও কল্যাণ কামনা কাফিরদের বাকি সৈন্যদের পালিয়ে গিয়ে তায়েফে আশ্রয় গ্রহণ করলো। কারণ তায়েফকে একটি নিরাপদ স্থান মনে করা হতো। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন এবং তায়েফ অবরোধ করলেন। তয়েফে একটি মশহুর ও মজবুত দুর্গ ছিলো। এর ভেতরেই কাফিরগণ আশ্রয় গ্রহণ করেছিলো। অবরোধ প্রায় বিশ দিন অব্যাহত রইলো। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যখন ভালোমতো বুঝতে পারলেন যে, দুশমনদের মেরুদণ্ড ভেঙে পড়েছে এবং এখন আর তাদের মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার কোনো আশঙ্কা নেই, তখন তিনি অবরোধ তুলে নিলেন এবং তাদের জন্যে দোআ করলেন : 'হে আল্লাহ! সাকীফ গোত্রকে সুপথ প্রদর্শন করো এবং তাদেরকে আমার কাছে হাযির হবার তাওফিক দাও।' কেবল দ্বীন-ইসলামের জন্যে সংগ্রামকারী খোদার নবী ছাড়া কে এমনি পরিস্থিতিতে একখানি দয়ার্দ্র হৃদয় ও স্নেহশীল হতে পারে এবং বিরুদ্ধবাদীদের জন্যে কল্যাণ কামনা করতে পারে?

তাবুকের যুদ্ধ

গাজওয়ে তাবুক বা তাবুক যুদ্ধ। এটি ছিলো ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর জীবনের শেষ যুদ্ধ এবং যা রোম সম্রাজ্যের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। তৎকালীন সময়ের অর্ধেক পৃথিবীর একচ্ছত্র শাসক রোম সম্রাটের সিরিয় গভর্নরের বিরুদ্ধে ৮ম হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে পরিচালিত 'মুতা' অভিযানে এক অসম যুদ্ধে রোমকদের পিছুটানের ফলে আরব উপদ্বীপে মুসলিম শক্তির শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রভাব বিস্তৃত হয়। ইসলামের ইতিহাসে এটি তাবুক অভিযান নামেও পরিচিত।

ইতিহাস

এ সময় মদীনার সাবেক আউস নেতা ও খৃষ্টান ধর্মীয় গুরু আবু আমের আর-রাহেব হোনায়েন যুদ্ধের পর সবদিক দিয়ে নিরাশ হয়ে অবশেষে সিরিয়ায় (শাম) চলে যান। কেননা এটি তখন ছিল খৃষ্টানদের কেন্দ্রবিন্দু। সেখানে গিয়ে তিনি রোম সম্রাটকে মদীনা আক্রমণের জন্য প্ররোচনা দিতে থাকেন। এ উদ্দেশ্যে মদীনার মুনাফিকদের সাথে তিনি পুরা যোগাযোগ রাখেন এবং তাদেরকে দিয়ে তিনি মসজিদে ক্বোবার অদূরে 'মসজিদে যেরার' নির্মাণ করান মসজিদের মুখোশে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র হিসাবে। রোম সম্রাটকে তিনি বুঝাতে সক্ষম হন যে, মদীনায় হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এর বিরুদ্ধে তার একটি বিরাট দল রয়েছে। যারা বাহ্যিকভাবে হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এর দলে মিশে আছে। বাইরে থেকে রোমকরা হামলা করলেই তারা ঘুরে দাঁড়াবে এবং রোমকদের সহজ বিজয় লাভ হবে।একদিকে রাজনৈতিক বাস্তবতা অন্যদিকে আবু আমেরের এই প্ররোচনা রোম সম্রাটকে উৎসাহিত করল। পূর্ণরূপে শক্তি সঞ্চয়ের পূর্বেই উঠতি ইসলামী শক্তিকে নির্মূল করে দেবার সংকল্প নিয়ে তিনি ব্যাপক যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করেন। যাতে রোম সাম্রাজ্য সংলগ্ন আরব এলাকা থেকে ভবিষ্যতে কোনরূপ ফিৎনা বা বিদ্রোহ দেখা দেবার সুযোগ সৃষ্টি না হয়।

মদীনায় রোমক ভীতি

রোম সম্রাটের ব্যাপক যুদ্ধ প্রস্তুতির খবর মদীনায় পৌঁছে গেলে মুসলমানদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ভীতির সঞ্চার হয়। বিশেষ করে মুনাফিকদের অধিকমাত্রায় অপপ্রচারের ফলে সাধারণ ও দুর্বলমনা মুসলমানদের রাতের ঘুম হারাম হয়ে যায়।

রোমকদের যুদ্ধ যাত্রার খবর

এইরূপ ভীতিকর অবস্থার মধ্যে শাম থেকে মদীনায় আগত তৈল ব্যবসায়ী নাবাত্বী দলের মাধ্যমে সংবাদ পাওয়া গেল যে, রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস তার একজন বিখ্যাত সেনাপতির অধীনে ৪০,০০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করেছেন। যার মধ্যে লাখাম, জোযাম প্রভৃতি খৃষ্টান গোত্রগুলি সহ অন্যান্য আরব মিত্র গোত্রসমূহ রয়েছে। তাদের অগ্রবর্তী বাহিনীটি ইতিমধ্যে সিরিয়ার বালক্বা (البلقاء) নগরীতে পৌঁছে গেছে। খবরটি এমন সময় পৌঁছল, যখন ছিল গ্রীষ্মকাল

এবং ফল পাকার মৌসুম। মানুষের মধ্যে ছিল ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের তীব্র কষাঘাত। রাস্তা ছিল বহু দূরের এবং অতীব ক্লেশকর।

যুদ্ধযাত্রা

আরব এলাকায় রোমকদের প্রবেশ করার আগেই তাদেরকে রোম সীমান্তের মধ্যেই আটকে ফেলার জন্যে যুদ্ধ কৌশল নেন হযরত মুহাম্মদ (সঃ)। যাতে আরব ও মুসলিম এলাকা অহেতুক ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। অন্য সময় হযরত মুহাম্মদ (সঃ) 'তাওরিয়া' করেন। অর্থাৎ একদিকে যাওয়ার কথা বলে অন্যদিকে যেতেন। কিন্তু এবার তিনি সরাসরি ঘোষণা করলেন যে, রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে হবে। অতঃপর এ ব্যাপারে তিনি সবাইকে জোরালোভাবে উৎসাহিত করতে থাকেন। যাতে ভীতি ঝেড়ে ফেলে সবাই যুদ্ধের জন্য জোরে শোরে প্রস্ত্ততি গ্রহণ করতে পারে। দেখা গেল যে, একমাত্র মুনাফিকরা ব্যতীত সবাই যুদ্ধে যাত্রার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলো। মক্কাবাসীদের নিকটে ও অন্যান্য আরব গোত্রগুলির নিকটে খবর পাঠানো হ'ল। একই সময়ে সূরা তওবার অনেকগুলি আয়াত নাযিল হ'ল মুনাফিকদের যুদ্ধভীতির বিরুদ্ধে ও মিথ্যা ওযর-আপত্তির বিরুদ্ধে।

দান

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর সঙ্গী ইসলামে প্রথম খলিফা আবুবকর ছিদ্দীক তার সর্বস্ব এনে হাযির করলেন। আল্লাহ ও রাসূল ব্যতীত তার পরিবারের জন্য কিছুই ছেড়ে আসেননি। তিনিই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি জিহাদ ফান্ডে দানের সূচনা করেন। অপর সঙ্গী ওমর ফারূক তার সমস্ত মাল-সম্পদের অর্ধেক দান করেন। ওসমান গণী পরপর পাঁচবারে হাওদাসহ ৯০০ উট, গদি ও পালান সহ ১০০ ঘোড়া, প্রায় সাড়ে ৫ কেজি ওজনের কাছাকাছি ১০০০ স্বর্ণমুদ্রা, প্রায় ২৯ কেজি ওযনের কাছাকাছি ২০০ উক্বিয়া রৌপ্য মুদ্রা দান করেন এবং যুদ্ধের ত্রিশ হাজার সৈন্যের এক তৃতীয়াংশ তথা দশ হাজার সৈন্যের ব্যয়ভার তিনি গ্রহণ করেন ।

আব্দুর রহমান বিন আওফ ২০০ উক্বিয়া রৌপ্যমুদ্রা দান করেন। আববাস ইবনু আব্দুল মুত্ত্বালিবও অনেক সম্পদ দান করেন। আছেম বিন আদী ৯০ অসাক্ব অর্থাৎ প্রায় ১৩,৫০০ কেজি খেজুর জমা দেন। এতদ্ব্যতীত ত্বালহা, সা'দ বিন ওবাদাহ, মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ প্রমুখ প্রচুর মাল-সম্পদ দান করেন। এভাবে এক মুদ, দুই মুদ করে কম-বেশি দানের স্রোত চলতে থাকে।

তাবুকের পথে মুসলিম বাহিনী

৯ম হিজরীর রজব মাসের এক বৃহস্পতিবারে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ৩০ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে তাবুকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'লেন। এটাই ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় সেনা অভিযান। এই সময় তিনি মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ আনছারীকে মতান্তরে সেবা' বিন আরফাতা -কে মদীনার প্রশাসক নিযুক্ত করেন এবং হযরত আলীকে তার পরিবারের দেখাশুনার দায়িত্ব দিয়ে যান। কিন্তু মুনাফিকেরা তাকে ভীতু, কাপুরুষ ইত্যাদি বলে ঠাট্টা করায় ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি পুনরায় গিয়ে পথিমধ্যে সেনাদলে যোগ দেন।

সেনাবাহিনীতে বাহক ও খাদ্য সংকট

সাধ্যমত দান-ছাদাক্বা করা সত্ত্বেও তা এই বিশাল সেনাবাহিনীর জন্য যথেষ্ট ছিল না। ফলে প্রতি ১৮ জনের জন্য একটি করে উটের ব্যবস্থা হয়। যার উপরে তারা পালাক্রমে সওয়ার হতেন। অনুরূপভাবে খাদ্য সংকট দেখা দেয়ায় তারা গাছের ছাল-পাতা খেতে থাকেন। যাতে তাদের ঠোটগুলো ফুলে যায়। পানির অভাবে প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার উপক্রম হ'লে বাহন সংকট থাকা সত্ত্বেও তারা মাঝে-মধ্যে উট নহর করতে বাধ্য হ'তেন এবং উটের পিঠের কুঁজোতে (الكرش) সঞ্চিত পানি পান করতেন। বাহন ও খাদ্য-পানীয়ের এই কঠিন সংকটের কারণে তাবুক বাহিনীকে জায়শুল উসরাহ অর্থাৎ অভাব-অনটনের বাহিনী বলা হয়।

পথিমধ্যে সেনাবাহিনী ব্যাপক হারে পানি সংকটে পড়ায় তারা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর নিকটে এসে পানির অভিযোগ পেশ করেন। তখন আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) আল্লাহর নিকটে পানি প্রার্থনা করলেন। ফলে আল্লাহ বৃষ্টির মেঘ পাঠিয়ে দেন, যা বিপুল বৃষ্টি বর্ষণ করে। সেনাবাহিনী তৃপ্তি সহকারে পানি পান করেন এবং পাত্রসমূহ ভরে নেন।গাজওয়ে তাবুক বা তাবুক যুদ্ধ। এটি ছিলো ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর জীবনের শেষ যুদ্ধ এবং যা রোম সম্রাজ্যের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। তৎকালীন সময়ের অর্ধেক পৃথিবীর একচ্ছত্র শাসক রোম সম্রাটের সিরিয় গভর্নরের বিরুদ্ধে ৮ম হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে পরিচালিত 'মুতা' অভিযানে এক অসম যুদ্ধে রোমকদের পিছুটানের ফলে আরব উপদ্বীপে মুসলিম শক্তির শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রভাব বিস্তৃত হয়। ইসলামের ইতিহাসে এটি তাবুক অভিযান নামেও পরিচিত।

দাওয়াতের সাফল্য ও প্রভাব

এখন আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পবিত্র জীবনের শেষ দিনগুলো আলোচনার পর্যায়ে পৌঁছেছি। কিন্তু এ আলোচনার জন্য কলমকে গতিশীল করার পূর্বে তাঁর সফল, বিচিত্র ও বিশিষ্ট জীবনধারা যা অন্যান্য নাবী ও রাসূলগণের তুলনায় তাঁকে বৈশিষ্ট্যময় করে তুলেছিল এবং প্রাধান্য প্রদান করেছিল, সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করতে চাই। আল্লাহ তা'আলা নাবী কারীম (ﷺ)-এর মাথার উপর পূর্ব ও পরের সকল নেতৃত্বের মুকুট স্থাপন করেছিলেন। নাবী কারীম (ﷺ)-কে বলা হয়,

(يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ -قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيْلًا) الآيات [المزمل:1، 2]

'ওহে চাদরে আবৃত (ব্যক্তি)! ২. রাতে সলাতে দাঁড়াও তবে (রাতের) কিছু অংশ বাদে।' (আল-মুয্যাম্মিল (৭৩) : ১-২]

(يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ -قُمْ فَأَنْذِرْ) [المدثر:1، 2]

'ওহে বস্ত্র আবৃত (ব্যক্তি)! ২. ওঠ, সতর্ক কর। [আল-মুদ্দাসসির (৭৪) : ১-২]

অতঃপর কী ছিল? প্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং এ পৃথিবীর সর্ব বৃহৎ আমানতের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে অনবরত দন্ডায়মান রইলেন। অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ মান বিকাশের সুমহান দায়িত্ব, একত্ববাদ বিশ্বাসের গুরুদায়িত্ব এবং আল্লাহর আমানত বাস্তবায়ন ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অবিরাম সাধনা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অভীষ্ট গন্তব্যের পানে এগিয়ে চলা যা জাহেলিয়াত যুগের গাঢ় অন্ধকারে ছিল আচ্ছন্ন, যা বস্তুবাদী ও বহুত্ববাদী ভাবধারায় ছিল দারুনভাবে ভারাক্রান্ত যা ছিল পশু প্রবৃত্তি ও লালসার বেড়াজালে আবদ্ধ। অতঃপর একদল অত্যন্ত বিবেকসম্পন্ন, বিশ্বস্ত ও নিবেদিত সাহাবার সহায়তায় সব কিছুকে পরাভূত ও ছিন্নভিন্ন করে ফেলে আল্লাহর ধ্যান ধারণা ও আলোয় সমুজ্জ্বল এক প্রান্তরে গিয়ে যখন দন্ডায়মান হলেন তখন আরম্ভ হল ভিন্নতর এক জীবন সংগ্রাম।
আরম্ভ হল যুদ্ধের পর যুদ্ধ সে সকল শত্রুর বিরুদ্ধে দাওয়াত ইলাহী এবং তার বিশ্ববাসীদের মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে যারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং শিশু ইসলাম চারাটি তরতাজা হয়ে ভূগর্ভে তার শিকড় প্রোথিত এবং উন্মুক্ত আকাশে তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করানোর পূর্বেই চেয়েছিল তাকে ধ্বংস করে ফেলতে। দ্বীনে ইলাহির দাওয়াতে ঐ সকল শত্রুর সঙ্গে নাবী কারীম (ﷺ)-কে অবিরামভাবে যুদ্ধ করতে হয়েছিল এবং আরব উপদ্বীপের মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই বিশাল রোমক বাহিনী এ নতুন উম্মতকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সীমান্ত এলাকায় সৈন্য মহড়া শুরু করে দেয়।
যুদ্ধের ময়দানে অস্ত্রসজ্জিত মুশরিক, মুনাফিক্ব ও কাফিরদের সঙ্গেই যে তাঁকে অনবরত যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হয়েছিল শুধু তাই নয় বরং আরও এক ভয়ংকর এবং সার্বক্ষণিক শত্রুর সঙ্গে তাঁকে অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয়েছিল। সে শত্রুটি ছিল মানব জাতির চির শত্রু শয়তান। সে মানুষের শিরায় শিরায় বিচরণ করে মানুষকে এক গোমরাহী ও ভ্রষ্টতার অতল গহবরে নিমজ্জিত করার জন্য সর্বক্ষণ চক্রান্ত চালাতে থাকে। শয়তানের চক্রান্তের কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে মুসলিমগণকে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হলেও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অত্যন্ত দক্ষতা ও প্রজ্ঞার সঙ্গে সে সবের মোকাবিলা করে করে সব কিছুকে নস্যাৎ করে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং তাঁরা সাহাবীগণ যে নিষ্ঠা, ত্যাগ, আত্মবিশ্বাস ও সাহসিকতার সঙ্গে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াতের কাজে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিলেন মানব জাতির ইতিহাসে তার কোন তুলনা মেলে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নাবী কারীম (ﷺ)-এর উপর দ্বীনের দাওয়াতের যে মহাসম্মানজনক এবং মহা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন তা বাস্তবায়ন এবং প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে তাঁরা অন্য কিছুকে বড় করে দেখতেন না। দ্বীনের কাজে অকাতরে তাঁরা দিতেন প্রাণ এবং সর্বস্ব দিয়ে একদম নিঃস্ব হয়ে যেতে তাঁরা কখনো কুণ্ঠিত হতেন না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পদতলে যখন সঞ্চিত হতো সম্পদের পাহাড় সে সব আল্লাহর পথে খরচ না করে তিনি অবসর নিতেন না। তাঁর নিকট প্রাচুর্য ছিল পরিত্যাজ্য, দারিদ্র ছিল কাম্য। দিবাভাগে দ্বীনের দাওয়াত

এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে সর্বক্ষণ থাকতেন তিনি ব্যস্ত, রাত্রিবেলা দীর্ঘ সময় প্রভূর উদ্দেশ্যে থাকতেন নিবেদিত।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এমনিভাবে একের পর এক যুদ্ধ পরিচালনায় বিশ বছরের অধিক সময় অতিবাহিত করেন। এ সময়ের মধ্যে কোন একটি বিষয় তাঁকে অন্যান্য বিষয় হতে উদাসীন কিংবা গাফেল করতে পারেনি। অভ্যন্তরীণ এবং বহিস্থঃবহু প্রতিকূলতা ও বিড়ম্বনা সত্ত্বেও স্বল্প কালের মধ্যেই ইসলামী দাওয়াত এমনি এক বিশালায়তনে কৃতকার্যতা লাভ করেছিল যে, তা প্রত্যক্ষ করে বিশ্ব বিবেক একেবারে স্তম্ভিত এবং হতচকিত হয়ে পড়ে। দেখতে দেখতে কয়েক বছরের মধ্যেই সমগ্র আরব ভূভাগ থেকে জাহেলিয়াতের অন্ধকার বিদূরিত হয়ে ঈমান আমান, শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিবেক ও শৌর্য-বীর্যের আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এবং শিরক্, কুফরী, মুনাফিক্বী ও মূর্তিপূজার মূল উৎপাটিত হয় এবং আপামর আরববাসী দ্বীনের দাওয়াত গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অনুগত হয়ে পড়ে। আল্লাহর একত্ববাদের ধ্বনি ও প্রতিধ্বনিতে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়ে ওঠে এবং সর্বত্র মুয়াযিযনের সুরেলা কণ্ঠে দিগ্বিদিক মুখরিত হয়ে ওঠে। মদীনা অভিমুখী বিভিন্ন গোত্রের আনাগোনা, নব্য মুসলিমগণের তাকবীরধ্বনি এবং কুরআন তিলাওয়াতকারীগণের কণ্ঠনিঃসৃত মধুর সুরে মরুপ্রান্তর মউ মউ করে ওঠে।

ভিন্ন ও পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন বহুধাবিভক্ত গোত্রগুলোর মধ্যে ঐক্য, সহৃদয়তা ও সমঝোতার প্লাবন প্রবাহিত হতে থাকে। মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করে মানুষ প্রবেশ করতে থাকে আল্লাহর দাসত্বে। কেউই অত্যাচারী রইল না কিংবা অত্যাচরিতও রইল না। রইল না মালিক কিংবা মামলুক, না হাকিম, না মাহকুম, না যালিম কিংবা মাযলুম। সব ভেদাভেদের অবসান হয়ে গেল। মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হল একমাত্র তাকওয়া বা পরহেজগারী। অন্যথায় সকল মানুষ আদমসন্তান এবং আদম (আঃ) মাটির সৃষ্টি।

ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হল আরবী একাত্মতা, বিশ্ব মানবতার একাত্মতা এবং সামাজিক সুবিচার। পাওয়া গেল মানব জাতির সমস্যা-সংকুল পার্থিব জীবনে চলার পথের ঠিক দিক নির্দেশনা এবং পরকালীন কল্যাণের মূলমন্ত্র। মানুষের জীবনযাত্রায় সূচিত হল আমূল পরিবর্তন। রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি সর্বক্ষেত্রেই সূচিত হল যুগান্তকারী পরিবর্তন। মানব সভ্যতা হল মানবোচিত ধ্যান ধারণা, চিন্তা চেতনা ও জ্ঞান ও বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ ও সৌন্দর্য মন্ডিত।

ইসলামী দাওয়াতের পূর্বে পৃথিবীতে ছিল অন্ধকারের প্রাধান্য, পৃথিবীর পরিবেশ ছিল দুর্গন্ধযুক্ত এবং আত্মা ছড়িয়ে চলেছিল দুর্গন্ধ। মাপ ও পরিমাপ ছিল অস্পষ্ট। সর্বত্র বিরাজিত ছিল অন্যায়, দাসত্ব, শোষণ ও সন্ত্রাসের শাসন। অশান্তি, অশ্লীলতা এবং ধ্বংস প্রবণতা পৃথিবীকে চরম অস্থিরতার মধ্যে নিপতিত করছিল। কুফর ও ভ্রষ্টতার ঘন পর্দায় ঢাকা পড়েছিল মানুষের সনাতন জীবনধারার শাশ্বত রূপ। অথচ আসমানী জীবন বিধান ছিল তখনো বিদ্যমান। কিন্তু সে বিধান

হয়ে পড়েছিল বিকৃত এবং বিভ্রান্তিপূর্ণ। সে বিধানের গ্রহণী শক্তি গিয়েছিল সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে। যার ফলে তা প্রাণহীন একটি লোকাচার বা রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল।
ইসলামী দাওয়াত যখন তার অসামান্য প্রাণশক্তি, সর্ববাদীসম্মত আল্লাহর বিধি বিধান, শাশ্বত মানবিক মূল্যবোধ ও আধ্যাত্মিক চেতনা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল, তখন প্রচলিত রেওয়াজ সর্বস্ব জীবনের বিধানের অসারতা প্রমাণিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের নামে যে অর্থহীন লোকাচার, শ্রেণীবিভেদ, অহমিকা, অস্থিরতা, শিরক ও বহুত্ববাদী, বিভ্রান্তিকর ধারণা প্রচলিত ছিল তার অবসান ঘটল। আর মানব সমাজ মুক্তি লাভ করল যাবতীয় অন্যায়-অনাচার, জোবরদস্তি থেকে। মুক্ত হলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়া, পতন থেকে। সমাজের মধ্যে বিভিন্ন স্তরে দলাদলি, শাসক ও পুরোহিতদের স্বেচ্ছাচারিতার অবসান ঘটল। সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠল এক দয়া ও পরিচ্ছন্নতা, নতুনত্ব, ঈমান ইয়াক্বীন, ন্যায়নিষ্ঠতা, সহমর্মিতা এবং মানব জীবন স্বচ্ছ-নির্মল এক মহা উন্নত সোপানে উন্নীত হয়, প্রত্যেক প্রাপক তার প্রাপ্য অধিকার নিশ্চয়তা লাভ করে এমন কতকগুলো সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থার উপর।
এর ফলে আরব উপদ্বীপে এমন এক বরকতপূর্ণ পরিবেশ এবং উন্নত ও পরিচ্ছন্ন জীবনধারা সূচিত হল ইতোপূর্বে কোন কালেও যা দেখা যায় নি এবং সে সময়কার মতো উজ্জ্বল ও দীপ্তিময় ইতিহাস আর কোন কালেও দেখা যাওয়া সম্ভব নয়।

প্রতিনিধি দল সমূহের আগমন

৮ম হিজরীর শাওয়াল মাসে হোনায়েন যুদ্ধের পর থেকে ৯ম ও ১০ম হিজরী সনকে আমরা ‘প্রতিনিধি দলসমূহের আগমন বছর’(عَامُ الْوُفُودِ) হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। মূলতঃ ৮ম হিজরীর রামাযান মাসে মক্কা বিজয়ের পর চারিদিকে ইসলাম কবুলের ঢেউ ওঠে। ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় লাভের জন্য সমগ্র আরব জাহান যেন মক্কা বিজয়ের অপেক্ষায় ছিল। কেননা তারা বলত,اتْرُكُوهُ وَقَوْمَهُ، فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ نَبِيٌّ صَادِقٌ ‘মুহাম্মাদ ও তাঁর কওমকে ছেড়ে দাও। কেননা যদি তিনি তাদের (অর্থাৎ কুরায়েশদের) উপরে জয়লাভ করেন, তাহ’লে তিনি সত্য নবী’।অতঃপর যখন তিনি মক্কা জয় করলেন এবং কুরায়েশ নেতারা ইসলাম কবুল করলেন, এমনকি হোনায়েন যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ হয়ে তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করলেন, তখন বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন গোত্রের পক্ষ হ’তে দলে দলে প্রতিনিধি দল মদীনায় আসতে শুরু করল এবং ইসলাম কবুল করে ধন্য হ’ল। ফলে দেখা গেল যে, মক্কা বিজয়ের মাত্র নয় মাসের মাথায় ৯ম হিজরীর রজব মাসে তাবূক অভিযানের সময় ৩০,০০০ ফৌজ জমা হয়ে গেল। তার এক বছর পর ১০ম হিজরীর যিলহাজ্জ মাসে বিদায় হজ্জের সময় এক লক্ষ চবিবশ হাযার বা ত্রিশ হাযার মুসলমান আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর সাথী হ’লেন। দু’দিন আগেও যারা লাত, মানাত, ‘উয্যা, হোবলের নামে জয়ধ্বনি করত

ও তাদের সন্তুষ্টির জন্য বিভিন্ন নযর-নেয়ায নিয়ে তাদের অসীলায় পরকালে মুক্তি লাভের জন্য সেখানে হুমড়ি খেয়ে পড়ত, আজ তাদের লাববায়েক আল্লাহুম্মা লাববায়েক, আল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ ধ্বনিতে গগন-পবন মুখরিত হয়ে উঠলো।

প্রতিনিধি দল সমূহ

ইবনু সা'দ, দিমইয়াত্বী, ইবনু সাইয়িদিন নাস, মুগলাত্বাঈ, যয়নুদ্দীন ইরাকী প্রমুখ জীবনীকারগণ ৬০-এর অধিক প্রতিনিধি দলের কথা বর্ণনা করেছেন। যুরক্বানী বলেন, উক্ত সংখ্যা ৭০ পর্যন্ত পৌঁছবে না, যা প্রসিদ্ধ আছে'। তিনি ৮ম হিজরীর শাওয়াল মাসে জি'ইর্রানাতে হোনায়েন যুদ্ধের গণীমত বণ্টন শেষে আগত বনু হাওয়াযেন গোত্রের প্রতিনিধি দলকে তালিকার প্রথমে এনেছেন। অতঃপর মোট ৩৫টি প্রতিনিধি দলের বর্ণনা দিয়েছেন।আমরা সেখান থেকে ৩৪টি, যাদুল মা'আদ থেকে ২টি 'বনু তামীম' ও কা'ব বিন যুহায়ের' এবং ত্বাবাক্বাত ইবনু সা'দ থেকে ১টি 'ইয়ামনের শাসকদের দূত' সহ মোট ৩৭টি প্রতিনিধি দলের বর্ণনা দিলাম। যার মধ্যে ইবনুল ক্বাইয়িম বর্ণিত ৩৫টি, মানছূরপুরী বর্ণিত ২৬টি এবং মুবারকপুরী বর্ণিত ১৬টি দলের উল্লেখ রয়েছে।
দলগুলি হ'ল যথাক্রমে

(১) বনু হাওয়াযেন
(২) ছাক্বীফ
(৩) বনু 'আমের বিন ছা'ছা'আহ
(৪) আব্দুল ক্বায়েস
(৫) বনু হানীফা
(৬) ত্বাঈ
(৭) কিন্দা
(৮) আশ'আরী
(৯) বনু তামীম
(১০) বনুল হারেছ
(১১) হামদান
(১২) মুযায়নাহ
(১৩) দাউস
(১৪) নাজরান
(১৫) ফারওয়া বিন আমরের দূত
(১৬) বনু সা'দ বিন বকর
(১৭) তারেক বিন আব্দুল্লাহ প্রতিনিধি দল

(১৮) তুজীব
(১৯) বনু সা'দ হুযায়েম
(২০) বনু ফাযারাহ
(২১) বনু আসাদ
(২২) বাহরা
(২৩) উযরাহ
(২৪) বালী
(২৫) বনু মুর্রাহ
(২৬) খাওলান
(২৭) মুহারিব
(২৮) ছুদা
(২৯) গাসসান
(৩০) সালামান
(৩১) বনু 'আব্স
(৩২) গামেদ
(৩৩) আযদ
(৩৪) বনুল মুনতাফিক্ব
(৩৫) কা'ব বিন যুহায়ের
(৩৬) ইয়ামনের শাসকদের দূত এবং
(৩৭) নাখঈ।

জীবনীকারগণ যতগুলি প্রতিনিধি দলের বিবরণ দিয়েছেন তার অনেকগুলি মুহাদ্দিছগণের নিকটে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়। তবে প্রায় সবগুলি মর্মগতভাবে প্রমাণিত। অনেকগুলি বর্ণনা ছহীহ হাদীছ সমূহে এসেছে। যেমন বনু হাওয়াযেন, বনু তামীম, আব্দুল ক্বায়েস, বনু হানীফাহ, নাজরান, ইয়ামনবাসী আশ'আরীগণ, দাউস, তাঈ, কিন্দা, মুযায়নাহ এবং বনু সা'দ বিন বকর প্রতিনিধি দল সমূহ। আমরা প্রত্যেকটি দল সম্পর্কে আলোচনা করব। কেননা প্রত্যেকটিতেই রয়েছে অনেক শিক্ষণীয় বিষয়, যা অতীব যরূরী।

বিদায় হজ্জ

দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ সম্পূর্ণ হল এবং আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সার্বভৌমত্বে অস্বীকৃতি এবং মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর পয়গম্বরের ভিত্তির উপর এক নতুন সমাজ কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হল। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট আভাষ দেয়া হচ্ছিল যে, পৃথিবীতে তাঁর অবস্থানের সময় কাল ফুরিয়ে এসেছে। এ প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামানের গভর্ণর নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন দশম হিজরী সনে। তখন তাঁর বিদায় কালে অন্যান্য উপদেশাবলীর সঙ্গে এ কথাও বললেন,

(يَا مُعَاذُ، إِنَّكَ عَسٰي أَلَّا تَلْقَانِيْ بَعْدَ عَامِيْ هٰذَا، وَلَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِيْ هٰذَا وَقَبْرِيْ)

'হে মোয়ায! এ বছরের পর তোমার সঙ্গে আমার হয়ত আর সাক্ষাত নাও হতে পারে, তখন হয়ত বা আমার এ মসজিদ এবং আমার কবরের পাশ দিয়ে তোমরা যাতায়াত করবে।'

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মুখ থেকে মোয়ায (রাঃ) এ কথা শুনে আসন্ন বিচ্ছেদের চিন্তায় অস্থির হয়ে কাঁদতে লাগলেন।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ এটাই চেয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর নাবী কারীম (ﷺ)-কে ইসলামী দাওয়াতের কার্যকারিতা এবং সুফল বাস্তবক্ষেত্রে দেখিয়ে দেবেন। এ দাওয়াতের কাজেই নাবী কারীম (ﷺ) অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছেন এবং অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। বস্তুত তাঁর এ অসাধারণ সাফল্যমন্ডিত কর্মকান্ডের অন্তিম পর্যায়ে এটাই সুসঙ্গত হবে যে, হজ্জের মৌসুমে যখন মক্কার পার্শ্ববর্তী আরব গোত্র সমূহের সদস্য ও প্রতিনিধিগণ একত্রিত হবেন তখন তাঁরা রাসূলে কারীম (ﷺ)-এর নিকট থেকে দ্বীনের আহবান এবং শরীয়তের বিধানসমূহ নেবেন এবং নাবী কারীম (ﷺ) তাঁদের নিকট থেকে এ সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন যে, তিনি তাঁদের নিকট আল্লাহর পবিত্র আমানত যথার্থভাবে পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন এবং উম্মতের কল্যাণ কামনার হক আদায় করেছেন।

আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন সেই ঐতিহাসিক হজ্জে মকবুলের জন্য তাঁর ইচ্ছা এবং কর্মসূচি ঘোষণা করলেন তখন আরবের মুসলিমগণ দলে দলে সমবেত হতে আরম্ভ করে দিলেন। প্রত্যেকেরই ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পদচিহ্নকে নিজ নিজ চলার পথে একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত ও অনুসরণযোগ্য বা পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করে নেবেন।

অতঃপর যূল ক্বা'দাহ মাসের ৪ দিন অবশিষ্ট থাকতে শনিবার দিবস রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মক্কা অভিমুখে যাত্রার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন।[2]

তিনি চুলে চিরুনী ব্যবহার করলেন, তেল মালিশ করলেন, পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করলেন, কুরবানীর পশুগুলোকে মালা বা হার পরালেন এবং যুহর সালাতের পর রওয়ানা হয়ে গেলেন। আসরের পূর্বে যুল হোলাইফা নামক স্থানে পৌঁছলেন। সেখানে আসরের দু' রাকাত সালাত আদায়

করলেন এবং শিবির স্থাপন ক'রে সারারাত সেখানে অবস্থান করলেন। সকাল বেলা তিনি সাহাবীদের (রাযি.) বললেন,

(أَتَانِيْ اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّيْ فَقَالَ: صَلِّ فِيْ هٰذَا الْوَادِيِّ الْمُبَارَكِ وَقُلْ: عُمْرَةٌ فِيْ حَجَّةٍ)

আজ রাতে আমার প্রভূর পক্ষ হতে একজন আগন্তুক এসে বলেছেন, 'এ পবিত্র উপত্যকায় সালাত আদায় কর এবং হজ্জের সঙ্গে ওমরা সংশ্লিষ্ট রয়েছে।[3]

অতঃপর যুহরের সালাতের পূর্বে নাবী কারীম (ﷺ) ইহরামের জন্য গোসল করলেন। এরপর আয়িশা (রাঃ) রাসূল (ﷺ)-এর শরীর এবং পবিত্র মাথায় নিজ হাতে যারীরা এবং মেশক মিশ্রিত এক প্রকর সুগন্ধি দ্রব্য মালিশ করে দিলেন। সুগন্ধির রেশ নাবী (ﷺ)-এর মাথার সিঁথি এবং দাড়িতে পরিলক্ষিত হল, কিন্তু তিনি সেই সুগন্ধি না ধুয়ে তা স্থায়ীভাবে রেখে দিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি লুঙ্গি পরিধান করেন, চাদর গায়ে দেন এবং যুহরের দু' রাকাত সালাত আদায় করেন।

এরপর সালাতের স্থানে একই সঙ্গে হজ্জ এবং উমরাহর ইহরাম বেঁধে 'লাব্বায়িক' ধ্বনি উচ্চারণ করেন। ইহরাম বাঁধার পর বাহিরে এসে 'ক্বাসওয়া' নামক উটের উপর আরোহণ করেন এবং দ্বিতীয়বার 'লাববায়িক' ধ্বনি উচ্চারণ করেন। অতঃপর উটে আরোহণ ক'রে ফাঁকা ময়দানে আগমন করেন এবং সেখানেও উচচ কণ্ঠে 'লাব্বায়িক' ধ্বনি উচ্চারণ করেন।

অতঃপর মক্কা অভিমুখে ভ্রমণ অব্যাহত রাখেন। সপ্তাহ কালব্যাপী পথ চলার পর সন্ধ্যার প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন মক্কার নিকটবর্তী যী'তাওয়া নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন যাত্রা বিরতি করে সেখানে রাত্রি যাপন করলেন এবং ফজরের সালাত আদায়ের পর গোসল করলেন। অতঃপর সকাল নাগাদ মক্কায় প্রবেশ করলেন। দিবসটি ছিল ১০ম হিজরীর ৪ঠা যুল হিজ্জাহ রবিবার। পথে তিনি আট রাত কাটান, মধ্যমভাবে এ দূরত্ব অতিক্রম করার জন্য এ সময়েরই প্রয়োজন হয়ে থাকে।

মাসজিদুল হারামে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রথমে কা'বা গৃহের তাওয়াফ সম্পন্ন করেন। অতঃপর সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সায়ী করেন। কিন্তু ইহরাম ভঙ্গ করেন নি। কারণ, হজ্জ এবং ওমরার জন্য তিনি একই সঙ্গে ইহরাম বেঁধে ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে হাদয়ীও (কুরবানীর পশু) ছিল। তাওয়াফ ও সায়ী সম্পন্ন করার পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মক্কার উপরিভাগে হাজূন নামক স্থানের পাশে অবস্থান করেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার হজ্জের তাওয়াফ ছাড়া আর অন্য কোন তাওয়াফ করেন নি। সাহাবাগণের মধ্যে যাঁরা কুরবানীর পশু (হাদয়ী) সঙ্গে নিয়ে আসেন নি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁদেরকে নিজ নিজ ইহরাম ওমরায় পরিবর্তন করে নিতে এবং বায়তুল্লাহ (রাঃ) তাওয়াফ ও সাফা মারওয়ার সায়ী সম্পন্ন করে নিয়ে হালাল হয়ে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু যেহেতু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজে হালাল হচ্ছিলেন না সেহেতু সাহাবীগণ এ ব্যাপারে ইতস্তত করেছিলেন। নাবী কারীম (ﷺ) বললেন,

(لَوْ اِسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِيْ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْلَا أَنَّ مَعِيْ الْهَدْيُ لَأَحْلَلْتُ)

'আমি যা পরে জানলাম আমার ব্যাপারে আমি যদি তা আগেই জানতে পারতাম তাহলে আমি সঙ্গে হাদয়ী আনতাম না। তাছাড়া, আমার সঙ্গে যদি হাদয়ী না থাকত তাহলে আমি হালাল হয়েও যেতাম।'

তাঁর এ কথা শ্রবণের পর যাঁদের সঙ্গে হাদয়ী ছিল না তাঁরা নাবী কারীম (ﷺ)-এর নির্দেশ মেনে নিয়ে হালাল হয়ে গেলেন।

যুল হিজ্জাহ মাসের ৮ তারিখে তারবিয়ার দিন নাবী কারীম (ﷺ) মিনায় গমন করেন এবং তথায় ৯ই যুল হিজ্জাহর সকাল পর্যন্ত অবস্থান করেন। সেখানে যুহর, আসর, মাগরিব, এশা এবং ফজর এ পাঁচ ওয়াক্তের সালাত আদায় করেন। অতঃপর সূর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। অতঃপর আরাফার দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং সেখানে যখন পৌঁছেন তখন ওয়াদীয়ে নামেরায় তাঁবু প্রস্তুত হয়েছিল। সেখানে তিনি অবতরণ করলেন। সূর্য যখন পশ্চিম দিকে ঢলে গেল তখন নাবী কারীম (ﷺ)-এর নির্দেশে কাসওয়া নামক উটের পিঠে হাওদা চাপানো হল। এরপর তিনি বাতনে ওয়াদীতে গমন করলেন। ঐ সময় নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে ছিলেন এক লক্ষ চল্লিশ কিংবা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের এক বিশাল জনতার ঢল। এ বিশাল জনতার উদ্দেশ্যে তিনি এক ঐতিহাসিক এবং মর্মস্পর্শী ভাষণ প্রদান করেন। সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন,

(أَيُّهَا النَّاسُ، اِسْمَعُوْا قَوْلِيْ، فَإِنِّيْ لَا أَدْرِيْ لَعَلِّيْ لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِيْ هٰذَا بِهٰذَا الْمَوْقِفِ أَبَداً)

'ওহে সমবেত লোকজনেরা! আমার কথা শোন। কারণ, আমি জানি না এরপর আর কোন দিন তোমাদের সঙ্গে এ স্থানে মিলিত হতে পারব কিনা।[4]

(إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا، فِيْ شَهْرِكُمْ هٰذَا، فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا. أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوْعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍّ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ - وَكَانَ مُسْتَرْضِعاً فِيْ بَنِيْ سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ - وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ مِنْ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوْعٌ كُلُّهُ).

তোমাদের রক্ত এবং তোমাদের ধন সম্পদ অন্যদের জন্য এমনিভাবে হারাম যেমনটি তোমাদের আজকের দিন, চলতি মাস এবং এ বরকতপূর্ণ শহরের হুরমত রয়েছে। শুনে রাখো, অন্ধকার যুগের প্রত্যেকটি রেওয়াজ রসম আমার পদতলে পিষ্ট হয়ে গেল। জাহেলিয়াত যুগের শোনিত প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি ঘটল। আমাদের রক্তের মধ্যে প্রথম রক্ত যা আমি নিঃশেষ করছি তা হচ্ছে রাবী'আহ বিন হারিসের ছেলের রক্ত। এ সন্তান বনু সা'দ গোত্রে দুগ্ধ পান করছিল এমন সময় হুজাইল গোত্র তাকে হত্যা করে। অন্ধকার যুগের সুদ শেষ করা হল এবং আমাদের সুদের মধ্যে প্রথম সুদ যা আমি শেষ করছি তা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের সুদ। এখন থেকে সুদের সকল প্রকার কাজ কারবার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হল।

(فَاتَّقُوْا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوْهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوْطِئَنَّ فِرَشَكُمْ أَحَداً تَكْرَهُوْنَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذٰلِكَ فَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ).

হ্যাঁ, মহিলাদের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় কর। কারণ, তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালেমার মাধ্যমে হালাল করে নিয়েছ। তাদের উপর তোমাদের প্রাপ্য হল তারা তোমাদের বিছানায় এমন কোন ব্যক্তিকে আনতে দেবে না যারা তোমাদের সহ্যের বাইরে হবে। যদি তারা এরূপ কোন অন্যায় করে বসে তাহলে তাদেরকে তোমরা মারধর করতে পারবে। কিন্তু গুরুতরভাবে আঘাত করবে না। তোমাদের উপর তাদের প্রাপ্য হল তোমরা তাদেরকে ন্যায়সঙ্গতভাবে খাওয়াবে ও পরাবে।

(وَقَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابُ اللهِ).

আমি তোমাদের মাঝে এমন এক জিনিস রেখে যাচ্ছি যা শক্ত করে ধরে রাখলে তোমরা কখনোও পথহারা হবে না এবং তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব।[5]

(أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ، وَلَا أُمَّةَ بَعْدَكُمْ، أَلَا فَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ، وَصَلُّوْا خَمْسَكُمْ، وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ، وَأَدُّوْا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، طَيِّبَةً بِهَا أَنْفُسُكُمْ، وَتَحُجُّوْنَ بَيْتِ رَبِّكُمْ، وَأَطِيْعُوْا أُوْلَاتِ أَمْرَكُمْ، تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبَّكُمْ)

হে লোকজনেরা! স্মরণ রেখ আমার পরে আর নাবী আসবে না। কাজেই তোমাদের পরে অন্য কোন উম্মতের প্রশ্নও থাকবে না। অতএব, আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত কর, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করো, রমাযান মাসে রোযা রেখো, সন্তুষ্ট চিত্তে নিজ সম্পদের যাকাত প্রদান করো, নিজ প্রভূর ঘরের হজ্জ পালন করো এবং সৎ নেতৃত্বের অনুসরণ করো। নিষ্ঠার সঙ্গে এ সব কাজ করলে ওয়াদা মোতাবেক জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

(وَأَنْتُمْ تَسْأَلُوْنَ عَنِّيْ، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُوْنَ؟)

আমার সম্পর্কে যদি তোমাদের জিজ্ঞেস করা হয় তখন তোমরা কী উত্তর দিবে?

সাহাবীগণ বললেন, ‘আমরা সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আপনার উপর অর্পিত দায়িত্ব আপনি যথাযথভাবে পালন করেছেন, ইসলামী দাওয়াতের যে আমানত আপনার উপর অর্পণ করা হয়েছিল তা যথাযথ ভাবে মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন এবং বান্দাদের জন্য কল্যাণ কামনার হক্ক আদায় করেছেন।

সাহাবীগণ (রাযি.)-এর মুখ থেকে এ কথা শ্রবণের পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শাহাদত আঙ্গুলটি আকাশের দিকে উত্তোলন করলেন এবং মানুষের দিকে তা নুইয়ে দিয়ে তিন বার বললেন,

(اللهم اشْهَدْ) (اللهم اشْهَدْ) (اللهم اشْهَدْ)

‘হে আল্লাহ সাক্ষী থাক, হে আল্লাহ সাক্ষী থাক, হে আল্লাহ সাক্ষ্য থাক।

নাবী কারীম (ﷺ)-এর বাণীসমূহকে রাবী'আহ বিন উমাইয়া বিন খালফ উচ্চৈঃস্বরে লোকজনদের নিকট পৌঁছে দিচ্ছিলেন।রাসূলে কারীম (ﷺ) যখন তাঁর ভাষণ হতে ফারেগ হলেন তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন,

(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيْنًا) [المائدة: 3]

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নি'মাত পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে কবূল করে নিলাম।' [আল-মায়িদাহ (৫) : ৩]

এ আয়াত শ্রবণ করা মাত্রই উমার (রাঃ) ক্রন্দন করতে লাগলেন। তাঁর ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, 'আমি এ জন্য কাঁদছি যে, আমরা এতো দিন দ্বীনের বৃদ্ধিই দেখছিলাম। এখন যেহেতু তা পূর্ণতা লাভ করলো সেহেতু পূর্ণতার পর তো তাতে আবার কেবল ঘাটতিই দেখা দিতে থাকে।

নাবী কারীম (ﷺ)-এর ভাষণের পর বিলাল (রাঃ) প্রথমে আযান এবং পরে ইকামত বললেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যুহরের সালাতে ইমামত করলেন। এরপর বিলাল (রাঃ) অবারও ইকামত করলেন। এ দু' সালাতের মধ্যে আর কোন সালাত পড়লেন না। এরপর সওয়ারীতে আরোহণ করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অবস্থান স্থলে গমন করলেন। নিজ উট ক্বাসওয়ার পেট পাথর সমূহের দিকে করলেন এবং হাবলে মুশাতকে (পদদলে যাতায়াতকারীগণের পথের মাঝে অবস্থিত স্তুপ) সামনে করলেন এবং ক্বিবলাহমুখী হয়ে নাবী কারীম (ﷺ) (একই অবস্থায়) অবস্থান করলেন। সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত এভাবে অবস্থান করলেন। সূর্যের অল্প অল্প হলুদ বর্ণ শেষ হল, আবার সূর্য মন্ডল অদৃশ্য হয়ে গেল। এর পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উসামা (রাঃ)-কে পিছনে বসিয়ে নিয়ে যাত্রা করলেন এবং মুযদালিফায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। মুযদালিফায় মাগরিব এবং এশার সালাত এক বৈঠকে দু' ইকামতের সঙ্গে আদায় করলেন। মধ্যে কোন নফল সালাত আদায় করেননি। এরপর নাবী কারীম (ﷺ) ঘুমিয়ে পড়লেন এবং সকাল পর্যন্ত ঘুমে কাটালেন। তবে সকাল হওয়া মাত্র আযান এবং ইকামত দিয়ে ফজরের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর ক্বাসওয়ার উপর সওয়ার হয়ে মাশয়ারে হারামে আগমন করলেন এবং কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর সমীপে দু'আ করলেন এবং তাকবীর, তাহলীল ও তাওহীদের বাণীসমূহ উচ্চারণ করলেন। অন্ধকার দূরীভূত হয়ে ফর্সা না হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করলেন। অতঃপর সূর্যোদয়ের পূর্বেই মীনা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলেন। এ সময় তাঁর পিছনে বসিয়েছিলেন ফাযল বিন আব্বাস (রাঃ)-কে। বাতনে মোহাসসারে গিয়ে যখন পৌঁছলেন তখন সাওয়ারীকে একটু দ্রুত খেদালেন।

আর মধ্যের পথ দিয়ে যা জামরায়ে কুবরার দিকে বের হয় সে পথ ধরে জামরায়ে কুবরার নিকট গিয়ে পৌঁছেন। ঐ সময় সেখানে একটি বৃক্ষ ছিল। এ বৃক্ষটির জন্যও জামরায়ে কুবরা প্রসিদ্ধ ছিল। তাছাড়া জামরায়ে কুবরাকে জামরায়ে 'আক্বাবাহ এবং জামরায়ে উলাও বলা হয়। নাবী

কারীম (ﷺ) জামরায়ে কুবরায় ৭টি কংকর নিক্ষেপ করেন। প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করছিলেন। কংকরগুলো আকারে এ রকম ছোট ছিল যে সেগুলোকে চিমটিতে ধরে নিক্ষেপ করা যাচ্ছিল। নাবী কারীম (ﷺ) বাতনে ওয়াদী হতে দাঁড়িয়ে কংকরগুলো নিক্ষেপ করেছিলেন। অতঃপর নাবী কারীম (ﷺ) কুরবানী স্থানে গিয়ে তাঁর মুবারক হাত দ্বারা ৬৩টি উট যবেহ করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নির্দেশক্রমে আলী (রাঃ) ৩৭টি উট যবেহ করেন। এভাবে এক শতটি উট কুরবানী করা হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আলী (রাঃ)-কে তাঁর কুরবানীতে শরিক করে নেন। এরপর নাবী কারীম (ﷺ)-এর নির্দেশে প্রত্যেকটি যবেহকৃত পশু হতে এক একটি অংশ কেটে নিয়ে রান্না করা হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং আলী (রাঃ) এ মাংস খান এবং ঝোল পান করেন।

অতঃপর আপন সওয়ারীতে আরোহণ করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মক্কা গমন করেন। মক্কা পৌঁছার পর তিনি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেন। এ তাওয়াফকে তাওয়াফে ইফাযা বলা হয়। তাওয়াফ শেষে যুহর সালাত আদায় করেন। সালাত শেষে জমজম কূপের নিকট বনু আব্দুল মুত্তালিবের পাশে গমন করেন। তাঁরা হাজীদেরকে জমজমের পানি পান করাচ্ছিলেন। তিনি বলেন,

(اِنْزِعُوْا بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَلَوْلَا أَنْ يُغَلِّبُكُمْ النَّاسُ عَلٰى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ)

‘বনু আব্দুল মুত্তালিব! তোমরা পানি উত্তোলন কর। যদি এ আশঙ্কা না থাকত যে পানি পান করানোর কাজে লোকজন তোমাদেরকে পরাজিত করে ফেলবে, তবে আমিও তোমাদের সঙ্গে পানি উত্তোলন করতাম। অর্থাৎ যদি সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে পানি উত্তোলন করতে দেখতেন তাহলে সাহাবীগণ নিজেরাই পানি উত্তোলনের চেষ্টা করতেন। এভাবে হাজীদেরকে পানি পান করানোর মর্যাদা ও সৌভাগ্য বনু মুত্তালিবেরই রয়ে গেল। অন্যথায় এ ব্যবস্থা তাঁদের আয়ত্বে আর থাকত না। কাজেই, বনু আব্দুল মুত্তালিব নাবী কারীম (ﷺ)-কে এক বালতি পানি উঠিয়ে দিলে তিনি তা হতে ইচ্ছানুযায়ী পান করলেন।

দিনটি ছিল যুল হিজ্জাহ মাসের ১০ তারিখ কুরবানীর দিন। এ দিবস সূর্য কিছুটা উপরে উঠল (চাশতের সময়) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এক ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণদানকালে তিনি খচ্চরের উপর আরোহিত অবস্থায় ছিলেন এবং আলী (রাঃ) তাঁর বাণীসমূহ সাহাবীগণ (রাঃ)-কে শুনিয়ে দিচ্ছিলেন। কিছু সংখ্যক সাহাবা (রাঃ) উপবিষ্ট অবস্থায় ছিলেন এবং কিছু সংখ্যক ছিলেন দন্ডায়মান অবস্থায়।[11] অদ্যকার ভাষণে নাবী কারীম (ﷺ) গত কালকের ভাষণের কিছু কিছু অংশের পুনরাবৃত্তি করেন। সহীহুল বুখারী এবং সহীহুল মুসলিমে আবূ বাকর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন ১০ই যুল হিজ্জাহ কুরবানীর দিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর ভাষণে আমাদের নিকট বলেন,

(إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ، السَّنَةُ اِثْنَا عَشَرَ شَهْراً، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ، ذُوْ الْقَعْدَةِ وَذُوْ الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِيْ بَيْنَ جُمَادٰي وَشَعْبَانَ)

‘আবর্তন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সময় সে দিনের প্রকৃতিতেই পৌঁছেছে যে দিন আসমান ও জমিনকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছিলেন। বার মাসে বছর হয়, যার মধ্যে চার মাস হল হারাম মাস। ক্রমাগতভাবে তিন অর্থাৎ যিকা’দাহ, যুল হিজ্জাহ এবং মুহাররম এবং একটি রজব মুযার যা জুমাদাল আখিরাহ এবং শাবানের মাঝে অবস্থিত।’

অতঃপর নাবী জিজ্ঞেস করলেন, ‘এটা কোন্ মাস? আমরা বললাম, ‘আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ﷺ) ভাল জানেন।’ এ প্রেক্ষিতে নাবী কারীম (ﷺ) নীরব থাকেন। এমনকি আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি হয়ত এর নাম অন্য কিছু রাখবেন। কিন্তু তিনি আবারও জিজ্ঞেস করলেন, ‘এ মাসটি কি যুল হিজ্জাহ নয়?’ আমরা বললাম, ‘তা কেন হবে না’? এর পর নাবী কারীম (ﷺ) বললেন, ‘এ শহরটি কোন্ শহর?’ আমরা বললাম, ‘আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ভাল জানেন।’ নাবী কারীম (ﷺ) নীরব থাকলেন। এমনকি আমরা ধারণা করতে থাকলাম যে এর নাম হয়তো অন্য কোন কিছু বলবেন। কিন্তু তিনি বললেন, ‘এ শহর কি মক্কা নয়’? আমরা বললাম তা কেন হবে না’? অর্থাৎ অবশ্যই তা। নাবী কারীম (ﷺ) আবার জিজ্ঞেস করলেন, ‘আচ্ছা তবে এ দিবসটি কোন্ দিবস’? আমরা বললাম, ‘আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ভাল জানেন’। এতে তিনি নীরব থাকলেন। এমনকি আমরা ধারণা করতে থাকলাম যে, এর নাম হয়তো অন্য কিছু বলবেন। কিন্তু তিনি বললেন, ‘এ দিনটি কি কুরবানীর দিন নয়’? অর্থাৎ ১০ই যুল হিজ্জাহ নয়’? আমরা বললাম অবশ্যই’। তিনি বললেন,

(فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا، فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا، فِيْ شَهْرِكُمْ هٰذَا)

‘তাহলে তোমরা জেনে রাখ যে, তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন সম্পদ এবং তোমাদের মান ইজ্জত পরস্পর পরস্পরের নিকট এমন পবিত্র তোমাদের এ শহর এবং তোমাদের এ মাস তোমাদের আজকের দিন যেমন পবিত্র।

(وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، أَلَا فَلَا تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ ضَلَالاً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ) (أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟)

তোমরা অতি শীঘ্রই আপন প্রতিপালক প্রভূর সঙ্গে সাক্ষাত করলে তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনি তোমাদের জিজ্ঞেস করবেন। অতএব, স্মরণ রেখো যেন আমার পরে পুনরায় পশ্চাদমুখীনতা অবলম্বনের মাধ্যমে পথভ্রষ্টতা হয়ে না যাও। অধিকন্তু তোমরা এমন কোন কাজে লিপ্ত হবে না যার ফলে পরস্পর পরস্পরের গ্রীবা কর্তন করবে। বল! আম কি তাবলীগের দায়িত্ব পালন করেছি?

সাহাবীগণ বললেন, ‘হ্যাঁ, অতঃপর নাবী কারীম (ﷺ) বললেন,

(اللهم اشْهَدْ، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعٰي مِنْ سَامِعٍ)

‘হে আল্লাহ সাক্ষী থাক’ যারা এখানে উপস্থিত তাদের কর্তব্য হবে অনুপস্থিতদের নিকট এ কথাগুলো পৌছে দেয়া কারণ ঐ অনুপস্থিতদের মধ্যে এমন কতগুলো লোক থাকবে যারা এ

উপস্থিত লোকদের কিছু সংখ্যকের তুলনায় দ্বীন সম্পর্কে অধিক মাত্রায় উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, এ ভাষণে নাবী কারীম (ﷺ) এ কথাও বলেছিলেন,

(أَلَا لَا يَجْنِيْ جَانٍ إِلَّا عَلٰى نَفْسِهِ، أَلَا لَا يَجْنِيْ جَانٍ عَلٰى وَلَدِهِ، وَلَا مَوْلُوْدٌ عَلٰى وَالِدِهِ، أَلَا إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يُعْبَدَ فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا أَبَداً، وَلٰكِنْ سَتَكُوْنُ لَهُ طَاعَةٌ فِيْمَا تَحْتَقِرُوْنَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَسَيَرْضٰى بِهِ)

স্মরণ রেখো! কোন অপরাধী নিজ অপরাধের দোষ অন্যের উপর আরোপ করতে পারবে না। (অর্থাৎ অপরাধের শাস্তি অপরাধীকে নিজেকেই ভোগ করতে হবে। অপরাধের জন্য নিজেকেই গ্রেফতার হতে হবে)। আরও স্মরণ রেখো! পিতার অপরাধের জন্য পুত্রকে কিংবা পুত্রের অপরাধের জন্য পিতাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে না। স্মরণ রেখো! শয়তান নিরাশ হয়ে পড়েছে এ কারণে যে, এখন থেকে তোমাদের এ শহরে আর কখনো তার পূজা করা হবে না। কিন্তু যে সব অন্যায় কাজকে তোমরা খুব তুচ্ছ মনে করবে ওতেই তার অনুসরণ করা হবে এবং সে তাতেই সন্তুষ্ট হবে।

এরপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) **১১, ১২,** ও **১৩** যুল হিজ্জাহ (আইয়ামে তাশরীক) মীনায় অবস্থান করেন। এ সময় তিনি হজ্জের নিয়ম কানুন পালন করতে থাকেন এবং লোকজনকে শরীয়তের আহবানগুলো শিক্ষা দিতে থাকেন ও আল্লাহর যিকির করতে থাকেন। অধিকন্তু ইবরাহীমী রীতিনীতির সুনানে হাদীসমূহ প্রতিষ্ঠা করতে থাকেন এবং শিরকের নিশানগুলো নিশ্চিহ্ন করতে থাকেন। নাবী কারীম (ﷺ) আইয়ামে তাশরীকেও ভাষণ প্রদান করেন। সুনানে আবী দাউদে হাসান সনদে বর্ণিত আছে সারায়া বিনতে নাবহান (রাঃ) বলেন যে, ‘রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে রউসের দিন ভাষণ দেন।[14] তিনি বলেন,(أَلَيْسَ هٰذَا أَوْسَطُ أَيَّامِ الْتَشْرِيْق)‘এটা আইয়ামে তাশরীকের মধ্য দিবস নয় কি?[15] নাবী কারীম (ﷺ)-এর আজকের ভাষণও গতকালের ভাষণের অনুরূপ ছিল। এ ভাষণ দেয়া হয়েছিল সূরাহ নাসর নাজিল হওয়ার পর। আইয়ামে তাশরীকের শেষে, দ্বিতীয় ইয়াওমুন নাফারে অর্থাৎ **১৩ই** যুল হিজ্জাহ তারিখে নাবী কারীম (ﷺ) মীনা হতে রওয়ানা হয়ে যান এবং ওয়াদীয়ে আবতাহ এর খাইফে বনু কিনানাহয় অবস্থায় করেন। দিনের অবশিষ্ট সময় এবং রাত্রি তিনি তথায় অতিবাহিত করেন এবং যুহর সালাত, আসর, মাগরিব ও এশার সালাত সেখানেই আদায় করেন। এশার সালাত শেষে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন এবং কিছুক্ষণ ঘুমানোর পর সওয়ারীতে আরোহণ করে বায়তুল্লাহ গমন করেন এবং তাওয়াফে বিদা’ আদায় করেন।

সকল মানুষ যখন হজ্জ (হজ্বের নিয়মাবলী) হতে ফারেগ হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আপন সওয়ারীকে মদীনা মনোয়ারাভিমুখী করলেন। তাঁর মদীনামুখী হওয়ার উদ্দেশ্য ছিল সেখানে গিয়ে আরাম আয়েশে গা ঢেলে দেয়া নয় বরং উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর দ্বীনের প্রয়োজনে আর এক নবতর প্রচেষ্টায় লিপ্ত হওয়া।

নবী জীবনের শেষ অধ্যায়

হজ্জ থেকে ফিরে যিলহজ্জের বাকী দিনগুলিসহ ১১ হিজরীর মুহাররম ও ছফর পুরা দু'মাস রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় অবস্থান করেন।

বিদায় হজ্জের সময় আরাফাতের ময়দানে ইসলাম পরিপূর্ণ হওয়ার বিখ্যাত আয়াতটি (মায়েদাহ ৫/৩)নাযিল হয়। যা ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ৮১ দিন পূর্বের ঘটনা। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, অতঃপর আইয়ামে তাশরীক্বের মধ্যবর্তী দিনে মিনায় 'সূরা নছর' নাযিল হয়। মৃত্যুর ৫০দিন পূর্বে নাযিল হয় কালালাহর বিখ্যাত আয়াতটি (নিসা ৪/১৭৬)। অতঃপর মৃত্যুর ৩৫ দিন পূর্বে নাযিল হয় সূরা তওবার সর্বশেষ দু'টি আয়াত-

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ، فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ-

'নিশ্চয় তোমাদের কাছে এসেছেন তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল, তোমাদের দুঃখ-কষ্ট যার উপরে কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল ও দয়ালু'। 'এসত্ত্বেও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দাও যে, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তাঁর উপরেই আমি ভরসা করি। তিনি মহান আরশের অধিপতি' (তওবা ৯/১২৮-১২৯)। অতঃপর মৃত্যুর ২১ দিন মতান্তরে ৭ দিন পূর্বে নাযিল হয় কুরআনের সর্বশেষ আয়াতটি-

وَاتَّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ-

'আর তোমরা ভয় কর সেই দিনকে, যেদিন তোমরা পুনরায় ফিরে যাবে আল্লাহর কাছে। অতঃপর প্রত্যেকেই তার কর্মফল পুরোপুরি পাবে। আর তাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না' (বাক্বারাহ ২/২৮১; কুরতুবী, তাফসীর সূরা নছর)।

বিদায়ের পূর্বলক্ষণ সমূহ

মূলতঃ সূরা নছর নাযিলের পরেই আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বুঝতে পারেন যে, সত্বর তাঁকে আখেরাতে পাড়ি দিতে হবে। তখন থেকেই যেন তার অদৃশ্য প্রস্ত্ততি শুরু হয়ে যায়। যেমন-

(১) আয়েশা (রাঃ) বলেন, সূরা নছর নাযিল হওয়ার পর থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এমন কোন ছালাত আদায় করেননি, যেখানে রুকূ ও সিজদায় নিম্নের দো'আটি পাঠ করতেন না। سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْلِى 'মহাপবিত্র তুমি হে আল্লাহ! আমাদের পালনকর্তা! তোমার জন্যই সকল প্রশংসা। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর'।

ইমাম কুরতুবী বলেন, وقيل: الاستغفارُ تَعَبُّدٌ يَجِبُ إِتْيَانَهُ، لاَ لِلْمَغْفِرَةِ، بَلْ تَعَبُّدًا 'ক্ষমা প্রার্থনা হ'ল দাসত্ব প্রকাশ করা, যা আল্লাহর নিকটে পেশ করা ওয়াজিব। এটি ক্ষমার জন্য নয় বরং অধিক দাসত্ব প্রকাশের জন্য' (কুরতুবী, তাফসীর সূরা নছর)।

(২) অন্যান্য বছর রামাযানের শেষে দশদিন ই'তিকাফে থাকলেও ১০ম হিজরীর রামাযানে তিনি ২০ দিন ই'তিকাফে থাকেন।[3]

(৩) অন্যান্য বছর জিব্রীল (আঃ) রামাযানে একবার সমস্ত কুরআন পেশ করলেও এ বছর সেটা দু'বার করেন। এর কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি প্রিয় কন্যা ফাতেমাকে বলেন, আমার মৃত্যু খুব নিকটে মনে হচ্ছে'।

(৪) ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের ভাষণের শুরুতেই তিনি বলেছিলেন, 'আল্লাহর কসম! আমি জানি না এ বছরের পর এই স্থানে তোমাদের সঙ্গে আর মিলিত হ'তে পারব কি-না' (নাসাঈ হা/৩০৬২)।

(৫) পরদিন মিনায় কুরবানীর দিনের ভাষণে জামরা আক্বাবায়ে কুবরায় তিনি বলেন, 'আমার নিকট থেকে তোমরা হজ্জ ও কুরবানীর(خُذُوا عَنِّى مَنَاسِكَكُم) নিয়ম-কানূনগুলি শিখে নাও। কারণ এ বছরের পর হয়তবা আমার পক্ষে আর হজ্জ করা সম্ভব হবে না।

(৬) মৃত্যু সন্নিকটে বুঝতে পেরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন ওহোদ প্রান্তে 'শোহাদা কবরস্থানে' গমন করেন এবং তাদের জন্য এমনভাবে দো'আ করেন যেন তিনি জীবিত ও মৃত সকলের নিকট থেকে চির বিদায় গ্রহণ করছেন। রাবী ওক্ববা বিন 'আমের (রাঃ) বলেন, আট বছর পরে রাসূল (ছাঃ) এই যিয়ারত করেন মৃতদের নিকট থেকে জীবিতদের বিদায় গ্রহণকারীর ন্যায়(كَالْمُوَدِّعِ لِلأَحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ)।[6]

(৭) শোহাদা কবরস্থান যিয়ারত শেষে মদীনায় ফিরে তিনি মসজিদে নববীর মিম্বরে বসে সমবেত জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন,

إِنِّى فَرَطٌ لَكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، إِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ وَإِنِّىْ وَاللهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِى الآنَ، وَإِنِّىْ أُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ، أَوْ مَفَاتِيْحَ الأَرْضِ، وَإِنِّىْ وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوْا بَعْدِى، وَلَكِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوْا فِيْهَا وزاد بعضهم: فَتَقْتَتِلُوْا فَتُهْلِكُوْا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

'আমি তোমাদের আগেই চলে যাচ্ছি এবং আমি তোমাদের উপরে সাক্ষ্য দানকারী হব। তোমাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে হাউয কাওছারে। আমি এখুনি আমার 'হাউয কাওছার' দেখতে পাচ্ছি। আমাকে পৃথিবীর সম্পদরাজির চাবিসমূহ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহর কসম! আমার এ ভয় নেই যে, আমার পরে তোমরা শিরকে লিপ্ত হবে। কিন্তু আমার আশংকা হয় যে, তোমরা দুনিয়া অর্জনে পরস্পরে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, অতঃপর তোমরা পরস্পরে লড়াই করবে এবং ধ্বংস হয়ে যাবে, যেমন তোমাদের পূর্বের লোকেরা ধ্বংস হয়ে গেছে'।

অসুখের সূচনা

ইবনু কাছীর বলেন, ছফর মাসের দু'একদিন বাকী থাকতে অথবা রবীউল আউয়াল মাসের প্রথম দিন অসুখের সূচনা হয় (আল-বিদায়াহ ৫/২২৪)। এদিন মধ্যরাতে রাসূল (ছাঃ) স্বীয় গোলাম আবু মুওয়াইহিবাহ(أَبُو مُوَيْهِبَةَ) কে সাথে নিয়ে বাক্বী' গোরস্থানে গমন করেন ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সেখান থেকে ফিরে আসার পর প্রচন্ড মাথাব্যথার মাধ্যমে অসুখের সূচনা হয়। যা মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত ছিল' (আহমাদ হা/১৬০৪০)।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমার কক্ষে প্রবেশ করলেন যেদিন তাঁর অসুখ শুরু হয়। তখন আমি বললাম, হায় মাথাব্যথা!... তিনি বললেন, আমারও প্রচন্ড মাথাব্যথা। অতঃপর তিনি বললেন,

ادْعُو إِلَيَّ أَبَاكِ وَأَخَاكِ حَتَّى أَكْتُبَ لأَبِى بَكْرٍ كِتَاباً فَإِنِّى أَخَافُ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ وَيَتَمَنَّى مُتَمَنٍّى أَنَا أَوْلَى. وَيَأْبَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلاَّ أَبَا بَكْرٍ ‘

তুমি তোমার পিতা ও ভাইকে আমার নিকটে ডেকে আনো। যাতে আমি আবুবকরের জন্য একটি কাগজ লিখে দিতে পারি। কেননা আমি ভয় পাচ্ছি যে, কোন ব্যক্তি বলবে বা কোন উচ্চাভিলাষী আকাংখা করবে যে, আমিই যোগ্য। অথচ আল্লাহ ও মুমিনগণ আবুবকর ব্যতীত অন্য সবাইকে প্রত্যাখ্যান করে’।অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, আয়েশা (রাঃ)-এর ঘরে থাকা অবস্থাতেই মাথাব্যথা শুরু হয় এবং একথাও প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (ছাঃ) অসুখের শুরুর দিনেই আবুবকর (রাঃ)-এর নামে খিলাফত লিখে দিতে চেয়েছিলেন।আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর গৃহে প্রবেশ করলাম। অতঃপর তাঁর দেহের উপর হাত রাখলাম। তখন তাঁর লেপের উপরেও তাপ অনুভূত হচ্ছিল। শরীর এত গরম ছিল যে, হাত পুড়ে যাচ্ছিল। এতে আমি বিস্ময়বোধ করলে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّا كَذَلِكَ يُضَعَّفُ لَنَا الْبَلاَءُ وَيُضَعَّفُ لَنَا الأَجْرُ. قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَىُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلاَءً قَالَ : الأَنْبِيَاءُ. قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ : ثُمَّ الصَّالِحُونَ، إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيُبْتَلَى بِالْفَقْرِ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُهُمْ إِلاَّ الْعَبَاءَةَ يُحَوِّيهَا، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ بِالْبَلاَءِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالرَّخَاءِ- رواه ابن ماجه-

‘এভাবে আমাদের কষ্ট দ্বিগুণ হয় এবং আমাদের পুরস্কারও দ্বিগুণ হয়। অতঃপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! দুনিয়াতে সবচেয়ে বিপদগ্রস্ত কারা? তিনি বললেন, নবীগণ। আমি বললাম, তারপর কারা? তিনি বললেন, নেককার ব্যক্তিগণ। এমনকি তাদের কেউ দারিদ্র্যের কষাঘাতে এমনভাবে জর্জরিত হবে যে, পোষাক হিসাবে মাথার ‘আবা’ (الْعَبَاءَةُ) ছাড়া কিছুই পাবে না। তাদের কেউ বিপদে পড়লে এমন খুশী হবে, যেমন তোমাদের কেউ প্রাচুর্য পেলে খুশী হয়ে থাক’।

তাঁর মোট অসুখের সময়কাল ছিল ১৩ অথবা ১৪ দিন। যার মধ্যে অধিকাংশ দিন তিনি মসজিদে এসে জামা‘আতে ইমামতি করেন। শেষের দিকে বৃহস্পতিবার এশা থেকে সোমবার ফজর পর্যন্ত ১৭ ওয়াক্ত ছালাতে আবুবকর (রাঃ) ইমামতি করেন

জীবনের শেষ সপ্তাহ

রাসূল (ছাঃ)-এর শারীরিক অবস্থার ক্রমেই অবনতি হ’তে থাকে। এ সময় তিনি বারবার স্ত্রীদের জিজ্ঞেস করতে থাকেন,أَيْنَ أَنَا غَدًا أَيْنَ أَنَا غَدًا ‘আগামীকাল আমি কোথায় থাকব? আগামীকাল আমি কোথায় থাকব’? তারা এর অর্থ বুঝতে পেরে বললেন, ‘আপনি যেখানে খুশী থাকতে পারেন’। তখন তিনি আয়েশার গৃহে গমন করেন। এ সময় তাঁর মাথায় পট্টি বাঁধা ছিল। ফযল

বিন আববাস ও আলী ইবনু আবী ত্বালেবের কাঁধে ভর করে অতি কষ্টে তিনি পা টিপে টিপে হাঁটছিলেন(تَخُطُّ قَدَمَاهُ)। অতঃপর তিনি আয়েশার কক্ষে প্রবেশ করেন এবং জীবনের শেষ সপ্তাহটি সেখানেই অতিবাহিত করেন।

অন্য সময় আয়েশা (রাঃ) সূরা ফালাক্ব ও নাস এবং অন্যান্য দো'আ, যা তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে শিখেছিলেন, সেগুলি পাঠ করে ফুঁক দিয়ে বরকতের আশায় রাসূল (ছাঃ)-এর হাত তাঁর দেহে বুলিয়ে দিতেন। এ সময় তিনি সেটাই করতে চাইলেন। কিন্তু নিজের হাত টেনে নিয়ে রাসূল (ছাঃ) বললেন,اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِىْ وَارْحَمْنِىْ وَأَلْحِقْنِىْ بِالرَّفِيْقِ الأَعْلَى 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে দয়া কর এবং আমাকে সর্বোচ্চ বন্ধুর সাথে মিলিত কর' (বুখারী হা/৫৬৭৪

মৃত্যুর পাঁচদিন পূর্বে

জীবনের শেষ বুধবার। এদিন তাঁর দেহের উত্তাপ ও মাথাব্যথা খুব বৃদ্ধি পায়। তাতে তিনি বারবার বেহুঁশ হয়ে পড়তে থাকেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, এ সময় তিনি ঘরের মধ্যে মিসরীয় খ্রিষ্টান দাসী মারিয়া ক্বিবত্বিয়াহ এবং হিজরতে থাকা অবস্থায় স্ত্রী উম্মে সালামাহ ও উম্মে হাবীবাহ হাবশাতে তাদের দেখা খ্রিষ্টান ধর্মনেতাদের কবর সমূহে তাদের প্রতিকৃতি আঁকিয়ে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কে আলোচনা করলে রাসূল (ছাঃ) মুখের চাদর ফেলে দিয়ে মাথা উঁচু করে বলেন,

إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا

'ওদের মধ্যে কোন নেককার মানুষ মারা গেলে তারা তার কবরের উপর মসজিদ বানাতো এবং তার মধ্যে তাদের ছবি আঁকতো। ওরা হ'ল ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকটে সৃষ্টিজগতের নিকৃষ্টতম জীব। আল্লাহ ইহূদী-নাছারাদের উপরে লা'নত করুন! তারা তাদের নবীগণের কবর সমূহকে সিজদার স্থানে পরিণত করেছে'।

সুলায়মান বিন ইয়াসার ও আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, তিনি আরও বলেন,

اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ، اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِد

'হে আল্লাহ! তুমি আমার কবরকে মূর্তি বানিয়ো না, যাকে পূজা করা হয়। ঐ কওমের উপরে আল্লাহর প্রচন্ড ক্রোধ রয়েছে, যারা নবীগণের কবরসমূহকে সিজদার স্থানে পরিণত করে'।কা'ব বিন মালেক (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنِّيْ أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ

'আমি তোমাদেরকে এ বিষয়ে নিষেধ করে যাচ্ছি'। দেখো, আমি কি তোমাদেরকে পৌঁছে দিলাম' (৩ বার)? হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক' (৩ বার)।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, অতঃপর তিনি বেহুঁশ হয়ে যান। কিছুক্ষণ পর হুঁশ ফিরলে তিনি বলেন, 'তোমরা বিভিন্ন কূয়া থেকে পানি এনে আমার উপরে সাত মশক পানি ঢাল। যাতে আমি বাইরে যেতে পারি এবং লোকদের উপদেশ দিতে পারি। অতঃপর আমরা তাঁকে হাফছা বিনতে ওমরের

পাথর অথবা তাম্র নির্মিত একটি বড় পাত্রের মধ্যে বসিয়ে দিলাম এবং তাঁর উপরে পানি ঢালতে লাগলাম। এক পর্যায়ে তিনি বলতে থাকেন,حَسْبُكُمْ حَسْبُكُمْ ‘ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও’। অতঃপর একটু হালকা বোধ করলে তিনি মাথায় কাপড় দিয়ে যোহরের প্রাক্কালে মসজিদে প্রবেশ করেন। অতঃপর ছালাত আদায় করেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন’।

এদিন বের হবার মূল কারণ ছিল আনছারদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখা। যেমন হযরত আনাস (রাঃ) বলেন যে, আবুবকর ও আববাস (রাঃ) আনছারদের এক মজলিসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় তাঁরা তাদেরকে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখতে পান। কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন যে, আমরা আমাদের সঙ্গে রাসূল (ছাঃ)-এর উঠাবসার কথা স্মরণ করছিলাম। অতঃপর তাঁদের একজন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে গিয়ে আনছারদের এই অভিব্যক্তির কথা অবহিত করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের প্রতি সহানুভূতি জানাতে চাদরের এক প্রান্ত মাথায় বাঁধা অবস্থায় ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন ও মিম্বরে আরোহন করেন। এদিনের পর তিনি আর মিম্বরে আরোহন করেননি’। অতঃপর সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন,

(১)أُوْصِيْكُمْ بِالأَنْصَارِ، فَإِنَّهُمْ كَرِشِى وَعَيْبَتِى، وَقَدْ قَضَوُا الَّذِى عَلَيْهِمْ، وَبَقِىَ الَّذِى لَهُمْ، فَاقْبَلُوْا مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَتَجَاوَزُوْا عَنْ مُسِيْئِهِمْ

‘আমি তোমাদেরকে আনছারদের বিষয়ে অছিয়ত করে যাচ্ছি। তারা আমার বিশ্বস্ত ও অন্তরঙ্গ। তারা তাদের দায়িত্ব সম্পূর্ণ করেছে। কিন্তু তাদের প্রাপ্য বাকী রয়েছে। অতএব তোমরা তাদের উত্তমগুলি গ্রহণ করো এবং মন্দগুলি ক্ষমা করে দিয়ো’।অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন,

فَإِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ وَيَقِلُّ الأَنْصَارُ، حَتَّى يَكُونُوا فِى النَّاسِ بِمَنْزِلَةِ الْمِلْحِ فِى الطَّعَامِ، فَمَنْ وَلِىَ مِنْكُمْ شَيْئًا يَضُرُّ فِيهِ قَوْمًا، وَيَنْفَعُ فِيهِ آخَرِينَ، فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيْئِهِم‘

মানুষ ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। কিন্তু আনছারদের সংখ্যা কমতে থাকবে। এমনকি তাদের অবস্থা হবে খাদ্যের মধ্যে লবনের ন্যায়(كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ)। অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কারু ক্ষতি বা উপকার করার মালিক হবে (অর্থাৎ নেতৃত্বে আসবে), সে যেন তাদের উত্তমগুলি গ্রহণ করে এবং মন্দগুলি ক্ষমা করে’।

(২) জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ আল-বাজালী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে তাঁর মৃত্যুর পাঁচ দিন পূর্বে বলতে শুনেছি,

إِنِّىْ أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِى مِنْكُمْ خَلِيْلٌ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِىْ خَلِيْلاً كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيْلاً وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِىْ خَلِيْلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيْلاً، لَكِنَّهُ أَخِيْ وَ صَاحِبِيْ، إِنَّ مِنْ أَمَنِّ النَّاسِ عَلَيَّ فِيْ صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُوْ بَكْرٍ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ، إِنِّيْ أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ-

‘আমি আল্লাহর নিকট দায়মুক্ত এজন্য যে, তিনি আমাকে তোমাদের মধ্যে কাউকে ‘বন্ধু’(خَلِيْل) হিসাবে গ্রহণ করার অনুমতি দেননি। কেননা আল্লাহ আমাকে ‘বন্ধু’ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। যেমন তিনি ইবরাহীমকে ‘বন্ধু’ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তবে যদি আমি আমার উম্মতের মধ্যে কাউকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতাম, তাহ’লে আবুবকরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম। কিন্তু তিনি

আমার ভাই ও সাথী। লোকদের মধ্যে নিজের সাহচর্য ও সম্পদ দিয়ে আমার প্রতি সর্বাধিক অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন আবুবকর। মনে রেখ, তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা তাদের নবী ও নেককার লোকদের কবর সমূহকে সিজদার স্থানে পরিণত করেছিল। তোমরা যেন এরূপ করো না'। আমি তোমাদেরকে এ বিষয়ে নিষেধ করে যাচ্ছি'।

(৩) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, একদিন তিনি মিম্বরে বসে আরও বলেন,

إِنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ، وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَه' ُ

একজন বান্দাকে আল্লাহ এখতিয়ার দিয়েছেন যে, সে চাইলে দুনিয়ার জাঁকজমক সবকিছু তাকে দেওয়া হবে অথবা আল্লাহর নিকটে যা আছে তা সে গ্রহণ করবে। অতঃপর সে বান্দা সেটাকেই পসন্দ করেছে, যা আল্লাহর নিকটে রয়েছে'। একথার তাৎপর্য বুঝতে পেরে আবুবকর (রাঃ) কেঁদে উঠে বললেন,

فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا '

আমাদের পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গীত হৌন'।[৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে,وَأَنْفُسِنَا وَأَمْوَالِنَا 'আমাদের জীবন ও সম্পদ সমূহ'।রাবী বলেন, আমি মনে মনে বললাম, এই শায়খ কাঁদছেন কেন? এতে কাঁদবার কি আছে? বস্ত্ততঃ 'আবুবকর ছিলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি' (وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ أَعْلَمُنَا)।

অতঃপর তিনি বললেন,

يَا أَبَا بَكْرٍ لاَ تَبْكِ، إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِى صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً مِنْ أُمَّتِى لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الإِسْلاَمِ وَمَوَدَّتُهُ، لاَ يَبْقَيَنَّ فِى الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلاَّ سُدَّ إِلاَّ بَابُ أَبِى بَكْرٍ' ٍ

হে আবুবকর! তুমি কেঁদো না। নিশ্চয় লোকদের মধ্যে সাহচর্য ও সম্পদ দিয়ে আমার প্রতি সর্বাধিক অনুগ্রহ করেছেন আবুবকর। যদি আমি উম্মতের মধ্যে কাউকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতাম, তাহ'লে আবুবকরকেই করতাম। কিন্তু ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসাই উত্তম। আর মসজিদের সকল দরজা বন্ধ হবে কেবল আবুবকরের দরজা ব্যতীত'।

মৃত্যুর চার দিন পূর্বে শেষ বৃহস্পতিবার

বৃহস্পতিবার রাসূল (ছাঃ)-এর রোগযন্ত্রণা বেড়ে যায়। পরে যন্ত্রণা খুব বৃদ্ধি পেলে রাসূল (ছাঃ) বলে ওঠেন,

هَلُمُّوا أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّوْا بَعْدَه ُ '

কাগজ-কলম নিয়ে এসো! আমি তোমাদের জন্য লিখে দিয়ে যাই। যাতে তোমরা পরে পথভ্রষ্ট না হও'। উপস্থিত লোকদের মধ্যে ওমর (রাঃ) বললেন,

قَدْ غَلَبَهُ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ، حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ

'তাঁর উপরে এখন রোগ যন্ত্রণা বেড়ে গেছে। তোমাদের নিকটে কুরআন রয়েছে। আমাদের জন্য আল্লাহর কিতাবই যথেষ্ট'। এতে গৃহবাসীদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়ে গেল। কেউ কাগজ-

কলম আনতে চান। কেউ নিষেধ করেন। ফলে এক পর্যায়ে রাসূল (ছাঃ) বললেন,قُوْمُوْا عَنِّى 'তোমরা এখান থেকে চলে যাও'।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর মৃত্যুকালীন রোগশয্যায় আমাকে বললেন,

ادْعِى لِى أَبَا بَكْرٍ وَأَخَاكِ حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا فَإِنِّى أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ وَيَقُولَ قَائِلٌ أَنَا أَوْلَى. وَيَأْبَى اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلاَّ أَبَا بَكْرٍ

'তোমার পিতা আবুবকর ও তোমার ভাই (আব্দুর রহমান)-কে আমার কাছে ডেকে আন। আমি তাদেরকে একটি কাগজ লিখে দেব। কেননা আমি ভয় পাচ্ছি যে, কোন উচ্চাভিলাষী (খেলাফতের) উচ্চাকাংখা পোষণ করতে পারে এবং কোন ব্যক্তি দাবী করতে পারে যে, আমিই এর অধিক হকদার(أَنَا أَوْلَى)। অথচ আল্লাহ ও মুমিনগণ আবুবকর ব্যতীত অন্য সবাইকে প্রত্যাখ্যান করে'। এতে বুঝা যায় যে, খিলাফত লিখে দিলে তিনি আবুবকর (রাঃ)-এর নামেই লিখতেন। আয়েশা (রাঃ)-এর বাধার কারণেই সেটা সম্ভব হয়নি। অথচ আলী (রাঃ) প্রথম খলীফা না হওয়ার জন্য শী'আরা অন্যায়ভাবে তাঁকেই দায়ী করে থাকে।

তিনটি অছিয়ত

অতঃপর আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) সবাইকে তিনটি অছিয়ত করেন।-

(১) ইহূদী, নাছারা ও মুশরিকদের আরব উপদ্বীপ থেকে বের করে দিয়ো।

(২) প্রতিনিধিদলের সম্মান ও আপ্যায়ন অনুরূপভাবে করো, যেভাবে আমি করতাম।

(৩) তৃতীয় অছিয়তটির কথা রাবী সুলায়মান আল-আহওয়ালের বর্ণনায় আসেনি' (বুখারী হা/৩১৬৮)। তবে ছহীহ বুখারীর 'অছিয়ত সমূহ' অধ্যায়ে আব্দুল্লাহ বিন আবু 'আওফা (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে যে, সেটি ছিল আল্লাহর কিতাবকে আঁকড়ে ধরো' (বুখারী হা/২৭৪০)

সর্বশেষ ইমামতি

মৃত্যুর চারদিন পূর্বে বৃহস্পতিবার মাগরিবের ছালাতের ইমামতিই ছিল তাঁর জীবনের সর্বশেষ ইমামতি। অসুখ সত্ত্বেও তিনি এযাবত প্রতি ওয়াক্ত ছালাতে ইমামতি করেছেন। সর্বশেষ এই ইমামতিতে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) প্রথম দু'রাক'আতে সূরা মুরসালাত পাঠ করেন'। যার সর্বশেষ আয়াত ছিল

فَبِأَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُوْنَ

'এর পরে কোন্ বাণীর উপরে তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করবে'? (মুরসালাত ৭৭/৫০)। অর্থাৎ কুরআনের পরে আর কোন্ কালামের উপরে তোমরা ঈমান আনবে?

এর দ্বারা যেন তিনি ইঙ্গিত করলেন যে, আল্লাহ পাকের আহবানের সাথে সাথে উম্মতে মুহাম্মাদীর প্রতি আমার জীবনের সর্বশেষ আহবান হ'ল, সর্বাবস্থায় তোমরা কুরআনের বিধান মেনে চলবে। কোন অবস্থাতেই কুরআন ছেড়ে অন্য কিছু গ্রহণ করবে না।

আবু বকরের ইমামতি শুরু

এশার ছালাতের জন্য আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) তিনবার ওযূ করেন ও তিনবার অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। অবশেষে ব্যর্থ হয়ে আবুবকরকে ইমামতি করার নির্দেশ পাঠান। এরপর থেকে রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যু পর্যন্ত আবুবকর (রাঃ) একটানা ১৭ ওয়াক্ত ছালাতের ইমামতি করেন।লোকেরা খারাপ ধারণা করবে মনে করে আয়েশা (রাঃ) তিন থেকে চারবার তার পিতার ইমামতির ব্যাপারে আপত্তি তুলে অন্যকে ইমামতির দায়িত্ব প্রদানের অনুরোধ করেন। কিন্তু আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) উক্ত অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে বলেন,

إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ، مُرُوْا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ‘তোমরা ইউসুফের সহচরীদের মত হয়ে গেছ। আবুবকরকে বলে দাও যেন সে ছালাতে ইমামতি করে’।[2] অর্থাৎ যুলায়খা ও তার সহচরী মহিলারা যেভাবে ইউসুফকে অন্যায় কাজে প্রলুব্ধ করতে চেয়েছিল, তোমরাও তেমনি আমাকে আবুবকরকে বাদ দিয়ে অন্যকে ইমামতি করার মত অন্যায় নির্দেশ দানে প্ররোচিত করতে চাও? এর মাধ্যমে ভবিষ্যৎ খেলাফতের জন্য আবুবকরের প্রতি ইঙ্গিত ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) সেটা বুঝতে পেরেই সম্ভবতঃ তাঁর নাম খলীফা হিসাবে প্রস্তাব করেছিলেন এবং সাথে সাথেই সর্বসম্মতভাবে তা গৃহীত ও অভিনন্দিত হয়। তাছাড়া তাঁর তুলনীয় ব্যক্তিত্ব উম্মতের মধ্যে তখনও কেউ ছিল না। ভবিষ্যতেও হবে না।

মৃত্যুর দু’দিন পূর্বে সর্বশেষ সামরিক অভিযান প্রেরণ

শনিবারে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) কিছুটা হালকা বোধ করেন।এমতাবস্থায় তিনি দু’জনের কাঁধে ভর করে মসজিদে আগমন করেন। তখন আবুবকর (রাঃ)-এর ইমামতিতে যোহরের জামা‘আত শুরু হয়েছিল। রাসূল (ছাঃ)-এর আগমন টের পেয়ে আবুবকর (রাঃ) পিছিয়ে আসার উদ্যোগ নিতেই আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) তাকে ইঙ্গিতে নিষেধ করলেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-কে আবুবকর (রাঃ)-এর বামপাশে বসিয়ে দেওয়া হ’ল। তিনি তখন রাসূল (ছাঃ)-এর ইক্বতেদা করতে থাকেন এবং লোকদেরকে তাকবীর শুনাতে থাকেন’।বস্ত্ততঃ এটাই ছিল ছালাতে মুকাবিবর হওয়ার প্রথম ঘটনা। আর আবুবকর (রাঃ) ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে প্রথম ‘মুকাবিবর’।

তাছাড়া এদিন তিনি উসামাহ বিন যায়েদ-এর নেতৃত্বে শাম অঞ্চলে সর্বশেষ সেনাদল প্রেরণ করেন (দ্রঃ সারিইয়া ক্রমিক ৯০)।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ -

(১) উম্মতের প্রতি তীব্র দায়িত্বানুভূতির কারণে মৃত্যুর প্রাক্কালে রাসূল (ছাঃ) গুরুত্বপূর্ণ দু’টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রথমটি ছিল তাঁর পরবর্তী খলীফা নির্বাচন বিষয়ে ইঙ্গিত প্রদান। কারণ নেতৃত্বের ঐক্য ব্যতীত জাতির ঐক্য সম্ভব নয়। এজন্য আবুবকর (রাঃ)-এর ব্যাপারে তাঁর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ও আচরণসমূহ থাকা সত্ত্বেও তিনি সেটি লিখে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। তাই লেখা সম্ভব হয়নি। অবশেষে তাঁর আগ্রহই কার্যকর হয় এবং আবুবকর (রাঃ) সর্বসম্মতভাবে উম্মতের ‘খলীফা’ নির্বাচিত হন। এতে নির্দেশনা রয়েছে যে, ইসলামে আমীর

নির্বাচনের সর্বোত্তম পদ্ধতি হ'ল পূর্বতন আমীরের অছিয়ত। যা পরে আবুবকর (রাঃ) ওমর (রাঃ)-এর ব্যাপারে করেছিলেন। অথবা উম্মতের সেরা ব্যক্তিদের মধ্য হ'তে পূর্বতন আমীরের বাছাইকৃত ব্যক্তিগণের একজন। যা সেরা ব্যক্তিগণের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে। যেমন ওমর ফারূক (রাঃ) করে গিয়েছিলেন। (দ্রঃ লেখক প্রণীত 'ইসলামী খিলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন' বই)।

(২) দ্বিতীয়টি ছিল বহিঃশত্রুর হাত থেকে ইসলামী খিলাফতকে রক্ষার জন্য শত্রুর বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনার নির্দেশ দান। এর মাধ্যমে তিনি নিজের মৃত্যুর চাইতে উম্মতের নিরাপত্তাকেই অধিক গুরুত্ব দেন। যা পরবর্তী খলীফাদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসাবে রয়ে যায়।

(৩) রাসূল (ছাঃ)-এর এই দায়িত্ব সচেতন কর্মকান্ডের মধ্যে যেকোন দায়িত্বশীল মুমিন ব্যক্তির জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। কারণ প্রত্যেকেই ক্বিয়ামতের দিন স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে (মুসলিম হা/১৮২৯ (২০)।

মৃত্যুর একদিন পূর্বে

সম্ভবতঃ মৃত্যুর পূর্বদিন রবিবার তিনি স্ত্রী আয়েশাকে বলেন, দীনারগুলি কি বিতরণ করেছ? তিনি বললেন, আপনার রোগ যন্ত্রণায় ব্যস্ত থাকার কারণে বিতরণের সময় পাইনি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, ওগুলি আমার কাছে নিয়ে এস। ঐ সময় ঘরে ৫ থেকে ৯টি স্বর্ণমুদ্রা ছিল। আয়েশা (রাঃ) সেগুলি এনে তাঁর হাতে দিলেন।তখন তিনি বললেন, এগুলি এখুনি বিতরণ করে দাও। কেননা কোন নবীর জন্য এটি মর্যাদাকর নয় যে, এইরূপ (নিকৃষ্ট) বস্তুগুলি নিয়ে তিনি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবেন'।অথচ ঐ সময় রাসূল (ছাঃ)-এর লৌহবর্মটি এক ইহূদীর নিকটে ৩০ ছা' (৭৫ কেজি) যবের বিনিময়ে বন্ধক ছিল।

জীবনের শেষ দিন

সোমবার ফজরের জামা'আত চলা অবস্থায় আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) ঘরের পর্দা উঠিয়ে একদৃষ্টে মসজিদে জামা'আতের দিকে তাকিয়ে থাকেন। এতে তাঁর চেহারা খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং ঠোটে মুচকি হাসির রেখা ফুটে ওঠে। রাসূল (ছাঃ)-এর জামা'আতে আসার আগ্রহ বুঝতে পেরে আবুবকর (রাঃ) পিছিয়ে আসতে চান। কিন্তু আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) ইশারায় তাঁকে থামিয়ে দেন এবং দরজার পর্দা ঝুলিয়ে দেন। রাবী আনাস বিন মালেক (রাঃ)-এর ভাষায় 'ঐ সময় রাসূল (ছাঃ)-এর চেহারা ছিল যেন 'কুরআনের পাতা'(كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ)। অতঃপর এদিনই তিনি মৃত্যুবরণ করেন'।

কুরআনের বাস্তব রূপকার, মৃত্যুপথযাত্রী রাসূল (ছাঃ)-এর শুচিশুদ্ধ আলোকময় চেহারা যেন পরম পবিত্র সত্যসন্ধ কুরআনের কনকোজ্জ্বল পৃষ্ঠার ন্যায় দীপ্ত ও জ্যোতির্ময় দেখাচ্ছিল। আনাস (রাঃ)-এর এই অপূর্ব তুলনা সত্যি কতই না সুন্দর ও কতই না মনোহর! ছালাতের পাগল রাসূল (ছাঃ)-এর ভাগ্যে যোহরের ওয়াক্ত আসার সুযোগ আর হয়নি।...

এরপর সূর্য কিছুটা উপরে উঠলে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) প্রাণপ্রিয় কন্যা ফাতেমাকে কাছে ডাকেন এবং কানে কানে কিছু কথা বলেন। তাতে তিনি কাঁদতে থাকেন। পরে তাকে আবার ডাকেন এবং কানে কানে কিছু কথা বলেন। তাতে তিনি হেসে ওঠেন। প্রথমবারে রাসূল (ছাঃ) তাকে বলেন যে, এই অসুখেই আমার মৃত্যু ঘটবে। তাতে তিনি কাঁদেন। দ্বিতীয়বারে তিনি বলেন যে, পরিবারের মধ্যে তুমিই প্রথম আমার সাথে মিলিত হবে (অর্থাৎ তোমার মৃত্যু হবে)। তাতে তিনি হাসেন।এই সময় আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) তাঁকে 'জান্নাতী মহিলাদের নেত্রী'سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ হবার সুসংবাদ দান করেন।অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর রোগ-যন্ত্রণার কষ্ট দেখে ফাতেমা (রাঃ) বলে ওঠেন,وَاكَرْبَاهُ 'হায় কষ্ট'! রাসূল (ছাঃ) তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন,

لَيْسَ عَلَى أَبِيْكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ

'আজকের দিনের পর তোমার পিতার আর কোন কষ্ট নেই'।

অতঃপর তিনি হাসান ও হোসায়েনকে ডাকেন। তাদেরকে আদর করে চুমু দেন ও তাদেরকে সদুপদেশ দেন। উভয়ের বয়স তখন যথাক্রমে ৮ ও ৭ বছর। এরপর স্ত্রীগণকে ডাকেন ও তাদেরকে বিভিন্ন উপদেশ দেন। এ সময় তাঁর রোগ-যন্ত্রণা তীব্র আকার ধারণ করে। তিনি আয়েশা (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'হে আয়েশা! খায়বরে যে বিষমিশ্রিত খাদ্য আমি খেয়েছিলাম, সে বিষের প্রভাবে আমার শিরা-উপশিরা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে'।তিনি গিলেননি, ফেলে দিয়েছিলেন। তাতেই যে সামান্য বিষক্রিয়া হয়, সেটিই মৃত্যুকালে তাঁকে কঠিনভাবে কষ্ট দেয়। আর এটাই স্বাভাবিক যে, পুরানো কোন অসুখ যা সুপ্ত থাকে, তা বার্ধক্যে বা মৃত্যুকালে মাথা চাড়া দেয়।

উল্লেখ্য যে, ৭ম হিজরীর মুহাররম মাসে খায়বর বিজয় শেষে ইহূদী বনু নাযীর গোত্রের নেতা সাল্লাম বিন মিশকামের স্ত্রী যয়নব বিনতুল হারেছ তাঁকে দাওয়াত দিয়ে বিষমিশ্রিত বকরীর ভুনা রান খেতে দেয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেই মাংস মুখে দিয়ে চিবানোর পর না গিলে ফেলে দেন(فَلَمْ يُسِغْهَا، وَلَفَظَهَا) এবং বলেন, এই হাড্ডি আমাকে বলছে যে এতে বিষ মিশানো আছে'।অতঃপর তিনি উপস্থিত সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

الصَّلاَةُ الصَّلاَةُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ' ْ

ছালাত ছালাত এবং তোমাদের দাস-দাসী' অর্থাৎ ছালাত ও স্ত্রীজাতির বিষয়ে তোমরা সর্বাধিক খেয়াল রেখো'। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একথাটি তিনি বারবার পুনরাবৃত্তি করেন'। আনাস (রাঃ) বলেন, এটিই ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর সর্বশেষ অছিয়ত'।

মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু

এরপর মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হ'ল। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্ত্রী আয়েশার বুকে ও কাঁধে ঠেস দিয়ে বসা অবস্থায় ছিলেন। এমন সময় আয়েশা (রাঃ)-এর ভাই আব্দুর রহমান (রাঃ) সেখানে উপস্থিত হন। তার হাতে কাঁচা মিসওয়াক দেখে সেদিকে রাসূল (ছাঃ)-এর দৃষ্টি গেল। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি তাঁর আগ্রহ বুঝতে পেরে তাঁর অনুমতি নিয়ে মিসওয়াকটি চিবিয়ে নরম করে তাঁকে দিলাম। তখন তিনি সুন্দরভাবে মিসওয়াক করলেন ও পাশে রাখা পাত্রে হাত ডুবিয়ে (কুলি সহ) মুখ ধৌত করলেন। এসময় তিনি বলতে থাকেন,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ

'আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। নিশ্চয়ই মৃত্যুর রয়েছে কঠিন যন্ত্রণা সমূহ'।এমন সময় তিনি ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে হাত কিংবা আঙ্গুল উঁচিয়ে বলতে থাকলেন,

مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيْقًا، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَأَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الْأَعْلَى، اللَّهُمَّ الرَّفِيْقَ الْأَعْلَى-

'(হে আল্লাহ!) নবীগণ, ছিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং নেককার ব্যক্তিগণ যাদের তুমি পুরস্কৃত করেছ, আমাকে তাদের সাথী করে নাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর ও দয়া কর এবং আমাকে আমার সর্বোচ্চ বন্ধুর সাথে মিলিত কর। হে আল্লাহ! আমার সর্বোচ্চ বন্ধু!' আয়েশা (রাঃ) বলেন, শেষের কথাটি তিনি তিনবার বলেন। অতঃপর তাঁর হাত এলিয়ে পড়ল, দৃষ্টি নিথর হয়ে গেল'। তিনি সর্বোচ্চ বন্ধুর সাথে মিলিত হ'লেন।আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমার উপর আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ এই যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার ঘরে, আমার পালার দিন এবং আমার বুক ও গলার মধ্যে হেলান দেওয়া অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। আর তাঁর মৃত্যুর পূর্বক্ষণে পার্থিব জীবনের শেষ দিন ও পরকালীন জীবনের প্রথম দিন আল্লাহ আমার মুখের লালার সাথে তাঁর মুখের লালা মিলিয়ে দিয়েছেন। আর আমার ঘরেই তাঁর দাফন হয়েছে'।

আয়েশা (রাঃ) থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, যখন মৃত্যু ঘনিয়ে এল, তখন তাঁর মাথা ছিল আমার রানের উপর, তিনি বেহুঁশ হয়ে গেলেন। তারপর হুঁশ ফিরে এল। তখন তিনি ছাদের দিকে চক্ষু নিবদ্ধ করলেন। অতঃপর বললেন, اللَّهُمَّ الرَّفِيْقَ الْأَعْلَي 'হে আল্লাহ! হে সর্বোচ্চ বন্ধু'! আর এটাই ছিল তাঁর শেষ কথা। আয়েশা (রাঃ) বলেন, এর দ্বারা আমি বুঝলাম, এখন তিনি আর আমাদের পসন্দ করবেন না। বুঝলাম, যে কথা তিনি সুস্থ অবস্থায় বলতেন, সেটাই ঠিক হ'ল। তা এই যে,

'لَنْ يُقْبَضَ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيَّر

কোন নবী মৃত্যুবরণ করেন না, যতক্ষণ না জান্নাতে তাঁর ঠিকানা দেখানো হয়। অতঃপর তাঁকে এখতিয়ার দেওয়া হয় দুনিয়ায় বেঁচে থাকার অথবা মৃত্যুবরণ করে জান্নাতে যাওয়ার'। আমি বুঝলাম যে, তিনি আখেরাতকেই পসন্দ করলেন।অতঃপর আমি তাঁর মাথা বালিশে রাখি এবং

অন্যান্য মহিলাদের সাথে কাঁদতে কাঁদতে উঠে আসি' (ইবনু হিশাম ২/৬৫৫)। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'ঊন (আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী; (বাক্বারাহ ২/১৫৬)।

উপরোক্ত দুই বর্ণনার সমন্বয় এটাই হ'তে পারে যে, বুকের উপরে মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত হ'লে তিনি তাঁকে স্বীয় রানের উপরে শুইয়ে দেন এবং তখনই রাসূল (ছাঃ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দিনটি ছিল সোমবার (বুখারী হা/১৩৮৭) সূর্য অধিক গরম হওয়ার সময়(حِينَ اشْتَدَّتِ الضحي) অর্থাৎ ১০/১১ টার সময়। এ দিন তাঁর বয়স হয়েছিল চান্দ্রবর্ষ হিসাবে ৬৩ বছর (বুখারী হা/৩৫৩৬)[5] চার দিন (রহমাতুল্লিল 'আলামীন ১/২৫১)।

উমার রাঃ এর অবস্থাঃ

আল্লাহর রাসুলের ইন্তিকালের সংবাদ প্রচারিত হয়ে গেলে উমর ইবনুল খাত্তাব রাঃ নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন না। তার হুঁশ বুদ্ধি সাময়িকভাবে লোপ পেয়ে গেল। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করলেন, "কিছুসংখ্যক মুনাফিক মনে করছে, আল্লাহর রাসূল মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু আসল ব্যাপার হচ্ছে, তিনি মৃত্যুবরণ করেননি। বরং তিনি তার রবের নিকটে গিয়েছেন, যেমন মুসা আঃ গিয়েছিলেন। মূসা আঃ তার সম্প্রদায়ের নিকট থেকে চল্লিশ রাত্রি অনুপস্থিত থাকার পর পুনরায় ফিরে এসেছিলেন। অথচ তার ফিরে আসার পূর্বে বলা হতো যে, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। আল্লাহর কসম, রাসুলুল্লাহ ফিরে আসবেন। আর ঐ সকল লোকের হাত পা কেটে দেবেন, যারা মনে করে যে প্রকৃতই তাঁর মৃত্যু হয়েছে"।

আবু বকর রাঃ এর বিচক্ষণ জবাব ও নেতৃত্বঃ

আল্লাহ রাসুলের ইন্তেকালের খবর পেয়ে আবুবকর নিজ বাড়ি সুনহ থেকে ঘোড়ায় চড়ে মসজিদে নববীতে আসলেন। এরপর মানুষের সাথে কোনো কথাবার্তা না বলে সরাসরি আয়েশার ঘরে চলে গেলেন। রাসুলের দেহ মোবারক তখনও ইয়ামানী চাদরে ঢাকা ছিল। আবু বকর রাসূলের পবিত্র মুখ থেকে চাদর সরিয়ে তাতে চুম্বন করলেন এবং কাঁদতে শুরু করলেন। এরপর বললেন, "আমার পিতা মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। আল্লাহ আপনার জন্য দু'বার মৃত্যু দেবেন না। যে মৃত্যু আপনার ভাগ্যে ছিল তা এসে গেছে"।

এরপর তিনি সেখান থেকে বাইরে বের হয়ে আসলেন। হযরত উমার রাঃ সে সময় লোকদের সাথে কথাবার্তা বলছিলেন। আবুবকর রাঃ তাকে বললেন, 'উমার, বসো'। কিন্তু উমার রাঃ বসতে অস্বীকার করলেন। এদিকে সাহাবীগণ হযরত উমারকে ছেড়ে দিয়ে আবু বকরের কাছে চলে আসলেন।

আবু বকর রাঃ বললেন, "আল্লাহর রাসূলের প্রস্থানের পর তোমাদের মধ্যে যারা মুহাম্মাদের পূজা করছিল, তারা জেনে রাখুক যে, মুহাম্মাদ মৃত্যুবরণ করেছেন। আর যারা আল্লাহর ইবাদত করছিল, তারা জেনে রাখুক, আল্লাহ সর্বদা জীবিত। তিনি কখনও মৃত্যুবরণ করবেন না"। এরপর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন-

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

অর্থঃ আর মুহাম্মদ একজন রসূল বৈ তো নয়! তাঁর পূর্বেও বহু রসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুতঃ কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাদের সওয়াব দান করবেন। (সূরা আলে ইমরান, ৩:১৪৪)

যে সাহাবায়ে কেরাম এতক্ষণ সীমাহীন দুঃখ বেদনায় কাতর হয়ে গিয়েছিলেন, আবু বকরের এই ভাষণ শোনার পর তারা নিশ্চিত হলেন যে, রাসূলুল্লাহ প্রকৃতই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। আব্বাস রাঃ বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর কসম, এই ব্যাপারটি এমন মনে হচ্ছিল যে, লোকজনেরা যেন জানতোই না যে, আল্লাহ এই আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। আবু বকর রাঃ যখন আয়াতটি পাঠ করলেন তখন সকলেই যেন এ সম্পর্কে নতুনভাবে জানলেন'। সকলকে এই আয়াত তিলাওয়াত করতে দেখা গেল।

সাইয়্যেদ বিন মুসাইব রাঃ বলেছেন, 'উমার রাঃ বলেছেন, আল্লাহর কসম, আমি যখন আবু বকরকে পবিত্র কুরআনের এই আয়াত পাঠ করতে শুনলাম, তখন আমি অত্যন্ত লজ্জিত বোধ করলাম। এমনকি আমি দাঁড়াতে পারছিলাম না। আমার পা উঠানো সম্ভব হচ্ছিল না। এমনকি আবু বকরকে এই আয়াত পাঠ করতে শুনে আমি মাটির দিকে গড়িয়ে পড়লাম। কারণ, তখন আমি অনুভব করতে পারলাম যে, রাসূল প্রকৃতই ইন্তেকাল করেছেন'।

রাসুল সাঃ এর ইন্তিকালের মুহূর্তে এই আয়াত উপস্থাপন করা আবু বকর সিদ্দিক রাঃ এর বীরত্ব, সাহসিকতা এবং নেতৃত্বগুণের এক অসাধারণ বহিঃপ্রকাশ। মূলত নেতৃত্বের যোগ্যতা পরীক্ষিত হয় বিপদের মুহূর্তে আর রাসুলের ইন্তেকাল এর চেয়ে ভয়াবহ বিপদ এই মুসলিম উম্মাহর মধ্যে কখনোই আসা সম্ভব নয়। অথচ সেই ভয়াবহ মুহূর্তেও তিনি ছিলেন স্থির ও বলিষ্ঠ। রাসূল সাঃ এর ইন্তিকালের খবরে উসমান রাঃ বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন, শোকে স্তব্ধ হয়ে আলী রাঃ আত্মগোপনে চলে গিয়েছিলেন, উমার রাঃ প্রলাপ বকছিলেন। সবার মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা বিরাজ করছিল। তখন আবু বকর সিদ্দিক রাঃ সবার সামনে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন।

খলিফা নির্বাচন ও কাফন-দাফনঃ

রাসুলের কাফন দাফনের পূর্বে রাসুলের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার ব্যাপারে মুসলিমদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হলো। সাক্বীফা বনু সাঈদায় মুহাজির

ও আনসারদের মধ্যে আলোচনা চলতে লাগল। অবশেষে আবু বকর রাঃ এর খিলাফতের ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে যথেষ্ট

সময় অতিবাহিত হল এবং রাত চলে আসলো। এই অবস্থায় সোমবার দিবাগত রাত অতিবাহিত হলো, মঙ্গলবার সকাল চলে আসলো। এই

সময় পর্যন্ত রাসুলের দেহ একটি চাদরে আবৃত অবস্থায় ছিল। ঘরের মানুষেরা ভেতর থেকে দরজা বন্ধ রেখেছিল।

মঙ্গলবার দিন রাসূলকে কাপড়সহ গোসল দেয়া হলো। গোসল দেওয়ার কাজে অংশ নিলেন হযরত আব্বাস, হযরত আলী, হযরত আব্বাসের দুই পুত্র ফযল ও কুসাম এবং রাসূলের আজাদকৃত দাস শুক্করান, হযরত উসামা বিন যায়েদ ও আওস ইবনে খাওলা রাঃ। হযরত আব্বাস ও তাঁর দুই পুত্র রাসূলের পাশ পরিবর্তন করে দিচ্ছিলেন। হযরত উসামা ও হযরত শাকরান পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন এবং হযরত আলী রাঃ রাসূল সাঃ কে গোসল করিয়ে দিচ্ছিলেন। রাসূলের দেহ মোবারককে নিজ বুকের উপর ভর করে নিয়ে রেখেছিলেন হযরত আউস রাঃ।

রাসূলকে তিনবার বরইপাতা মিশ্রিত পানি দ্বারা গোসল দেয়ানো হয়। কুবায় অবস্থিত সাদ বিন খায়সামা রাঃ এর 'গারস' নামক কূপের পানি দিয়ে গোসল দেওয়া হয়। রাসুল সাঃ এই কূপের পানি পান করতেন। গোসলের পর তিনটি সাদা চাদর দিয়ে রাসুলের কাফনের ব্যবস্থা করা হয়। এসবের মধ্যে জামা কিংবা পাগড়ি ছিল না।

রাসুলের অন্তিম শয্যার স্থান সম্পর্কে সাহাবীগণের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল। কেউ চাচ্ছিলেন তাঁকে মিম্বারের কাছে দাফন করতে, কেউ চাচ্ছিলেন বাক্বী কবরস্থানে দাফন করতে আবার কেউ চাচ্ছিলেন তাঁর সালাতের স্থানে দাফন করতে। তখন আবুবকর রাঃ বললেন, "আমি রাসূল সাঃ কে বলতে শুনেছি, এমন কোনো নবীকে পৃথিবী থেকে উঠানো হয়নি যাকে সেই স্থানে দাফন করা হয়নি যেখানে তার মৃত্যু হয়েছে"। এরপর আবু তালহা রাঃ রাসূলের বিছানা উঠিয়ে নিলেন। যেখানে তাঁর মৃত্যু হয়েছে সেই বিছানার নিচে কবর খনন করা হলো।

সাহাবীগণ পালাক্রমে দশজন দশজন করে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে জানাযার সালাত আদায় করলেন। নির্ধারিত কোনো ইমামের ব্যবস্থা ছিলনা। সর্বপ্রথম রাসুলের পরিবারের লোকেরা জানাযার সালাত আদায় করল। এরপর ক্রমান্বয়ে মুহাজির, এরপর আনসারগণ জানাযার সালাত আদায় করলেন। এরপর ক্রমান্বয়ে অন্য পুরুষ, মহিলা, শিশু ও দাসগণ জানাযার সালাত আদায় করলেন। মঙ্গলবার দিন পুরোটাই অতিবাহিত হয়ে যায় জানাযার সালাত আদায়ে। মঙ্গলবার দিন

অতিবাহিত হওয়ার পর বুধবার রাতের মধ্যভাগে রাসূল সাঃ এর দেহ মোবারক কবরস্থ করা হয়।

রাসূল সাঃ এর দাফনের সময় ফাতিমা রাঃ আবেগাপ্লুত হয়ে আরও বলেন, “হে মানুষেরা! তোমাদের আত্মা কীভাবে স্থির আছে যখন তোমরা আল্লাহর রাসূলের উপর মাটি দিয়ে ঢেকে দিচ্ছ? (সহীহ বুখারি)

আনাস ইবনে মালিক রাঃ বলেন, "আমরা আল্লাহর রাসূল সাঃ কে দাফন করতে নিজেরা স্বশরীরে অংশ নিয়েছিলাম। রাসূল সাঃ কে দাফন করে আমরা তখনও হাত মুছিনি কিন্তু আমরা আমাদের অন্তরে পরিবর্তন অনুভব করছিলাম"।

তথ্যসূত্রঃ

www.hadithbd.com
https://bn.m.wikipedia.org/wiki/
https://www.alkawsar.com/bn/article/2822
আর রাহিকুল মাখতুম [আল্লামা সফিউর রহমান মুবারকপুরি রহ.]
সীরাহ মুহাম্মদ সাঃ[www.banlakitab.weebly.com]
নবীয়ে রহমত [সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী]
Seerah [Islamic online madrasah Iom]